মুখোশের অন্তরালে

ভয়ংকর গোয়েন্দা ষড়যন্ত্র

নাজমুল চৌধুরী

গুজরাট ফাইলস
রানা আইয়ুব

ওসামা

MOSSAD EXODUS
মোসাদ
এক্সোডাস

এনিমি
কমব্যাট্যান্ট
মোয়াজ্জাম বেগ

না
বলতে
শিখুন
যদি হ্যাঁ বলতে না চান!
ওয়াহিদ তুষার

পার্মানেন্ট রেকর্ড

মুখোশের অন্তরালে

নাজমুল চৌধুরী

৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢ -১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

মুখোশের অন্তরালে

নাজমুল চৌধুরী

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০২০

প্রচ্ছদ : ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক

আমাদেরবই ডট কম
২য় তলা, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

অনলাইন পরিবেশক

www.amaderboi.com
www.rokomari.com
www.boibazar.com
www.niyamahshop.com
www.ruhamashop.com

Also available in E-book edition on

মুঠোবই সেইবই বইটই

মূল্য : ৩০০ [তিনশত] টাকা

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ফোন: ০১৭৫৯ ৮৭৭ ৯৯৯

Mukhosher Ontorale by Nazmul Choudhury
Published by Projonmo Publication

Price : 300 Taka
International Price : $ 18.00 USD
ISBN : 978-984-94392-2-6

উৎসর্গ

আমার পিতা মরহুম আসদ্দর আলী চৌধুরী এবং মাতা মরহুমা মতিউন্নেছা চৌধুরী যারা জীবদ্দশায় ছিলেন আমার যাবতীয় প্রেরণার উৎস। পিতা ছিলেন একজন সৎ সরকারী চাকুরীজীবি। অবসরে লিখেছেন অসংখ্য বাস্তবধর্মী এবং আধ্যাত্মিক কবিতাগুচ্ছ যা তার মৃত্যুর পর ছাপা হয়েছে বইয়ের আকারে। 'সায়াহ্নের সংলাপ' কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা, উপদেশ ও আধ্যাত্মিকতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। এ যেন বহুমাত্রিক উপাদানে সাজানো এক সুশোভিত বাগান। আমার মাতা যাঁর কাছ থেকে আমি শিখেছি শৃঙ্খলিত জীবনধারা এবং পরিচ্ছন্ন জীবন পরিচালানার পথনির্দেশ। তাদের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করা হলো আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

-নাজমুল চৌধুরী

ার,

লেখকের কথা

মানবসভ্যতা বিকাশে মানবতার জয়জয়কার পৃথিবীর সর্বত্র। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে মানবতাকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছে অধিকাংশ মানুষ। রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। তাই তো গড়ে উঠেছে সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক রীতিনীতি। ছোট্ট এ পৃথিবীতে মৃত্যু পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার নিয়ে জন্মেছে মানুষ। এ স্বাভাবিক অধিকারে যারা বাঁধা সৃষ্টি করে তারা দেশ, মানবতা এবং সমাজের শত্রু। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? এই রক্ত-মাংসের মানুষ নিজেদের ভাগাভাগি করে নিয়েছে বিভিন্ন জাতিসত্তায়। জাতিতে জাতিতে কলহ, দেশে দেশে বিবাদ এবং ধর্মে ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করে পৃথিবীর মানচিত্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ নিজেদের অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে এ পৃথিবীতে একের পর এক দেশের উত্থান ঘটেছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায়, ক্ষমতার শীর্ষে থাকার মানসিকতা এবং অতিরিক্ত ভোগের আশায় মানুষ একে অপরের উপর চড়াও হয়েছে। শত্রুতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা এবং বহিষ্কারের মাধ্যমে কেড়ে নিচ্ছে অন্য সমাজের ভোগের অধিকার। লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে মানুষ অন্যকে পরাস্ত করার বিভিন্ন কলাকৌশল করায়ত্ত্ব করেছে। গুপ্তচরবৃত্তি এ অপকৌশলগুলোর প্রধান উৎস। তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ অপরিহার্য মনে করে পৃথিবীর সকল দেশ নিজেদের গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেছে। গুপ্তচরদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড কীভাবে দেশে দেশে, কালে কালে যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি এবং হত্যা সংগঠিত করেছে তারই অন্ধকার দিকগুলোর কিয়দংশ এ বইতে প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন গুপ্তচর সংস্থা কীভাবে প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে পাল্টে দিচ্ছে তারই একটি ভয়াবহ চিত্র "মুখোশের অন্তরালে" বইটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। ২০১৪ সালের ১১ই এপ্রিলের এক জরিপে বিশ্বের প্রথম দশটি স্পাই প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হয়। এদের

সবকটিই জনবল এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণে অহরহ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এ সমস্ত স্পাই প্রতিষ্ঠানগুলোর হলো :

- MOSSAD (Israel)
- CIA/FBI (USA)
- MI6/SIS (U.K)
- KGB/FSD (Russia)
- RAW (India)
- DGSE (France)
- MSS (China)
- BND (Germany)
- CSIS (Canada)
- ISI (Pakistan)

দীর্ঘ পরিশ্রম এবং ধৈর্য পরীক্ষার কঠিন সময়গুলো অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত বইটি পাঠক সমীপে উপস্থাপন করতে পারার সময় এসেছে। বইটি লিখতে গিয়ে অনেক সুহৃদ ব্যক্তিবর্গ উৎসাহ জুগিয়েছেন যা চিরদিন আমার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। যদি পাঠককূল এ বইটি পড়ে উপকৃত হন তাহলে আমার সকল পরিশ্রম স্বার্থক হবে বলে মনে করি।

- নাজমুল চৌধুরী

সূচিপত্র

মুখোশের অন্তরালে

অনাদিকাল থেকে দেশে দেশে, কালে কালে, গোত্রে গোত্রে গুপ্তচরবৃত্তি এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে আসছে। এর মূলে রয়েছে অস্তিত্বের লড়াই, সম্পদের লড়াই কিংবা বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতি হওয়ার লড়াই। নীরব এ স্নায়ুযুদ্ধকে সম্বল করে ভবিষ্যত পরিকল্পনা গৃহীত হয়, কূটনৈতিক সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা নিয়ে কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়। প্রতিপক্ষকে দমিয়ে রাখার জন্য সময়োপযুগী পদক্ষেপ নিতে হয়। ফসলের জমি থেকে শুরু করে বিশ্বকে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং জাতিগোষ্ঠি নিজেদের আধিপত্য অর্জনের লক্ষ্যে ভাগ করে নিয়েছে। আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সংঘাত অনিবার্য। তাই সংঘাত মানব সভ্যতার বেদীমূলে হোঁচট খাচ্ছে নিরন্তর, পরাভূত হচ্ছে শান্তির পায়রা। প্রতিপক্ষের শক্তি নিরূপণ করতে, শক্তিকে দূর্বল করে দিতে কিংবা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গুপ্তচরবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে মানুষ। প্রতিপক্ষ দেশের বা সমাজের রীতিনীতির অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদের গতিবিধি, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যত লক্ষ্য যাচাই করে নিজেদের স্বার্থবিরোধী কাজকে বানচাল করে দেওয়াই গুপ্তচরদের কাজ। গুপ্তচরেরা নিজেদেরকে আড়াল করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে। প্রত্যেকটি দেশের দূতাবাসে সে দেশের গোয়েন্দাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এ সমস্ত গোয়েন্দারা সরকারী এবং সামরিক প্রশাসনের অভ্যন্তরে ঢুকে গোপনীয় তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে। প্রতিপক্ষ দেশের রাজনৈতিক এবং সামরিক অঙ্গনে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের লক্ষে তারা যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয় তা নিম্নরূপ :

- ❖ পছন্দনীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা কিংবা সরকারে আছেন এমন একজন বা ততোধিক ক্ষমতাধর মন্ত্রীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রেখে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল।
- ❖ উঠতি প্রভাবশালী ছাত্রনেতা, শ্রমিকনেতা, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদদের মধ্য হতে বেছে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর জন্য প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে নেওয়া।
- ❖ জননন্দিত লেখক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সমাজসেবক এবং সাংবাদিককে প্রচুর অর্থ, খেতাব, সম্মান এবং উপঢৌকনের মাধ্যমে জনগণের উপর মনস্থাত্বিক প্রভাব বিস্তার করা।

❖ টার্গেট ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতারা বিদেশী চক্রান্তে এমনভাবে প্রভাবিত হয় যখন তার মন নিজ দেশ বা সমাজের ক্ষতি করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে বর্হিশক্রর স্বার্থ সংরক্ষণ করে শুধুমাত্র অর্থ কিংবা ক্ষমতার লোভে।

ধরুন, যেকোনো এক বা একাধিক রাষ্ট্রের দূতাবাস কর্মকর্তা কিংবা গুপ্তচর সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে টার্গেট দেশের নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তি বা রাজনৈতিক পার্টির সাথে যদি কোনো গোপন চুক্তি হয়ে যায় তাহলে সে ব্যক্তি বা গোষ্ঠি কি বেরিয়ে আসতে পারবে এ বেড়াজাল হতে?

অবসরপ্রাপ্ত মোসাদ স্পাই **ভিক্টর অষ্ট্রোভাস্কি** তার বই **'বাই ওয়ে অব ডিসেপশন'** গ্রন্থে লিখেছেন ইসরাইলি গুপ্তচর সংস্থা 'মোসাদ' কিংবা পরাধর দেশগুলোর গুপ্তচর সংস্থা তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য টার্গেট দেশের ডাকসাইটে রাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, অর্থনীতিবিদ কিংবা মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী মন্ত্রীদের মধ্য হতে এক বা একাধিক মন্ত্রীকে ক্ষমতার লোভ, প্রভাব বিস্তারে সহায়তা, বিদেশী ব্যাংকে তাদের নামে প্রচুর টাকা গচ্ছিত রাখার শর্তে কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে লেলিয়ে দেওয়া পরমা সুন্দরীদের সহচর্যের মাধ্যমে প্রভাবিত করে তাদের স্বার্থ হাসিল করতে সমর্থ হয়।

প্রসঙ্গতঃ খ্রিস্টান মেরোনা সম্প্রদায়ভূক্ত লেবাননের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বশির গামাইয়েলের কথাই ধরা যাক না কেন? খ্রিস্টান ফ্যালানঞ্জিস্ট লেবানীজ ফোর্সের নেতা বশির গামাইয়েল ১৯৮২ সালের ২৩শে আগস্ট লেবাননের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। লেবাননের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ এ নেতাকে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিল ইসরাইলি মোসাদ এবং আমেরিকার সিআইএ।

১৯৭০ সালে ওয়াশিংটন ডি সি-তে একটি 'ল' ফার্মে ছাত্রাবস্থায় আমেরিকান সিআইএ তাকে টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়েছিল একজন তথ্যপ্রদানকারী হিসেবে । যেহেতু বশির গামাইয়েলের পিতা পেরি গামাইয়েল লেবাননের খ্রিস্টান ফ্যালানঞ্জিস্ট মিলিশিয়া বাহিনীর নেতা ছিলেন, এ কারণে সিআইএ কিংবা ইসরাইলি মোসাদ বশিরকে লেবাননের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা সম্মন্ধে জানার উপযুক্ত মাধ্যম বিবেচনায় এ ব্যবস্থা নেয়। ১৯৭২ সালে টেক্সাসের একটি 'ল' একাডেমি হতে বশির গামাইয়েল আইনশাস্ত্রে ডিগ্রিলাভ করেন।

ইসরাইলি যোগসাজশে দেশে ফিরে বশির খ্রিস্টান ফ্যালানঞ্জিস্ট মিলিশিয়া বাহিনী (স্টুডেন্ট উইং) গঠন করেন এবং ১৯৭৬ সালে এ

বাহিনীর প্রধান হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। মিলিশিয়া বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল লেবানন হতে ইসরাইলের চিরশত্রু পিএলও সদস্যদেরকে চিরতরে নির্মূল করা এবং লেবাননে সিরিয়ার আধিপত্য রোধ করা। এ বাহিনীকে শক্তিশালী করতে তৎকালীন ইসরাইলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগেনকে ১০ মিলিয়ন ডলার অর্থ বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করলে আমেরিকা রাজি হয়ে মিলিশিয়া বাহিনীর শক্তি বর্ধনে তৎপর হয়। বশির গামাইয়েল ক্রমেই ইসরাইলের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ইসরাইলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের একজন প্রিয়ভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হন। গামাইয়েল এবং ইসরাইলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের পরিকল্পনা মোতাবেক লেবাননে পিএলও-কে নিশ্চিহ্ন করে দিতে এবং লেবাননে অবস্থানকারী সিরিয়ান সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে লেবানন হতে বিতাড়িত করতে ইসরাইলি সেনাবাহিনী ও গামাইয়েল সমর্থিত খ্রিস্টান ফ্যালানজিস্ট মিলিশিয়া বাহিনী তৎকালীন ইসরাইলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের নেতৃত্বে ১৯৮২ সালে লেবাননে প্রবেশ করে।

খ্রিস্টান ফ্যালানজিস্ট মিলিশিয়া বাহিনী এবং ইসরাইলি সেনাবাহিনী লেবাননে ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবির সাবরা ও শাতিলা ক্যাম্পে বসবাসরত নিরীহ ও নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও যুবকদের চতুর্দিক অবরোধ করে প্রায় তিনহাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। এ হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত করার পূর্বক্ষণে যুদ্ধ এড়াতে ইসরাইল পিএলও সেনাসদস্য ও তাদের নেতা ইয়াসির আরাফাতকে জাহাজযোগে তিউনিসিয়াতে পালাবার পথ করে দেয়। ইতিহাসে এ একটি বর্বরোচিত ঘটনা।

একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক ইসরাইলি এক সেনাসদস্যের বরাত দিয়ে লিখেছেন এক ফ্যালানজিস্ট খ্রিস্টান মিলিশিয়া সাবরা ক্যাম্পে এক ফিলিস্তিনি শিশুকে হত্যা করে তার কচি মগজ উল্লাসে চিবিয়ে খেয়েছিল। এ ধরনের হত্যাযজ্ঞের নিন্দা জানিয়ে বিশ্ববিবেক সরব হলেও আমেরিকা এবং ইসরাইলের চাপে ক্রমশ বিশ্ববিবেক এবং জাতিসংঘ নীরব ভূমিকা পালন করে। ইসরাইলি সরকার এবং আমেরিকান সিআইএ-এর যোগসাজশে বশির গামাইয়েল ১৯৮২ সালের ২৩ শে আগস্ট লেবাননের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন কিন্তু প্রেডিডেন্ট হিসেবে লেবাননের মসনদে তার আর বসা হলনা, ২১ দিনের মাথায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করার প্রাক্কালে ১৯৮২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর মিটিং হলে পুঁতে রাখা বোমার আঘাতে বশির গামাইয়েল ও তার ২৬জন রাজনৈতিক সঙ্গী নিহত হয়। সন্দেহ করা

হয় সিরিয়ান গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্য হাবিব তানউইস এ বোমাটি মিটিং হলে পুঁতে রাখে।

বশির গামাইয়েল নিহত হওয়ার পর তার বড় ভাই আমিন গামাইয়েল লেবাননের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। খ্রিস্টান ফ্যালানঞ্জিস্ট নেতা বশির গামাইয়েলকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে ইসরাইল তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে পেরেছিল। যেমন করে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ সেনাপ্রধান লর্ড ক্লাইভ এবং তাদের এদেশীয় দোসর রায়বল্লভ-রায়দূর্লভ গং-দেরকে ক্ষমতার ও ব্যবসার লোভ দেখিয়ে মীরজাফরকে করায়ত্ত্ব করতে পেরেছিল। তদ্রুপ পানামার স্বৈরশাসক মেনুয়েল এন্টনিয়ো নরিয়েগাকে আমেরিকার সিআইএ এবং ইসরাইলের মোসাদ তাদের স্বার্থে কাজ করার জন্য রিক্রুট করতে সমর্থ হয়েছিল।

১৯৫০-১৯৮০ সাল পর্যন্ত নরিয়েগা আমেরিকার সিআইএ ও ইসরাইলি মোসাদ-এর স্বার্থে কাজ করেছেন। আবার একসময় সিআইএ এবং মোসাদ তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করে মেনুয়েল নরিয়েগাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। বর্তমান বিশ্বে ক্ষমতার লড়াইয়ে যত বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয় তার পেছনে ইসরাইলি মোসাদ, আমেরিকান সিআইএ, ব্রিটেনের এমআই-৬, ফ্রান্সের ডিজিএসই কিংবা রাশিয়ান কেজিবি/এফএসডি-র হাত রয়েছে।

মিসরের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক, ইরাকের সাদ্দাম হোসেন, লিবিয়ার মোয়াম্মার গাদ্দাফি - এদের উত্থান এবং পতন সব কিছুর মূলে রয়েছে উপরোক্ত কিছু গুপ্তচর সংস্থাগুলোর কালো হাত।

শক্তিশালী এ সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যুগপৎভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে পুরো পৃথিবী জুড়ে। তাদের প্রয়োজনে উঠতি নেতা পাতি নেতাদের কাজে লাগিয়ে তারা স্বার্থ হাসিল করে এবং কাজ ফুরালেই ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দ্বিধাগ্রস্থ হয় না। আমেরিকা ইরাকের ক্ষেত্রে সেটাই করেছিল। ১৯৫৯ সালে ইরাকের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তার পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট জেনারেল কাসিমকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মিলিটারী অভ্যুত্থান চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে মিসরে আশ্রয় নেন। কায়রোতে সাদ্দাম হোসেন আমেরিকার সিআইএ গোয়েন্দাদের সাথে গোপন বৈঠক করে ইরাকে আমেরিকান স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেনারেল কাসিমকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সাহায্য চান।

১৯৬৩ সালে সিআইএ-র চক্রান্তে ও সহায়তায় সাদ্দাম হোসেনের বাথ পার্টি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জেনারেল কাসিমকে হত্যা করে ইরাকের ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত হয়। বাথ পার্টি ইরাক শাসনে এবং আমেরিকার স্বার্থ রক্ষায় তেমন কার্যকর ভূমিকা না রাখায় সিআইএ বাথ পার্টির অভ্যন্তরে আরও দুটি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে আমেরিকান মালিকানাধীন তেল কোম্পানিগুলোকে ইরাকে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সাহায্য করে।

১৯৬৯ সালে অন্য একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সিআইএ হাসান আল বকরকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে কিন্তু বকর-এর শাসনামলে আমেরিকান স্বার্থ তেমনভাবে প্রতিফলিত না হওয়ায় ১৯৭৯ সালের ১৬ই জুলাই সিআইএ তাদের পছন্দনীয় ব্যক্তি সাদ্দাম হোসেনকে ইরাকের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনরায় ক্ষমতায় নিয়ে আসে।

১৯৮০ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগেন সাদ্দাম হোসেনকে অস্ত্র, মাল্টিমিলিয়ন ডলার ও ইনটেলিজেন্স তথ্য সরবরাহ করে ইরান আক্রমণ করতে প্রভাবিত করেন। ইরান আক্রমণের জন্য ইরাককে বিষাক্ত কেমিকেল গ্যাসও সরবরাহ করা হয়। ইরাক এই বিষাক্ত গ্যাস ইরানের সাথে আট বছর মেয়াদী যুদ্ধে বহুবার ব্যবহার করে। এই দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে ইরাক ও ইরান দেওলিয়া হয়ে যায়। এ সুযোগে কুয়েত তেল রপ্তানী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। ইরাকের অর্থনীতিকে বাঁচাতে সাদ্দাম হোসেনের দৃষ্টি এবারে তেলসমৃদ্ধ কুয়েতের উপর পড়ে। কুয়েতের তেলসম্পদ ভাগাভাগি নিয়ে ইরাক ও আমেরিকার মধ্যে একটি গোপন চুক্তি হলে আমেরিকা ইরাকের কুয়েত আক্রমণকে নীরবে সায় দেয়। সাদ্দাম ১৯৯১ সালে কুয়েত দখল করে নেন।

কুয়েতের বিশাল তেলক্ষেত্র হতে আহরিত তেলসম্পদে ইরাককে বাদ দিয়ে ভাগ বসানোর অভিলাস নিয়ে আমেরিকা ও তার মিত্রদেশ ব্রিটেন ও ফ্রান্স নানা অজুহাত খুঁজতে থাকে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইসরাইলের চাপে কুয়েতে সাদ্দাম বাহিনীর অনধিকার অনুপ্রবেশের ঘটনাটি জাতিসংঘ ও বিশ্ববিবেককে মেনে না নিতে আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেন বিভিন্ন প্রচারণা চালায়। অবশেষে আমেরিকা জাতিসংঘের সমর্থন নিয়ে 'অপারেশন ডেজার্ট' পরিচালনা করার সুযোগ পায়। কুয়েতের তেল ভাগাভাগির শর্তে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা এ আক্রমণে যোগ দেয়। নয়শত এগারোবার আমেরিকা, ইসরাইল, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের বিমানবাহিনী ইরাকের উপর আক্রমণ চালায়। এমনকি আরব বিশ্বের প্রধান শত্রু ইসরাইলকে সৌদিআরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য কয়েকটি মুসলিম দেশ ইরাক আক্রমণ করতে তাদের আকাশপথ ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

এক সময়ের মিত্র সৌদিআরব, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর অবস্থান লক্ষ করে সাদ্দাম হোসেন চাইনিজ স্কাড মিসাইল দ্বারা প্রত্যুত্তর দেন কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। সাদ্দাম হোসেন আত্মগোপনে যান এবং পরবর্তীতে ২০০৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর আমেরিকান সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন।

সাদ্দাম হোসেনের ইসরাইল অভ্যন্তরে স্কাড আক্রমণের প্রেক্ষিতে ইসরাইল, আমেরিকা ও ব্রিটেন সাদ্দামকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। আমেরিকার কাছে সাদ্দাম হোসেনের প্রয়োজন শেষ হয়ে যাওয়াতে এবার আমেরিকা মানবতার দোহাই দিয়ে ইরাকের শহর দোজাল এলাকায় সাদ্দামের কেমিকেল গ্যাস দ্বারা ১৪৮ জন নারী শিশু ও বিদ্রোহী কুর্দিদেরকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। পাঁচজন বিচারকের সমন্বয়ে এ বিচারকার্য চলাকালীন বিচারকদের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় এ বিচারের প্রধান বিচারক রিগার আমিন ও অন্য দুজন বিচারককে সরিয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকা ও ব্রিটেনের পছন্দনীয় রউফ রশিদ আব্দুর রহমান প্রধান বিচারকের ভূমিকায় স্থলাভিষিক্ত হন। সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে যে দুজন উকিল নিয়োগ করা হয় তারা এ বিচারকার্যকে প্রহসনমূলক আখ্যা দেওয়ায় তাদেরকে পরবর্তী পর্যায়ে ইসরাইলি মোসাদ ও সিআইএ গোপনে হত্যা করে।

প্রহসনমূলক একতরফা এ বিচারে আমেরিকা, ব্রিটেন, ইসরাইল ও ফ্রান্সের ইচ্ছানুযায়ী সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসির রায় হয় এবং ২০০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর পবিত্র ঈদের দিন তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সাদ্দাম হোসেনের চাচাতো ভাই বারজান ও দুই ছেলে উদয় ও কুসাইকে হত্যা করা হয়। একথা সত্য যে, সাদ্দাম হোসেন ও তার দুই ছেলে ইরাকের অনেক জ্ঞানী-গুণীকে বিভিন্ন সময়ে হত্যা করেছে। আমেরিকার পরামর্শে সাদ্দাম হোসেন ইরাকি শৃঙ্খলিত সেনাবাহিনী ও সংক্ষিপ্ত মিলিটারী ট্রেনিং নেওয়া তরুণ সমাজকে অকারণে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে ঠেলে দিয়েছেন শুধুমাত্র আমেরিকা ও ইসরাইলি স্বার্থে।

রায়প্রদানকারী প্রধান বিচারক রউফ রশিদ আব্দুর রহমান সাদ্দামের ফাঁসির রায় কার্যকর করার পরপরই আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাথে গোপন চুক্তি মোতাবেক পরিবার পরিজনসহ ব্রিটেনে আশ্রয় নেওয়ার আবেদনের খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ সরকার প্রহসনমূলক এ বিচারের রায়প্রদানকারী প্রধান বিচারককে সাদ্দামের ফাঁসির দণ্ডাদেশ

দেওয়ার শর্তে নির্বিঘ্নে ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে আশ্রয় দেওয়ার প্রতিশ্রুতির খবর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়।

সাম্প্রতিককালে বিচারক আব্দুর রহমান ইরাকে সুন্নি বিদ্রোহী ইসলামি সংগঠন IS-এর হাতে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে প্রহসনমূলক বিচারে ফাঁসির রায়দানকারী হিসেবে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করার খবর প্রকাশিত হয়। আমেরিকা, ব্রিটেন কিংবা অন্যান্য পশ্চিমা শক্তি এ খবরে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি যেহেতু বিচারক রউফ রশিদ আব্দুর রহমানের বেঁচে থাকার প্রয়োজন তাদের কাছে সামান্যই অর্থ বহন করে বরং এ বিচারকের মৃত্যু নিশ্চিত হলে তাদেরই লাভ। কারণ, যদি কোনোদিন রউফ আব্দুর রহমান মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ হয়ে সকল ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়!

এখন প্রশ্ন হলো, যে সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে সিআইএ একসময় তাদের পক্ষের শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল, ইরাকের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করেছিল, ইরানকে শায়েস্তা করার জন্য সাদ্দামকে দিয়ে ইরান আক্রমণ করতে উৎসাহ জুগিয়েছিল, আমেরিকার তেল কোম্পানিগুলো মুক্তভাবে ইরাকে তেল আহরণ করার সুযোগ পেয়েছিল, এতসব সত্ত্বেও আমেরিকা শেষ পর্যন্ত তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল কেন? উত্তর একটাই- আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া কিংবা ইসরাইল যাদেরকে দিয়ে কাজ হাসিল করে তাদের পরিণতি হয় মৃত্যু কিংবা ক্ষমতাচ্যুতি।

এ ধরনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসরাইল, আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স কিংবা রাশিয়ার গুপ্তচর সংস্থাগুলো পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশেগুলোর বহু নেতা, উপনেতা কিংবা বিজ্ঞানীদেরকে হত্যা করেছে যাতে তাদের পছন্দের বাইরে কোনো দেশ বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর কেউ পারমাণবিক শক্তিধর দেশে রূপান্তরিত না হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে যেতে না পারে। এ সমস্ত স্পাই প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে তাদের ক্ষমতা, স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি এবং পৃথিবী জুড়ে তাদের নৃশংসতার যে চিত্র ফুটে উঠে তা এককথায় ভয়াবহ এবং মানব সভ্যতা বিকাশে এবং শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের পথে প্রধান অন্তরায়।

মোসাদ : পৃথিবীর দক্ষতম ঘাতক প্রতিষ্ঠান

গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাসে ইসরাইলি গুপ্তচর সংস্থা 'মোসাদ' একটি ভয়ঙ্কর নাম। পৃথিবীর কোনো গুপ্তচর সংস্থা এত গুপ্তহত্যা করেনি যত না এ প্রতিষ্ঠানের গুপ্তচরেরা করেছে। ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজে নিয়োজিত বৈজ্ঞানিক, গবেষক, রাজনীতিবিদ, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী যে কোনো দেশের নাগরিক হোক না কেন, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর তাদেরকে নির্মূল করাই মোসাদের অন্যতম টার্গেট হিসেবে বিবেচ্য। মানবসভ্যতার অগ্রগতি কিংবা মানবতার নিরিখে এ প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ এবং কার্যকলাপ কতটুকু স্বস্তিদায়ক তার মূল্যায়নের ভার পাঠককূলের উপর। হিব্রু ভাষায় ব্যবহৃত মোসাদের অর্থ ইংরেজিতে দাঁড়ায় 'দ্য ইন্সটিটিউট ফর ইনটেলিজেন্স এন্ড স্পেশাল অপারেশনস্'।

১৯৪৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ইসরাইলের রাজধানী তেলআবিবে মোসাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর সাথে যুক্ত রয়েছে কাউন্টার ইনটেলিজেন্স উইং। অফিস স্টাফসহ প্রায় ১২০০-১৪০০ কর্মকর্তা ও কর্মচারী এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। তামির পার্ডো-এর পরবর্তী ইওসি কোহেন (Yossi Cohen) ২০১৬ সাল হতে এর ১২তম পরিচালক হিসেবে দায়িত্বভার পালন করছেন। প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এর সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান ইসরাইল রাষ্ট্রের জাতীয় গুপ্তচর সংস্থা হিসেবে পরিচিত। এর জন্য রয়েছে নামে বে-নামে প্রতিষ্ঠিত মোসাদের বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, কুটনৈতিক মাধ্যম, বন্ধুভাবাপন্ন দেশসমূহের মধ্যে গোপনীয় তথ্য আদান-প্রদান, তথ্যসরবরাহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, উন্নত প্রযুক্তি এবং অস্ত্র নির্মাণের জন্য অত্যাধুনিক গবেষণাগার। মোসাদ অভ্যন্তরে রয়েছে মিলিটারী ইনটেলিজেন্স সরবরাহকারী ইউনিট 'আমান', চোরাগুপ্তা হামলাকারী ইউনিট 'ডিইভডিভান', গুপ্তহত্যা ও অপহরণকারী ইউনিট 'কিডন', অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ইউনিট 'সিনবেথ', সাইবার কন্ট্রোল ইউনিট এবং সুদক্ষ বর্ডার পুলিশ 'ইয়ামাম'।

পৃথিবী জুড়ে এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ইউনিট নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র ৩০-৪০ জন কেইস অফিসার যাদেরকে হিব্রু ভাষায় 'কাট্সা' নামে অভিহিত করা হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গুপ্তচর সংস্থাগুলোর তুলনায় মোসাদের কেইস অফিসার সংখ্যায় অত্যন্ত নগন্য। পৃথিবী জুড়ে ইহুদি জাতি জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, ব্যবসায় এবং রাজনীতিতে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে

রেখেছে। ইসরাইলের স্বার্থে দেশে-বিদেশে বসবাসরত ইহুদি সম্প্রদায় একই সূত্রে গাঁথা এক অভিন্ন পরিবার। তাদের দেশপ্রেম, একতাবোধ, সংহতি এবং সহমর্মিতাবোধ তাদের নিয়ে গেছে অনেক উপরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবী জুড়ে নিজেদের সম্প্রদায়ভূক্ত লোকদের দ্বারা তারা এমন একটি বৃত্ত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যা তুলনাবিহীন। ইসরাইল সরকারকে এবং গুপ্তচর সংস্থা মোসাদকে সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে তাদের বিরাট এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যাদেরকে হিব্রু ভাষায় 'সায়ানিম' বলা হয়। বিদেশে সায়ানিমরা মোসাদ কেইস অফিসারদেরকে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে থাকে। যে কারণে আমেরিকান সিআইএ কিংবা রাশিয়ান এফএসডি-কেজিবি-র তুলনায় সংখ্যায় নগন্য হয়েও মোসাদের সাফল্য অপ্রতিরোধ্য এবং অব্যর্থ।

১৯৪৮ সালে এর প্রতিষ্ঠালগ্নে ইসরাইলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 'ডেভিড বেনগুরিয়ন' এ প্রতিষ্ঠানকে দেশের স্বার্থে এক আধুনিক এবং অপ্রতিরোধ্য প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার প্রয়াস চালান, যার ফলশ্রুতিতে আজকের মোসাদ পৃথিবীর গুপ্তচর সংস্থাগুলোর শীর্ষে অবস্থান করছে। এককথায় মোসাদ-এর শিকড় পৃথিবীর পরাশক্তিধর দেশগুলোর অভ্যন্তরে এমনভাবে বিস্তৃত যা অপ্রতিরোধ্য এবং এর কার্যক্রমের কাছে শক্তিধর দেশগুলোর পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি অনেকটা প্রভাবিত।

এ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সরাসরি ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর কাছে দায়বদ্ধ। মোসাদের কার্যক্রম আমেরিকা, ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বসনিয়া হারজিগোভিনা, সাইপ্রাস, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রীস, ইতালি, মালটা, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, মিসর, ইরান, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, পাকিস্তান, ভারত, সিরিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া, উগান্ডা, সাউথ আফ্রিকা, সুদান, জিম্বাবুয়ে, নিউজিল্যান্ড, উত্তর কোরিয়া, চীন ইত্যাদি দেশজুড়ে পরিব্যপ্ত। এ সমস্ত দেশগুলোর বাইরে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তাদের মিত্র দেশগুলোর সহায়তায়,যেমন বাংলাদেশে ভারতের সহযোগিতায়।

মোসাদ কর্তৃক বিভিন্ন সময় নিম্নলিখিত অপরাধমূলক কার্যকলাপ সংঘটিত হয় যার অসংখ্য প্রমাণ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, গণমাধ্যম ও বইপুস্তকে ছাপা হয় কিন্তু অলিখিত কিংবা অপ্রমাণিত ইতিহাস গোপনীয় থেকে যায় যার সঠিক ইতিহাস মোসাদ প্রতিষ্ঠানের অনেক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরও অজানা। বিভিন্ন গোয়েন্দা পত্রপত্রিকা, টিভি, রেডিও, বই এবং গণমাধ্যমে শুধু যেগুলো প্রকাশ পেয়েছে তার কিয়দংশ নিম্নে বর্ণিত হলো।

মোসাদের হত্যাযজ্ঞ ও প্রবঞ্চণার কিছু নিদর্শন

(সূত্র : বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকা, গণমাধ্যম, স্পাই পত্রিকা, উইকিপিডিয়া, অবসরপ্রাপ্ত মোসাদ স্পাই অফিসার ভিক্টর অস্ট্রোভাস্কি কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ **'বাই ওয়ে অব ডিসেপশন', 'দি আদার সাইড অব ডিসেপসন'** ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)

১৯৪৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর মোসাদ জাতিসংঘের প্রতিনিধি কাউন্ট বার্নাডোটিকে হত্যা করে। জাতিসংঘ প্রতিনিধি ইসরাইলি স্বার্থে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেন এ সন্দেহে মোসাদ তাকে হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

১৯৫৬ সালের ১৩ই জুলাই মিসরীয় সেনাবাহিনীর লেফটেনেন্ট কর্ণেল মোস্তফা হাফিজকে গাজা ভূখণ্ডে পার্সেল বোমার মাধ্যমে হত্যা করে। ১৪ই জুলাই জর্ডানের আম্মানে মিসরীয় মিলিটারী এটাচি সালাহ মোস্তফাকে একই পন্থায় মোসাদ হত্যা করে। একই সালে মরক্কো হতে মোসাদের একটি টিম মরক্কোতে বসবাসরত ইহুদি সম্প্রদায়কে গোপনে ইসরাইলে সরিয়ে নিয়ে যায়।

১৯৫৭ সালে মোহাম্মদ শাহ রেজা পাহলভী ক্ষমতাসীন থাকা আবস্থায় ইরানের ইনটেলিজেন্স উয়ং সাভাক (অরগেনাইজেশন অব ন্যাশনাল সিকিউরিটি এন্ড ইনফরমেশন) গঠিত হয়। শাহ রেজা ইসরাইলকে স্বীকৃতির আশ্বাস দিলে ইসরাইলের মোসাদ ও আমেরিকার সিআইএ ইরানিয়ান ইনটেলিজেন্স প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেয়।

একই সালে মোসাদ এজেন্ট 'ওয়ালগ্যাঙ্গ লটজ্' জার্মান পাসপোর্ট নিয়ে মিসরে প্রবেশ করে মিসরের বিভিন্ন মিলিটারী স্থাপনাসমূহের উপর নজরদারীর লক্ষে। মিসরের মিসাইল ও অন্যান্য মিলিটারী স্থাপনা এবং কর্মরত পশ্চিম জার্মান রকেট বিজ্ঞানী যারা মিসরীয় মিলিটারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে চুক্তি মোতাবেক কাজ করছিল তাদের তালিকা প্রস্তুত করে ইসরাইলের মোসাদ হেড কোয়ার্টারে তার পাঠানোর কথা ছিল।

মিসরীয় ও জার্মান গোয়েন্দা নজরদারীতে লটজ্ এর কর্মকাণ্ড ধরা পড়ে যাওয়ায় মিসরীয় সরকার মিসরে অবস্থানরত সকল জার্মান পাসপোর্টধারী বিজ্ঞানীদেরকে এক জায়গায় জড়ো করে, যাদের মধ্যে লটজ্

এর নামও ছিল। লটজ্ বুঝতে পারে যে, সে ধরা পড়ে গেছে। বাধ্য হয়ে মিসরীয় নিরাপত্তা বিভাগের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেয় এবং বলে যে, তার উদ্দেশ্য মিসরের ক্ষতি হয় এমনটা নয় শুধুমাত্র বৃহৎ শক্তিবর্গের ঠাণ্ডাযুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ করতেই তার আগমন। আমেরিকার সিআইএ-র মধ্যস্থতায় লটজ্ ছাড়া পায়।

১৯৬০ সালের দিকে ইরানের সাভাক এবং সিআইএ-র মধ্যে নীতিগত কিছুটা ঠাণ্ডা সম্পর্কের কারণে সিআইএ ট্রেনিং টিম তাদের কার্যক্রম ইরান হতে গুটিয়ে নেয়। সে সুযোগে ইসরাইল তেলসমৃদ্ধ ইরানে তাদের খুঁটি মজবুত করে এবং মোসাদ ক্রমান্বয়ে ইরানি সামরিক বাহিনীর জেনারেল আলি রেজা আসকরিকে তাদের দলে ভেড়াতে সমর্থ হয়। ইসরাইলকে স্বীকৃতি এবং ইসরাইলি স্বার্থ সংরক্ষণে আসকরি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

১৯৬০ সালে মোসাদ এজেন্টরা আবিষ্কার করে যে, হিটলারের অন্যতম সঙ্গী এডলফ্ আইকম্যান (জার্মানিতে ইহুদি নিধনের অন্যতম সংগঠক) আর্জেন্টিনায় 'রিকার্ডো ক্লিমেন্ট' ছদ্মনামে বসবাস করে আসছে। মে মাসে আইকম্যানকে মোসাদ এজেন্টরা ইসরাইলে অপহরণ করে নিয়ে যায়। আর্জেন্টিনা সরকার এ ধরনের অবৈধ অপহরণকে দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে জাতিসংঘে অভিযোগ করলে জাতিসংঘ এর নিন্দা জানায় এবং সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রভাবে আইকম্যান-এর মতো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে যাওয়া উচিত বলে রায় দেয়।

জাতিসংঘের নিন্দার প্রেক্ষিতে মোসাদ ব্রাজিলে বসবাসরত ছদ্মবেশী অন্য একজন অভিযুক্ত আসামী জোসেফ রোডলফ্ ম্যাংগেলি যাকে মৃত্যুর ফেরেশতা (এঞ্জেল অব ডেথ) বলে অভিহিত করা হতো তাকে অপহরণের প্রয়াস থেকে সাময়িকভাবে বিরত হয়। অপহরণের কৌশল বদলানোর জন্য মোসাদ তৎপর থাকা অবস্থায় ম্যাংগেলি ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে ব্রাজিলে মারা যায়।

১৯৬১ সালে গঠিত ইসরাইলি কোর্টে এটর্নি জেনারেল গিডিওন হ্যাসনার ও অন্যান্য বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে আইকম্যানকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৯৬২ সালে ফাঁসি কার্যকর করে। একই সময় জার্মানিতে বসবাসরত সন্দেহভাজন নাজি যুদ্ধপরাধী 'আলোইস ব্রনারকে' চিঠি বোমার মাধ্যমে মোসাদ এজেন্ট মারাত্মকভাবে আহত করে।

১৯৬২ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম জার্মানির মিউনিকে জার্মান রকেট বিজ্ঞানী 'হ্যাঞ্জ ক্রাগকে' মোসাদ অপহরণ করে। হ্যাঞ্জ ক্রাগ মিসরীয়

মিসাইল প্রোগ্রামে কর্মরত ছিলেন। সুইস গোয়েন্দারা জানতে পারে যে, মোসাদ এজেন্ট ক্রাগকে অপহরণের পর হত্যা করে। ২৮শে নভেম্বর মিসরের হেলুয়ানের মিসাইল ফ্যাক্টরিতে পাঁচজন মিসরীয় মিসাইল টেকনিশিয়ান চিঠি বোমার আঘাতে অন্ধ হয়ে যায় যার নেপথ্যে মোসাদের হাত ছিল বলে জানা যায়।

১৯৬৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি মোসাদ এজেন্ট উরুগুয়ের মন্টিভিডিওতে হার্ভাটস্ কোকুরকে ল্যাটভিয়ান ইহুদি হত্যার অন্যতম সংগঠক সন্দেহে গুলি করে হত্যা করে।

মোসাদ এজেন্ট অস্ট্রিয়ার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জর্জ হেয়দার (যিনি ফিলিস্তিনি জনগণের মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে সোচ্চার ছিলেন)-এর বাসস্থান কক্ষে একটি ইঁদুরের গায়ে ক্ষুদ্রাকায় ট্রান্সমিটার যন্ত্র গোপনে প্রতিস্থাপন করে যার উদ্দেশ্য ছিল হেয়দারের উদ্দেশ্য সম্মন্ধে জানা।

১৯৬৬ সালে ইরাকি মিগ-২১-এর খ্রিস্টান পাইলট ইরাকি নাগরিক মুনীর রেদফাকে আমেরিকান এক মিলিয়ন ডলার এর বিনিময়ে মোসাদ রিক্রুট করতে সমর্থ হয়। চুক্তি মোতাবেক মুনীর রাশিয়ান মিগ-২১ বিমানটি ইসরাইলে উড়িয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়। এদিকে মোসাদ এজেন্ট মুনীরের পরিবার পরিজনকে ইরান হয়ে ইসরাইলে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং আশ্রয় দেয়। মোসাদ-এর ভাষায় এ অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন ডায়মন্ড'। রাশিয়ান অত্যাধুনিক মিগ-২১ বিমানটি আমেরিকান সিআইএ এবং তাদের দোসর ইসরাইলি ইঞ্জিনিয়াররা খুঁটে খুঁটে পরীক্ষা করে দেখে। ১৯৬৭ সালের ৬ দিনের যুদ্ধে ইসরাইল অত্যাধুনিক রাশিয়ান মিগ-২১ এর বিপরীতে আমেরিকান প্যান্টম-৪ যুদ্ধ বিমান ব্যবহার করে সিরিয়ার গোলান মালভূমি দখলে নেয় ও সিরিয়ার ৬টি মিগ-২১ বিমান ভূপতিত করতে সক্ষম হয়। সিরিয়া এবং মিসরকে পরাজিত করতে এই মিগ-২১ বিমানটির ক্ষমতা ইসরাইলের যাচাই করার প্রয়োজন ছিল।

১৯৬৭ সালের ২৫শে মে তেলআবিবে অবস্থানরত সিআইএ কর্মকর্তা জন হেডেন-এর সাথে তৎকালীন ইসরাইলি মোসাদপ্রধান মীর অমিত-এর নীতিগত মতপার্থক্য ঘটে। জন হেডেন ঘোষণা দেন যদি ইসরাইল আকস্মিক মিসর আক্রমণ করে তাহলে আমেরিকা মিসরের পাশে দাঁড়াবে। এ কথা শুনে মোসাদ ডিরেক্টর মীর অমিত তড়িগড়ি ওয়াশিংটন ডিসি-তে আমেরিকার তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রবার্ট ম্যাকনামারার সাথে দেখা করে

ইসরাইলের প্রতি মিসরের যুদ্ধংদেহী মনোভাব এবং মিসরের যুদ্ধ প্রস্তুতির ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ করেন।

আমেরিকান পার্লামেন্টে কর্মরত বিভিন্ন ইহুদি সিনেটর এবং ইহুদি লবির সহায়তায় অমিত ম্যাকনামারা তথা আমেরিকান সরকারের নীরব সমর্থন নিয়ে ইসরাইলে ফিরে আসে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ইসরাইল ৫ই জুন মিসর, জর্ডান এবং সিরিয়ার ভূখণ্ডে আকস্মিক বিমান হামলা চালায়।

১৯৬৭ ইং-র ৫ই জুন থেকে শুরু করে ১০ই জুন পর্যন্ত ছয়দিনের ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিজয়ের কাছাকাছি গিয়েও ইসরাইলকে আমেরিকার নৈতিক সমর্থন এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের কারণে মিসর, সিরিয়া এবং জর্ডানকে পরাজয়বরণ করতে হয় এবং ইসরাইল মিসরের সিনাই ও গাজা উপত্যকার বিরাট ভূখণ্ড, জর্ডানের পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুসালেম এবং সিরিয়ার গোলান মালভূমি নিজেদের দখলে নিতে সমর্থ হয়।

মিসরের সাথে শান্তি চুক্তির বিনিময়ে সিনাই মরু অঞ্চল হতে পরবর্তী পর্যায়ে ইসরাইল সেনাসদস্য সরিয়ে নেয় কিন্তু জর্ডান এবং সিরিয়ার মূল্যবান ভূখণ্ড তাদের অধিকারে রাখে। জাতিসংঘে জর্ডান কিংবা সিরিয়ার ভূখণ্ড ইসরাইল ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশ সমর্থন করলেও আমেরিকার ভেটো প্রয়োগে জাতিসংঘের নেওয়া প্রস্তাব বিভিন্ন সময় নাকচ হয়ে যায়।

১৯৬৮ সালে জার্মানির এন্টওয়ার্প হতে আফ্রিকার গিনিওয়ার উদ্দেশে গমনকারী একটি জাহাজ পথিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। জার্মান ইনটেলিজেন্স আবিষ্কার করে যে উক্ত জাহাজে সংরক্ষিত ২০০ টন পরমাণু সরঞ্জাম ছিনতাই করে মোসাদ ইসরাইলি জাহাজে তুলে নেয়।

১৯৬৯ সালে ফ্রান্সের চেরবার্গ প্রজেক্ট হতে আটককৃত ইসরাইলি নেভী বোট ছিনতাই করে মোসাদ ইসরাইলে নিয়ে আসে।

১৯৭২ সালে জার্মানির মিউনিখে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমস্-এ যোগদানরত ১১ জন ইসরাইলি খেলোয়াড় হত্যার সন্দেহভাজন ফিলিস্তিনি ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর-এর সদস্য হোসেইন আল বশিরকে সাইপ্রাসের নিকোসিয়াতে একটি হোটেলকক্ষে মোসাদ এজেন্টরা হত্যা করে।

১৯৭২ সালের ১৬ই অক্টোবর মোসাদ হিট স্কোয়াড ইতালীর রোমে ফিলিস্তিনি নেতা আব্দুল ওয়ায়েল জুয়াইটারকে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর সদস্য সন্দেহে হত্যা করে। ৮ই ডিসেম্বর প্যারিসে পিএলও নেতা ড. মাহমুদ

হামসারিকে মিউনিখ অলিম্পিক ম্যাসাকার-এর সাথে সম্পৃক্ত সন্দেহে মোসাদ এজেন্ট ড. মাহমুদের এপার্টমেন্টের টেলিফোনে গোপনে বিস্ফোরক সংযোজন করে হত্যা করে। একই সালে ফিলিস্তিনি ফাতাহ লিবারেশন ফোর্সের প্রথম সারির সদস্য ও স্বনামধন্য লেখক গাস্সান কানাপানির গাড়িতে বোমা স্থাপন করে মোসাদ লেবাননে হত্যা করে।

১৯৭৩ সালের ২১শে জুলাই নরওয়ের একটি হোটেলের ওয়েটার মরক্কোর নাগরিক আহমেদ বোচিকিকে মোসাদ এজেন্টরা ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর নেতা আলী হাসান সালামা সন্দেহে হত্যা করে। আলী হাসান সালামা মিউনিক অলিম্পিক গেমস্-এ ইসরাইলি ১১ জন খেলোয়াড় হত্যাকারীদের একজন বলে মোসাদের সন্দেহের তালিকায় ছিল। নরওয়ে সরকার আলী হাসানকে আশ্রয় দিয়েছিল। মোসাদ এজেন্টরা উক্ত অপারেশন নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়ার জন্য কানাডিয়ান জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করে। জাল পাসপোর্ট নরওয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়াতে ৬ জন মোসাদ এজেন্টকে গ্রেফতার করা হয়। কানাডিয়ান সরকার তার দেশের পাসপোর্ট জালিয়াতীর জন্য নরওয়ে সরকারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ইসরাইল সরকার ভুলক্রমে বোচিকি হত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং বোচিকি পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে মোসাদ এজেন্টদের ছাড়িয়ে আনে। একই বছর লেবাননে ফিলিস্তিনি ফাতাহ লিবারেশন ফোর্সের সদস্য বাস্সাম আবু শরিফকে মোসাদ পার্সেল বোমার মাধ্যমে হত্যার চেষ্টা করে কিন্তু আবু শরিফ আহত হয়েও প্রাণে বেঁচে যান।

১৯৭৩ সালের ৬ই এপ্রিল প্যারিসে ফিলিস্তিনি পপুলার লিবারেশন ফ্রন্ট সদস্য ড. বাসিল আল-কুবায়সিকে (আইন শাস্ত্রের প্রফেসর, আমেরিকান ভার্সিটি, বৈরুত) মিউনিক ম্যাসাকার-এর সাথে সম্পৃক্ত সন্দেহে মোসাদ হিট স্কোয়াড হত্যা করে। ৯ই এপ্রিল লেবাননের বৈরুতে ফিলিস্তিনি ফাতাহ মুভমেন্টের ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর সদস্য মোহাম্মদ ইউসুফ আল-নাজ্জার, কামাল আদওয়ান ও পিএলও সদস্য কামাল নাসেরকে মোসাদ এজেন্টরা হত্যা করে। ১৩ই এপ্রিল গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের একটি হোটেলকক্ষে মোসাদ এজেন্ট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফিলিস্তিনি ফাতাহ প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত নেতা জিয়াদ মুকাসীকে হত্যা করে। ২৮শে জুন ফিলিস্তিন পপুলার লিবারেশন ফ্রন্টের সিনিয়র সদস্য মোহাম্মদ বোওদিয়াকে প্যারিসে মোসাদ এজেন্ট তার গাড়ির সিটের নিচে বোমা স্থাপন করে হত্যা করে।

১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সলকে তার ভাতিজা প্রিন্স মোসায়েদ একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় গুলি করে হত্যা করে। এ হত্যার পেছনে মোসাদের ইন্ধন ছিল।

আমেরিকা থেকে ১৯৭৯ সালের ২৬শে জানুয়ারীতে প্রকাশিত 'এক্সিকিউটিভ ইনটেলিজেন্স রিভিউ' ম্যাগাজিন হতে জানা যায় আমেরিকার কলারেডোতে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ-ইসরাইল জয়েন্ট স্পাই নেটওয়ার্ক 'এসপিন ইন্সটিটিউট' প্রিন্স মোসায়েদ-এর মগজ ধোলাই করে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার জন্য প্রস্তুত করেছিল। প্রিন্স মোসায়েদ মাদকাসক্ত ছিল এবং তার ইহুদি বান্ধবী ছদ্মবেশী খ্রিস্টিন সুরমা তার শরীরে ইনজেকশনের মাধ্যমে হিরোইন পুশ করত। বাদশাহ ফয়সলকে হত্যা করা হয় এমন একটি সময়ে যখন ইসরাইল মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সাথে ১৯৬৭ সালের ছয়দিনের যুদ্ধে ইসরাইল অধিকৃত সিনাই উপত্যকা ফেরতের বিনিময়ে একটি শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে জোর প্রয়াস চালিয়ে আসছিল।

ফয়সল হত্যার দুদিন পূর্বে আমেরিকার ইহুদি চতুর সেক্রেটারি অব ইউনাইটেড স্টেটস্ হেনরী কিসিঞ্জার বাদশাহ ফয়সলের সাথে একটি জরুরি মিটিং করেন যাতে এ চুক্তিতে সই করতে ফয়সল আনোয়ার সাদাতকে উৎসাহিত করেন। বাদশাহ ফয়সল প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দতকে এ চুক্তি সই করতে নিরুৎসাহিত করেন ফলশ্রুতিতে হেনরী কিসিঞ্জারকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

বাদশাহ ফয়সলকে হত্যার পেছনে এ ধরনের একটি উদ্দেশ্য কাজ করছিল। ফয়সলের মৃত্যুর পর অবশ্য পরে একসময় এ চুক্তি বাস্তবায়িত হয়। বাদশাহ ফয়সল আধুনিক, তেলসমৃদ্ধ বর্তমান সৌদি আরবের প্রকৃত রূপকার। তাঁর শাসনামলেই সৌদিআরব মধ্যপ্রাচ্যের একটি ধনী ও তেলসমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত হয়।

ইসরাইলি স্পাই সংস্থা মোসাদ স্বীকার করে যে, বাদশাহ ফয়সল একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। সৌদি আরবের রাজতন্ত্রের ইতিহাসে এমন রাষ্ট্রনায়ক আর জন্ম নেবে কি না এ ধরনের একটি সংশয়কে সামনে রেখে মোসাদ ও সিআইএ তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে।

১৯৭৭ সালে লন্ডনে দর্শন শাস্ত্রে অধ্যয়নরত ফিলিস্তিনি ছাত্র দোরাক কাসিমকে মোসাদ এজেন্টরা প্রচুর লোভ এবং অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করতে সমর্থ হয়। উক্ত ছাত্র পরবর্তী পর্যায়ে ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের বিশ্বাসভাজন দেহরক্ষীর কাজে নিযুক্ত হয়। ইসরাইল কর্তৃক তিউনিসিয়ায়

পিএলও ঘাঁটি আক্রমণের সময় গোপনীয় তথ্য পাচারকারী বিশ্বাসঘাতক এ দেহরক্ষী ইসরাইলি বিমান আক্রমণে তার একটি পা হারায়। মোসাদ এজেন্টরা তাদের এ দোসরকে গোপনে উত্তর আমেরিকায় সরিয়ে নেয়।

ইয়াসির আরাফাতের সঠিক অবস্থান এবং ফিলিস্তিনি এ নেতা ইসরাইলের বিরুদ্ধে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এ সমস্ত তথ্যাদি মোসাদ হেড কোয়ার্টারে সহজে দোরাক কাসিমের মাধ্যমে পৌঁছে যেত এবং সে অনুযায়ী ইসরাইল চরম আঘাত হেনে পিএলও-র সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিত।

ফিলিস্তিনি বিভিন্ন সামরিক প্রতিষ্ঠানের বহু বিশ্বসঘাতককে বিভিন্ন সময় মোসাদ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে, ফলে ফিলিস্তিনি সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো বার বার ইসরাইলি আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, অসংখ্য মুক্তিকামী মানুষ প্রাণ দিয়েও বিগত ষাট বছরের অধিক সময়ে তাদের হারানো সম্পদ ফিরে পায়নি।

মোসাদ-এর বুদ্ধিমত্তার কাছে পরাজিত হয়ে ফিলিস্তিনি সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সময় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং আত্মকলহ ও অন্তর্দ্বন্ধে লিপ্ত হয়ে ঈপ্সিত লক্ষ অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিককালে ফ্রান্সে প্রয়াত ফিলিস্তিনি নেতা ইয়াসির আরাফাতের মরদেহের অটোসপি রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী জানা যায় ইয়াসির আরাফাতকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল এবং সন্দেহ যে, মোসাদ এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল।

১৯৭৮ সালের ২৮শে মার্চ জার্মানিতে অবস্থানরত ফিলিস্তিনি পপুলার লিবারেশন ফন্টের সক্রিয় নেতা ড. ওয়াদী হাদ্দাদকে মোসাদ এজেন্ট বিষাক্ত চকোলেট খাইয়ে হত্যা করে। হাদ্দাদের মৃত্যুর পর ফিলিস্তিনি পপুলার লিবারেশন ফন্টের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৭৯ সালের ২২ শে জানুয়ারী ফিলিস্তিনি প্রতিষ্ঠান ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর নেতা আলী হাসান সালামা ও তার চার দেহরক্ষীকে মোসাদ লেবাননের বৈরুতে গোপনে তার গাড়িতে বোমা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে হত্যা করে। ২৬শে জুলাই কেনস্-এ পিএলও নেতা জোহায়ের মহসিনকে এক রেস্টুরেন্টের সামনে মোসাদ এজেন্ট গুলি করে হত্যা করে। একই সালে ফিলিস্তিন লিবারেশন অরগেনাইজেশনের অন্যতম নেতা জোহের হোসেনকে মোসাদ ফ্রান্সে গুলি করে হত্যা করে।

১৯৭৯ সালের ৫ই এপ্রিল ফ্রান্সের টওলন এর নিকটে সিনে-সুর-মের নদীবন্দরে ইরাকি পরমাণু প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত খুচরো যন্ত্রাংশ ভর্তি দুটো

কন্টেইনার অপেক্ষমান জাহাজে তোলার প্রাক্কালে তিনজন মোসাদ এজেন্ট গোপনে কন্টেইনারের পাশে বোমা স্থাপন করে এবং রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসের সাহায্যে বোমা ফাটিয়ে কন্টেইনার দুটোর ৬০% খুচরো যন্ত্রাংশ ধ্বংস করে দেয়। যে কারণে ইরাকের আণবিক প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ করা সম্ভব হয়নি এবং বিলম্বের সুযোগ নিয়ে পরবর্তীতে ইসরাইলি বিমানবহর (কোড নাম-অপারেশন বেবিলন) ১৯৮১ সালের ৭ই জুন ইরাকের আণবিক প্রকল্পে চরম আঘাত হেনে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ অকেজো করে দেয়।

কন্টেইনার অভ্যন্তরের খুচরো যন্ত্রাংশের খবরটি মোসাদ সংগ্রহ করতে পেরেছিল প্যারিসে ইরাকের আণবিক প্রকল্পের জন্য কর্মরত ফ্রান্সের বিজ্ঞানীদের সহযোগী ইরাকের পদার্থবিজ্ঞানী ড. বুট্রোস ইবনে হালিম-এর মাধ্যমে। ৪২ বছর বয়স্ক বিবাহিত বুট্রোস ইবনে হালিমকে মোসাদ তাদের ফাঁদে আটকাতে পেরেছিল মোসাদ এজেন্ট 'দিনা' নামক এক সুন্দরী যুবতীকে লেলিয়ে দিয়ে। 'দিনা' হালিমকে অবাধে সঙ্গ দিয়ে এবং প্রেমের অভিনয় করে হালিমের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিল ঠিক তখনই দিনার অন্য এক বন্ধু (মোসাদ এজেন্ট) দিনার মাধ্যমে হালিমকে অন্য একটি লাভজনক পার্শ-ব্যবসায় অংশীদারত্বের লোভ দেখিয়ে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে তাকে প্রচুর টাকা সম্মানীসূচক অগ্রিম দেওয়ার মাধ্যমে মোসাদের ফাঁদে আটকিয়ে হালিমের কার্যকলাপ এবং ইরাকের এই গোপন প্রকল্প সম্মন্ধে ইসরাইল পুরোপুরি অবহিত হয়।

১৯৮০ সালের ১৩ই জুন মোসাদ হিট স্কোয়াড ইরাকে কর্মরত মিসরীয় পরমাণু বিজ্ঞানী ড. ইয়াহিয়া আল মেসাদকে প্যারিসের ম্যারিডিয়ান হোটেলকক্ষে জবাই করে হত্যা করে। উক্ত বিজ্ঞানীর হোটেল কক্ষে প্রচুর টাকায় ভাড়া করা সুন্দরী পতিতা 'মেরি ক্লোড ম্যাগালকে' লেলিয়ে দিয়েছিল প্যারিসে কর্মরত মোসাদ এজেন্ট। হোটেল কক্ষে হোটেলেরই একজন কর্মচারী সেজে ভাড়া করা এই পতিতা মেসাদের শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করলে উক্ত বিজ্ঞানী আকৃষ্ট হন। হত্যাকাণ্ডের পরপরই ম্যাগালকে নিয়ে মোসাদ এজেন্টরা হোটেল হতে নিরবে পালিয়ে যায়। ম্যাগাল জানত না যে এটা ইসরাইলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের পরিকল্পিত কাজ। নির্মম এই হত্যাকান্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে পরবর্তীতে ম্যাগাল পুলিশকে জানিয়ে দেবে বলে হুমকি দিলে ১৯৮০ সালের ১২ই জুলাই মোসাদ এজেন্ট মার্সিডিস গাড়ির ধাক্কায় ম্যাগালকে প্যারিসের রাস্তায় হত্যা করে।

ইরাক ও ইরান ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে এক ভয়াবহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধ ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর হতে শুরু করে ১৯৮৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর স্থায়ী হয়। কানাডায় বসবাসকারী অবসরপ্রাপ্ত মোসাদ-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ভিক্টর অস্ট্রোভাস্কি তার বই 'বাই ওয়ে অব ডিসেপশন'-এ বর্ণনা করেছেন, কীভাবে মোসাদ ও সিআইএ এজেন্টরা এ যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করে ইরাক ও ইরানের মেরুদণ্ড ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়েছিল! এ যুদ্ধে ইরাককে অস্ত্রসম্ভার দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তাদের মিত্র শক্তিগুলো। অন্যদিকে ইরানকে অস্ত্রে সজ্জিত করেছিল ইসরাইলের মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি। মোসাদ কর্মকর্তা তার গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯৬৭ সালে মিসর, সিরিয়া ও জর্ডানের সাথে যুদ্ধে যে সমস্ত অস্ত্র ইসরাইল ব্যবহার করেছিল তারমধ্যে যেগুলো অব্যবহৃত ছিল সে সমস্ত জং ধরা অস্ত্রগুলো রং করে পুনরায় ইরানের কাছে বিক্রি করে ইসরাইল অর্থনৈতিক ভাবে প্রচুর লাভবান হয়েছিল। অন্যদিকে ইরাকের কাছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন তাদের পুরানো মডেলের অস্ত্রগুলোর সৎকার করতে পেরেছিল। ইসরাইলি সমরাস্ত্র ডিলার ইয়াকুব নিমরডি ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি চুক্তি সাক্ষর করেছিল যার বিপরীতে সমরাস্ত্রের প্রাথমিক মূল্য ধরা হয়েছিল ১৩,৫৮,৪২,০০০ (তেরো কোটি আটান্ন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার) আমেরিকান ডলার। তাছাড়া লেবাননে বসবাসরত বিলিয়নার অস্ত্র ব্যবসায়ী সৌদি নাগরিক আদনান খাশোগির মাধ্যমে ইসরাইল উভয় দেশে প্রচুর অস্ত্রসম্ভার বিক্রি করে। সৌদি নাগরিক আদনান খাশোগিকে অস্ত্র ব্যবসার প্রলোভন দেখিয়ে ইসরাইলি মোসাদ একসময় রিক্রোট করতে সমর্থ হয়েছিল। সৌদি গোয়েন্দা সংস্থা এ খবর পেলে আদনান খাশোগিকে সৌদি সরকার দেশে ফিরে আসার পথ রুদ্ধ করে দেয়। এ কারণে খাশোগি লেবাননে ও আমেরিকায় বসবাস শুরু করেন।

মোসাদ ও সিআইএ যুদ্ধ প্রলম্বিত করে ইরাক ও ইরান থেকে হাজার হাজার কোটি ডলার হাতিয়ে নেয়। বৃহৎ শক্তিবর্গ এভাবেই উচ্চাভিলাষী ও উঠতি দেশগুলোর মধ্যে বিবাদ লাগিয়ে তাদের পুরানো অস্ত্রভাণ্ডার খালি করার প্রয়াস চালায়।

কানাডায় বসবাসরত প্রাক্তন মোসাদ কর্মকর্তা তার গ্রন্থে লিখেছেন, লন্ডনে অবস্থানরত ইসরাইলি মোসাদ এজেন্ট প্রতিদিন লন্ডনস্থ ইরাক ও ইরানের দূতাবাসে বন্ধু সেজে উভয় দেশের তেলবাহী জাহাজের অবস্থান

জানাত। বলাবাহুল্য, যুদ্ধের অর্থ সংগ্রহের জন্য ইরাক ও ইরান উভয়পক্ষকেই জ্বালানী তেলের বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হতো। এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত মোসাদ ও সিআইএ-র এজেন্টরা ইরাক ও ইরানের তেলবাহী জাহাজ কোথায় কোনটি অবস্থান করছে তা লন্ডনস্থ মোসাদ এজেন্টকে সঠিক সময়ে জানাত। এ নির্ভুল তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে ইরাক ও ইরান একে অপরের তেলবাহী জাহাজগুলো বোমা মেরে তাৎক্ষণিক ডুবিয়ে দিয়ে নিজেদের কৃতিত্বের প্রশংসা করত। ইরানের হরমুজ প্রণালী, ভূমধ্য সাগর, আরব সাগর কিংবা লোহিত সাগরের তলদেশে তেলবাহী জাহাজের সারি হতে স্খলিত ভাসমান তেলের প্রলেপে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ দেখিয়ে আবার আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের রেসকিউ জাহাজ এসে ভাসমান তেলগুলো শোষণ করে নিজ দেশে নিয়ে যায়। আবার তেল শোষণের খরচ যুদ্ধ বিধ্বস্থ ইরাক ও ইরানকেই যোগান দিতে হয়।

বিশ্লেষকদের মতে, বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধে ইরাকের প্রায় ৭ লক্ষ ও ইরানের প্রায় ১০ লক্ষ সেনাসদস্য নিহত হয়েছে। ইরান ও ইরাকের ১২-১৬ বছর বয়সের স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত অসংখ্য মিলিশিয়াকে এ যুদ্ধে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল। জর্জ বুশ ইরাকের সাদ্দাম হোসেনকে বেছে নিয়েছিল ইরানকে শায়েস্তা করতে, সেই বুশই সাদ্দাম হোসেনকে শেষপর্যন্ত ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়েছে।

১৯৮১ সালের ৭ই জুন আমেরিকায় তৈরি ইসরাইলের ২৪টি এফ-১৫ বিমান বহর 'অপারেশন ব্যাবিলন' কোড নামে বাগদাদের সন্নিকটে টোয়াইতা নামক স্থানে ফ্রান্সের সহায়তায় নির্মিত ইরাকের ৭০০ মেগাওয়াট আণবিক প্রকল্প তামোজ-১৭ বা ওসিরাক প্রকল্প সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। একমাস পর জুলাই মাসে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কর্তৃক এ প্রকল্প উদ্বোধন করার কথা ছিল। প্রয়াত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেইন এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইরাককে আণবিক শক্তিধর দেশে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। একই সালে ডিসেম্বরে ফিলিস্তিনি আরব লিবারেশন ফ্রন্টের প্রধান আব্দুল ওহাব কৈয়ালীকে মোসাদ এজেন্ট লেবাননের রাজধানী বৈরুতে হত্যা করে। ৩রা জুন ব্রাসেলস্, বেলজিয়াম ব্যুরোর পিএলও সদস্য নায়েম কাদেরকে মোসাদ এজেন্ট রাস্তায় গুলি করে হত্যা করে।

কট্টর ইসলামি নেতা খোমেনি ১৯৮১ সালে শাহ রেজা পাহলভিকে মিসরে নির্বাসিত করে ইরানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন

এবং ইসরাইলের প্রতি সমর্থন তুলে নেন ফলে ইসরাইলের সাথে ইরানের সম্পর্কে চিড় ধরে। ইরানের অনেক মিলিটারি জেনারেলকে দেশের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে খোমেনি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান এবং অনেককে ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে পাঠিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করেন। বিপদের গন্ধ পেয়ে মোসাদ তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু জেনারেল আলী রেজা আসকরিকে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সপরিবারে ইরান হতে ইসরাইলে সরিয়ে নেয়। ব্রিটেনের দি সানডে টাইমস্-এ প্রকাশিত খবরে জানা যায় জেনারেল আলী রেজা আসকারী ২০০৩-২০০৭ সাল পর্যন্ত থেকে মোসাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯৮৩ সালের ২১শে আগস্ট সিনিয়র পিএলও নেতা মামুন মেরাইশকে গ্রিসের এথেন্সে মোটরসাইকেলবাহী মোসাদ এজেন্ট তার গাড়িতে গুলি করে হত্যা করে।

১৯৮৪ সালে ইথিওপিয়া এবং সুদানের বর্ডার এলাকার দুর্ভিক্ষ কবলিত ইহুদি জনগোষ্ঠিকে হেলিকপ্টর বহরের মাধ্যমে রাতের অন্ধকারে মোসাদ সুদান হতে ইসরাইলে সরিয়ে নিতে সমর্থ হয়।

১৯৮৬ সালের ৯ই জুন ফিলিস্তিন ডেমোক্রেট লিবারেশন ফ্রন্টের সেক্রেটারি খালিদ নাজ্জালকে হোটেল হতে নির্গমনের পথে মোসাদ এজেন্ট গুলি করে হত্যা করে। একই সালে মোসাদ নারী এজেন্ট 'চ্যারিল বেনটভ' প্রেমের অভিনয় করে প্রাক্তন ইসরাইলি পরমাণু টেকনিশিয়ান মোরদেচাই ভেনুনুকে যুক্তরাজ্য হতে ইতালীতে নিয়ে আসে এবং ভেনুনুকে প্রেমের ফাঁদে নেশাগ্রস্থ করে ঐ তরুণী ভ্রমণের ভান করে গভীর সমুদ্রে মোসাদ নির্ধারিত জাহাজের কাছাকাছি নিয়ে যায়। সেখানে অপেক্ষমান ইসরাইলি জাহাজে করে মোসাদ এজেন্টরা ভেনুনুকে সরাসরি ইসরাইলে নিয়ে আসে এবং তার বিরুদ্ধে ইসরাইলি পরমাণু প্রকল্পের অতি গোপনীয় ৫৭টি ফটো ব্রিটিশ মিডিয়ার কাছে হস্তান্তর করার অভিযোগে আঠারো বছর কারাবন্দি করে রাখা হয়।

ভেনুনু ইহুদি হতে ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার এক জবানবন্দীতে তিনি বলেছেন আমাকে জেল অভ্যন্তরে অকথ্য নির্যাতন করা হয়। যদি আমি ধর্মান্তরিত না হয়ে ইহুদি থাকতাম তাহলে হয়তো এমন নির্যাতনের শিকার হতাম না।

তিনি লন্ডনের 'দ্য সানডে টাইমস্'-কে বলেছেন ইসরাইলের ডিমোনা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে কমপক্ষে ১৫০টি নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড রয়েছে

অথচ ইসরাইল প্রতিবেশী দেশসমূহসহ সকল মুসলিম বিশ্বে পারমাণবিক প্রকল্পে বাধা দিয়ে আসছে। তিনি আরও বলেছেন ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যের এক অশুভ শক্তি। এর ধ্বংস হওয়া উচিত কারণ ওরা ফিলিস্তিনি জনগণকে ভিটেছাড়া করেছে এবং নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে আসছে।

ভেনুনুকে ২০০৯ সালে নরওয়ের নোবেল পিস প্রাইজ কমিটি ইসরাইলি পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতের বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদ জানানোর জন্য শান্তি পদক দিতে চাইলে ভেনুনু তা নিতে অস্বীকার করেন। তিনি বিভিন্ন মিডিয়াকে বলেছেন ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট সিমন পেরেজ ইসরাইলের পারমাণবিক প্রকল্পের মূল হোতা। বর্তমানে ভেনুনু ইসরাইল সরকার কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে কারামুক্ত হলেও ইসরাইল অভ্যন্তরে নজরবন্দি রয়েছেন।

১৯৮৮ সালের ১৬ই এপ্রিল পিএলও সেকেন্ড-ইন-কমান্ড আবু জিহাদকে এবং ফাতাহ মুভমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা খলিল আল-ওয়াজিরকে মোসাদ কমান্ডো বাহিনী তিউনিসিয়াতে হত্যা করে।

১৯৯০ সালের ২২শে মার্চ বেলজিয়ামের ব্রাসেলস্-এর একটি এপার্টমেন্টে কানাডিয়ান ব্যালাস্টিকস্ এক্সপার্ট এবং ইঞ্জিনিয়ার 'গেরাল্ড বোল' যিনি ইরাকের 'প্রজেক্ট বেবিলন সুপারগান'-এ কর্মরত ছিলেন তাকে মাথায় গুলি করে হত্যা করে। একই সালে মোসাদ আবিষ্কার করে যে, একজন হিজবুল্লাহ এজেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অত্যাধুনিক অস্ত্র সংগ্রহে তৎপর রয়েছে। মোসাদ এবং সিআইএ ঐ হিজবুল্লাহ সদস্যের উপর কড়া নজর রাখে যাতে তার মাধ্যমে তাদের অন্যান্য কর্মরত হিজবুল্লাহ সদস্যের হদিস পায়। পরবর্তী পর্যায়ে মোসাদ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে হিজবুল্লাহ এজেন্টকে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৯০ সালে জার্মান কম্পিউটার প্রযুক্তির গভীরে প্রবেশ করে মোসাদ এজেন্ট জার্মান কম্পিউটার টেকনোলজির গোপন তথ্য চুরি করে মোসাদ ব্যবহৃত কম্পিউটর প্রযুক্তিকে অধিকতর শক্তিশালী করে।

১৯৯১ সালে উত্তর কোরিয়া হতে সিরিয়ার জন্য মিসাইল সামগ্রী নিয়ে মরক্কোর ক্যাসাব্ল্যাংকা বন্দরে আল-ইয়ারমুক জাহাজ নোঙ্গর করে। গোপনে মোসাদ গোয়েন্দারা উক্ত জাহাজে ট্রাকিং ডিভাইস সংযোজন করে রাখে এবং পরবর্তীতে এর সহায়তায় নিশ্চিত লক্ষ্য ঠিক করে ইসরাইলি বিমানবহর হামলা চালিয়ে আল-ইয়ারমুক জাহাজটি রসদসামগ্রীসহ ডুবিয়ে

দেয়। একই সালে পিএলও ইনটেলিজেন্স প্রধান সালাহ খালাফকে তিউনিসিয়ায় মোসাদ হত্যা করে। পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাতের পরেই খালাফের স্থান ছিল।

৪ঠা নভেম্বর ১৯৯১ সালে ব্রিটিশ বহুল প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা 'দ্য ডেইলী মিরর' এর সম্পাদক ও মালিক ৬৭ বছর বয়স্ক রবার্ট ম্যাক্সওয়েল যাকে ইসরাইলি মোসাদ গুপ্তচর সংস্থার 'সুপার স্পাই' হিসেবে অভিহিত করা হতো তাকে ভ্রমণ তরী 'লেডি গিসলেইন'-এ প্রতিশ্রুত চার মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ দেওয়া হবে জানিয়ে মোসাদ সদস্যরা তাকে জিব্রাল্টার হতে ক্যানারী আইল্যান্ড পর্যন্ত এক সৌখিন যাত্রার ব্যবস্থা করে। ম্যাক্সওয়েল ভাবতেও পারেননি যে, মোসাদ তাকে হত্যা করতে পারে। যেহেতু মোসাদের কাছে তিনি একজন সম্মানিত সুপার স্পাই হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। ভ্রমণের এক পর্যায়ে নেশাগ্রস্থ ও লেথেল ইনজেকশন প্রয়োগ করে মোসাদের চার সদস্য সাগরের পানিতে নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে। ম্যাক্সওয়েল ইসরাইলি মোসাদ সংস্থার কাছে তার প্রেরিত গোপন সংবাদ প্রেরণের জন্য চার মিলিয়ন পাউন্ড দাবি করেছিলেন এবং যদি তা না দেওয়া হয় তাহলে আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীনসহ অন্যান্য পরাশক্তির কাছে মোসাদের বিভিন্ন গোপনীয় তথ্য ফাঁস করে দেবেন বলে হুমকি দেওয়ার পর মোসাদ ম্যাক্সওয়েলকে হত্যার পরিকল্পনা নেয়।

ম্যাক্সওয়েল তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের উচ্চমহলে বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সাউথ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে দুজন ইরানি ইনটেলিজেন্স এজেন্টকে মোসাদ এজেন্টরা অনুসরণ করে এবং জোহান্সবার্গ সরকারের অধীনে কর্মরত একজন ইহুদি সেচ্ছাসেবির মাধ্যমে মোসাদ জানতে পারে যে, ইরানের এ দুজন এজেন্ট সাউথ আফ্রিকা হতে গোপনে উন্নত প্রযুক্তির অস্ত্র সরঞ্জামাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে এসেছে। মোসাদ এজেন্টরা সাউথ আফ্রিকার নকল সিকিউরিটি সদস্য সেজে উক্ত দুজন ইরানিকে ছিনতাই করে তাদের এক ওয়্যারহাউসে নিয়ে বেদম প্রহার করে সাউথ আফ্রিকা ছেড়ে যেতে বাধ্য করে।

আফ্রিকার জিম্বাবুয়েতে বসবাসরত ইহুদি জনগোষ্ঠিকে সুদানের অনুরূপ কৌশলে মোসাদ ইসরাইলে সরিয়ে নিয়ে যায়। জিম্বাবুয়ে সরকার পিএলও ও লিবিয়ার সমর্থক ছিল বিধায় মোসাদ এ গোপন কৌশল অবলম্বন করে। তাছাড়া মোসাদ সদস্য কৌশলে জিম্বাবুয়ে সরকারের ইনটেলিজেন্স এজেন্সিতে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে আফ্রিকার কঙ্গো হতে উর্বর ইউরেনিয়াম জিম্বাবুয়ে হয়ে উত্তর কোরিয়া, ইরান ও সিরিয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

১৯৯২ সালে ফিলিস্তিন পপুলার লিবারেশন অরগেনাইজেশনের টপ সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট আতেফ বাসিসোকে মোসাদ হিট স্কোয়াড ফ্রান্সের লেফট ব্যাংক হোটেলের সামনে গুলি করে হত্যা করে। একই সালে ফিলিস্তিনি সিরিয়াপন্থী প্রতিষ্ঠান হিজবুল্লাহ-এর সেক্রেটারি জেনারেল আব্বাস আল মোছাওয়িকে লেবাননে হত্যা করে মোসাদ।

মোসাদ বসনিয়ান ইহুদি জনগোষ্ঠিকে ১৯৯২-৯৩ সালে রাজধানী সারাজিভো হতে নিরাপদে বিমানে ও স্থলপথে তেলআবিবে নিয়ে আসে।

১৯৯৫ সালে ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদ এর সদস্য ফাতহি সিকাকিকে মালটার ডিপ্লোমেট হোটেলের সামনে মোসাদ এজেন্ট গুলি করে হত্যা করে।

১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বরে হামাস নেতা খালেদ মিশালকে বিষ পানের মাধ্যমে মোসাদ হত্যা করে।

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাঁচজন মোসাদ এজেন্ট সুইটজারল্যান্ডে আবস্থানরত একজন হিজবুল্লাহ সদস্যের বাসস্থানের চারপাশে বোমার সরঞ্জাম পুঁতে রাখার সময় সুইস গোয়েন্দাদের কাছে একজন হাতেনাতে ধরা পড়ে। বিচারে সে দোষী সাব্যস্থ হয় এবং একবছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং পরবর্তী ৫ বছরের জন্য সুইটজারল্যান্ডে তার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়।

২০০০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ফাতাহ নেতা সামি মালাবিকে গাজা ভূখণ্ডে মোসাদ এজেন্ট মালাবির মোবাইল ফোনে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করে।

২০০১ সালের ১৭ই জানুয়ারি বেথেলহেমে ইজ্ আদ-দীন আল কাসেম ব্রিগেডের কমান্ডার ওমর ও অন্য একজন হামাস নেতা মোসাদের মিসাইল আক্রমণে নিহত হন। ৩রা ফেব্রুয়ারি গাজা ভূখণ্ডে মোসাদের গুলিতে হিজবুল্লাহ সদস্য লেঃ কর্নেল মাসউদ আইয়াদ নিহত হন। ২৪শে

জুন নাবলুসে আল-আকসা শহিদ ব্রিগেডের সদস্য ওসামা জাওয়ারিরিকে মোসাদ মোবাইল বোমায় হত্যা করে। ৩১শে জুলাই হামাসের প্রথম সারির নেতা জামাল মনসুর নাবলুসে মোসাদের হেলিকপ্টার বহর হতে প্রেরিত মিসাইল আক্রমণে নিহত হন। ৫ই আগস্ট হামাসের ছাত্র সংগঠনের নেতা আমর হাদিরি মোসাদের মিসাইল আক্রমণে নিহত হন। ২০শে আগস্ট ফাতাহ নেতা ইমাদ আবু সিনাকে ফিলিস্তিনের হেবরনে মোসাদ এজেন্টরা গুলি করে হত্যা করে। ২৭শে আগস্ট জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের রামাল্লা শহরে ফিলিস্তিনি পপুলার ফ্রন্টের সেক্রেটারি জেনারেল আবু আলী মোস্তফাকে মোসাদ বাহিনি এপ্যাচী হেলিকাপ্টার হতে মিসাইল নিক্ষেপে হত্যা করে।

২০০১ সালে মোসাদ আমেরিকান সিআইএ ও এফবিআই- কে জানায় যে, প্রায় ২০০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড কোন সন্ত্রাসী হামলা ঘটাতে। যুক্তরাষ্ট্র এ খবরের সত্যতা সম্মন্ধে সন্দেহ পোষণ করে কিন্তু এর মাসখানেক পর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগণে প্রচণ্ড আঘাত আসে। তবে অনেকে মনে করেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং আমেরিকার অন্যান্য স্থাপনায় মোসাদই আক্রমণ পরিচালিত করে এবং আমেরিকার উচ্চমহলে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন ইহুদি সিনেটর ও তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের সহায়তায় আল-কায়েদার উপর দোষ চাপায়। এধরনের পরিকল্পিত আক্রমণ আল-কায়েদা নেটওয়ার্ক করতে পারে বলে আমেরিকার সিআইএ এবং এফবিআই গুপ্তচর সংস্থার উচ্চমহলের অনেকেই বিশ্বাস করেনা।

২০০২ সালে ফিলিস্তিনে ইসরাইলি মোসাদ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বোমা জাতিসংঘ পরিচালিত অন্ধ শিশু বিদ্যালয়ে আঘাত হানে এবং এতে ৪০০ শিশুদের মধ্যে অনেকে আহত হয় এবং অনেক অন্ধ শিশুদের প্রাণহানি ঘটে (ডেইলি টেলিগ্রাফ,ইউ.কে,মার্চ ০৩,২০০২)। একই সালে ফিলিস্তিনি পপুলার ফ্রন্ট লিবারেশন ফোর্সের নেতা জিহাদ আহমদ জিবরিল মোসাদ কর্তৃক লেবাননে নিহত হন। ১৪ই জানুয়ারি পশ্চিম তীরের শহর তুলকারেমে আল-আকসা শহিদ ব্রিগেড প্রধান রায়েদ কারমীকে বোমার আঘাতে মোসাদ হত্যা করে।

২০০৪ সালে সিনিয়র হিজবুল্লাহ সদস্য গালেব আওয়ালিকে মোসাদ লেবাননে হত্যা করে। ২৮শে ফেব্রুয়ারি জাবালিয়া ফিলিস্তিনি আশ্রয় শিবির হতে অন্যত্র যাওয়ার পথে মোসাদ ইসলামিক জিহাদ কমান্ডার মোহাম্মদ

জুদাহ ও তার দুজন সহযাত্রীকে হেলিকাপ্টার গানশিপ হতে মিসাইল আক্রমণে হত্যা করে। ৩রা মার্চ গাজা সিটিতে সিনিয়র হামাস নেতা তারাদ জামাল, ইবরাহিম দায়িরি ও আম্মার হাসান-এর গাড়ি লক্ষ করে একই কায়দায় মোসাদ তাদের সকলকে হত্যা করে। সেপ্টেম্বর মাসে সিরিয়ার দামেস্ক শহরে ফিলিস্তিনি হামাস নেতা ইজ-আল-দীন শেখ খলিলকে তার গাড়ির চাকায় বোমা পেতে হত্যা করে। ১৭ই এপ্রিল আহমদ ইয়াসিনের স্থলাভিষিক্ত হামাসের অন্যতম যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল আজিজ আল-রানতিসি ও তার পুত্রকে গাজা ভূখণ্ডে মিসাইল আক্রমণে হত্যা করে। ২১শে অক্টোবর গাজায় হামাস অস্ত্র বিশারদ আদনান আল-গউল ও তার সহযোগী ইমাদ আব্বাসকে তাদের গাড়িতে হত্যা করে। একই সালে উত্তর কোরিয়াতে সিরিয়া এবং ইরানের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামে কর্মরত বেশ কিছু সিরিয়ান নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী এবং পারমাণবিক চুল্লীতে ব্যবহারযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি বহনকৃত একটি ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মোসাদ সিরিয়ান সকল বিজ্ঞানীদের হত্যা ও বহনকৃত সকল সম্পদ ধ্বংস করে দেয়।

২০০৬ সালের ২৫শে মে লেবাননের সিডনে ইসলামিক জিহাদ নেতা মাহমুদ আল-মাজয়ুব-এর গাড়িতে বোমা পুঁতে মোসাদ হত্যা করে। ৮ই জুন পপুলার রেসিস্টেন্ট কমিটি-এর প্রতিষ্ঠাতা, ফাতাহ এবং তানজিম গ্রুপ-এর প্রাক্তন নেতা জামাল আবু সামাহদানা তার তিন সহযোগীসহ ইসরাইলি বিমান আক্রমণে নিহত হন।

২০০৮ সালের ১লা আগস্ট সিরিয়ার মিলিটারী জেনারেল মোহাম্মদ সুলাইমান যিনি সিরিয়া সরকার এবং হিজবুল্লাহর মধ্যে প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন তাকে অতর্কিত আক্রমণে মোসাদ হত্যা করে। ১২ই ফেব্রুয়ারি হিজবুল্লাহর সিনিয়র নেতা ইমাদ মুগনিয়াকে দামেস্ক শহরে মোসাদ ও সিআইএ-এর যুক্ত পরিকল্পনায় হত্যা করা হয়। মোসাদের সন্দেহ, এই নেতা ১৯৮৩ সালে দামেস্ক শহরে আমেরিকান দূতাবাসে বোমা হামলার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। একই সালে সিরিয়ার পরমাণুবিজ্ঞনী প্রধান মোহাম্মদ সুলাইমানকে সাগর সৈকতে ভ্রমণের সময় একটি স্পীড বোট হতে গুলি করে খুন করে মোসাদ।

২০০৯ সালের ১লা জানুয়ারি হামাসের প্রথম সারির কমাণ্ডার ও নীতিনির্ধারক নিজার রাইয়ান, তার চার স্ত্রী ও এগারো সন্তানকে মিসাইল আক্রমণে মোসাদ হত্যা করে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এ ধরনের নারী এবং শিশু হত্যার নিন্দা জানালে ইসরাইল সরকার হামাসের

অস্ত্রাগার ধ্বংসের পরিকল্পনার কথা জানায় এবং এ হত্যাকাণ্ডকে নিছক দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করে দোষ খণ্ডন করে। ৩রা জানুয়ারি হামাসের অন্য একজন কমান্ডার আবু জাকারিয়া আল জামাল যিনি হামাসের রকেট নিক্ষেপণ স্কোয়াডের সাথে যুক্ত ছিলেন তাকে হত্যা করা হয়। ১৫ই জানুয়ারী ফিলিস্তিনি সরকার শাসিত জাবালিয়াতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ সিয়াম, তার ভ্রাতা, পুত্র এবং হামাস জেনারেল সিকিউরিটি সার্ভিস কমান্ডার সালাহ আবু সারার্ককে মোসাদ হত্যা করে। ৪ঠা মার্চ প্রথম সারির ইসলামিক জিহাদ নেতা খালেদ সালানকে গাজা ভূখণ্ডে মোসাদ হত্যা করে।

২০১০ সালের ১২ই জানুয়ারি তেহরানে ইরানের পরমাণু বিজ্ঞানী মাসহুদ আলী মোহাম্মদীর গাড়িতে বোমা স্থাপন করে মোসাদ হত্যা করে। ১৯শে জানুয়ারি সিরিয়াভিত্তিক হামাস-এর মিলিটারি কমান্ডার মাহমুদ আল-মাবুতকে দুবাইয়ের হোটেল 'আল-বোস্তান রতানা'র ১৩০ নং কক্ষে রাত সাড়ে নটার দিকে ইলেক্ট্রিক শক ও লেথেল ইনজেকশন প্রয়োগ করে ব্রিটিশ এবং আইরিশ পাসপোর্টধারী মোসাদ এজেন্টরা হত্যা করে।

প্যারিস ভিত্তিক প্রকাশিত ইনটেলিজেন্স অনলাইন জার্নাল এবং হোটেলের সিসিটিভিতে ধারণকৃত ছবি হতে জানা যায় এ অভিযানে মোসাদের মোট ১০জন সদস্যের মধ্যে তিনজন নারী সদস্য ছিল। প্রথমে নারী সদস্যের একজন ওয়েটার সেজে মাহমুদ আল মাবুতের ১৩০ নং কক্ষের দরজায় টোকা দেয়। মাবুত এর কিছুক্ষণ পূর্বে দুবাইয়ের সিরিয়ান কনস্যুলেট হতে জরুরি মিটিং শেষে ফিরেছিলেন।

নারী ওয়েটারের শব্দ শুনে দরজা খোলা মাত্রই মোসাদ হিট স্কোয়ার্ডের তিনজন সদস্য মাবুতের উপর চড়াও হয় এবং ঠান্ডা মাথায় খুন করে দরজা লাগিয়ে পালিয়ে যায়। ৩১শে জুলাই গাজা ভূখণ্ডে হামাস মিলিটারী কমান্ডার এবং রকেট বিজ্ঞানী ইসা আল-বাতরানকে হেলিকপ্টার গানশিপ হতে গুলি করে মোসাদ হত্যা করে।

ফ্রান্সের 'লা ফিগারো' পত্রিকায় খবরে জানা যায় ২০১০ সালের ১২ই অক্টোবরে ইরানের ইমাম আলী মিলিটারী বেইসে যে ভয়াবহ বিস্ফোরণে সংগঠিত হয় তার পেছনে মোসাদের হাত ছিল। উক্ত বিস্ফোরণে ইরান রেভ্যুলশনারী গার্ডের ১৮ জন সদস্যের মৃত্যু হয় এবং ১০ জন গুরুতর আহত হয়। মৃতদের মধ্যে রিভলিউশনারী গার্ড প্রধান জেনারেল হাসান তেহরানি মোকাদ্দাম নিহত হন যিনি ইরানের দূরপাল্লার মিসাইল প্রোগ্রামের দায়িত্বে ছিলেন। তাছাড়া সন্দেহ করা হয় যে, ইরানের নিউক্লিয়ার

প্রোগ্রামের পদার্থ বিজ্ঞানী যথাক্রমে মাসুদ আল মোহাম্মদী, আর্দেসির হোসেইনপোর এবং মোস্তফা আহমদী রওশনকে বিভিন্ন সময় মোসাদ এজেন্টরা হত্যা করে। ৩রা নভেম্বর গাজা ভূখণ্ডে ইসলামিক জিহাদ কমান্ডার মোহাম্মদ নিমনিম-এর গাড়িতে বোমা পেঁতে হত্যা করে মোসাদ। ১৭ই নভেম্বর গাজা ভূখণ্ডে ইসলামিক জিহাদ কমান্ডার মোঃ ইয়াসিনকে ইসরাইলি বিমান আক্রমণে হত্যা করা হয়। ২৯শে নভেম্বর ইরানের পারমাণু বিজ্ঞানী ড. মজিদ শাহরিয়ারি এবং ফেরিদৌন আব্বাসির গাড়িতে মোসাদ এজেন্ট বোমা পুঁতে রাখে। বিস্ফোরণে ড. মজিদ নিহত হন এবং গুরুতর আহত হয়ে ডঃ ফেরিদৌন প্রাণে বেঁচে যান।

ইসরাইলের তৎকালীন মোসাদ প্রধান মীর দাগান সংবাদ সম্মেলনে 'ইরানের গুরুত্বপূর্ণ ব্রেইন' পৃথিবী হতে বিদায় নেওয়ার জন্য শোকরিয়া জানান। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মোসাদ এ সমস্ত হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। ইসরাইল এবং আমেরিকা চায় না ইরান আণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন হোক যে কারণে বর্তমান মোসাদ প্রধান তামির পার্ডো ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যদি ইসরাইল ইরানের আণবিক শক্তিকেন্দ্রে আচমকা অভিযান চালায় তাহলে আমেরিকার প্রতিক্রিয়া কী হবে? উত্তরে আমেরিকা ইরানকে অবরোধের মাধ্যমে একঘরে এবং শক্তিহীন করে দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। ইসরাইল ও আমেরিকা সাম্প্রতিককালে জাতিসংঘের আণবিক পরিদর্শকদের মাধ্যমে ইরানের আণবিক প্রোগ্রাম বন্ধ করার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। পরিদর্শকদের মধ্যে অনেক ইহুদি পরিদর্শক রয়েছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

২০১১ সালের ১১ ই জানুয়ারি গাজা ভূখণ্ডে ইসলামিক জিহাদ রকেট নিক্ষেপণকারী সদস্য মোহাম্মদ এ. নাজ্জার মটর সাইকেলে আরোহণরত অবস্থায় ইসরাইলি বিমান আক্রমণে নিহত হন। ৯ই এপ্রিল গাজা ভূখণ্ডে উচ্চপদস্থ হামাস কমান্ডার তৈসির আবু স্নিমা ও তার দুজন দেহরক্ষী মোসাদের বিমান আক্রমণে নিহত হন। ২৩শে জুলাই ইরানের পরমাণু বিজ্ঞানী ড. দারউইস রেজাইনিজাদকে মটর সাইকেল আরোহী মোসাদ এজেন্ট গাড়িতে গুলি করে হত্যা করে। ১৮ই আগস্ট গাজা ভূখণ্ডে পপুলার রেসিস্টেন্ট কমিটি কমান্ডার আবু কুদ আল নীরব এবং খালেদ সাথকে মোসাদ হত্যা করে।

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিরার আবু সিসি নামের একজন ফিলিস্তিনি ইঞ্জিনিয়ার ইউক্রেনের নাগরিকত্ব লাভের চেষ্টা করতে গিয়ে

ইউক্রেনের একটি ট্রেনে মোসাদ এজেন্টের কাছে ধরা পড়ে। তিনসপ্তাহ পরে তাকে ইসরাইলের জেলহাজতে দেখা যায়।

২০১২ সালের ৯ই মার্চ গাজা ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনি পপুলার রেসিস্টেন্ট কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল জোহের আল-কায়িসিকে বিমান আক্রমণে মোসাদ হত্যা করে। ১৪ই নভেম্বর গাজা ভূখণ্ডে হামাস মিলিটারি উইং কমান্ডার আহমদ জাবারীকে মোসাদ হত্যা করে।

২০১৪ সালের ৮ই জুলাই হতে শুরু করে পরবর্তী আগস্ট মাসব্যাপী ফিলিস্তিনের গাজা ভূ-খণ্ডে আমেরিকান প্রশাসনের সমর্থনে জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইসরাইল নির্বিচারে একতরফা গণহত্যা চালায়। এতে গাজায় বসবাসরত দুহাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি সাধারণ মানুষ নিহত হয় এবং প্রায় বারোহাজার নিরোপরাধ মানুষ আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। নিহত এবং আহতদের মধ্যে শিশু ও নারীর সংখ্যাই বেশি। আঠারো লক্ষ গাজাবাসীর ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা নিরুপণ করা প্রায় অসম্ভব কারণ ইসরাইলি কামানের গোলায় প্রায় প্রতিটি ঘরবাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

হত্যাযজ্ঞে পারদর্শী মোসাদ ১৯৪৮ সাল হতে এ পর্যন্ত সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ইরান, ইরাক, মিসর তিউনিসিয়া, লিবিয়া এবং ফিলিস্তিন জুড়ে কতশত হত্যা করেছে তার সঠিক হিসাব অলিখিতই রয়ে গেছে। ইসরাইলি জেলে অগণিত ফিলিস্তিনি বন্দীরা ইসরাইলি সেনাদের জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছে অথবা পঙ্গু হয়ে বেঁচে আছে তার সঠিক হিসাব কারও জানা নেই। মানবাধিকার প্রশ্নে পরাশক্তি আমেরিকা, ব্রিটেন, ইসরাইল এবং তাদের দোসররা পৃথিবী জুড়ে মানবাধিকার প্রশ্নে অত্যন্ত সোচ্চার থাকলেও ইসরাইলি জেলহাজতে কিংবা আমেরিকার গুয়েন্তানামো-বে কারাগারে জেলহাজতে নিরীহ স্বাধীনতাকামী বন্দিদের উপর কুকুর লেলিয়ে তাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত করার দৃশ্য এবং অন্যান্য পাশবিক নির্যাতনের দৃশ্য যখন ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে দেখানো হয় তখন মানবাধিকার প্রশ্নটি হতবাক হয়ে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে।

আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, পাকিস্তান, জর্ডান, লিবিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে মোসাদ অত্যন্ত সক্রিয়। মনুষ্যবিহীন রিমোট কন্ট্রোল ড্রোন বিমান যা বর্তমান বিশ্বের ত্রাস, এ বিমানটি ইসরাইলের বিমান কোম্পানি TADIRAN এবং আমেরিকার বাল্টিমোর, মেরিল্যান্ড-এ অবস্থিত AAI Corporation যুক্তভাবে তৈরি

করে। ব্যক্ত থাকে যে, এ বিমানটি আফগানিস্তানের তালেবান এবং আল-কায়েদার মুক্তিকামী মানুষের উপর আঘাত হেনে আফগান এবং পাকিস্তানের অসংখ্য নিরীহ মানুষ এবং সেনাসদস্যকে হত্যা করে যার সত্যিকার হিসাব সম্ভবত সঠিকভাবে অদ্যাবধি ইতিহাসে স্থান করে নেয়নি।

সম্প্রতি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতকে শক্তিশালী করার লক্ষে ইসরাইলি মোসাদ বেশ কিছু ড্রোন বিমান ভারতের কাছে বিক্রি করে। আমেরিকার 'ম্যাকডোনেল ডগলাস' বিমান প্রস্তুতকারী কোম্পানিতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ইহুদি বিধায় ঐ কোম্পানি কোন মুসলিম দেশে কয়টি যুদ্ধবিমান বা যাত্রীবাহী বিমান বিক্রি করে তার হিসাব ইসরাইল সহজে পেয়ে যায়।

মোসাদ স্পাই একাডেমিতে ক্যাডারদের পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি ধর্মের মূলমন্ত্র, অনুসরণীয় দিকসমূহ, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, জালিয়াতি, ঠান্ডা মাথায় খুন, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মোসাদের করণীয়, দেশে দেশে ইহুদি এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ, একই সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বিবাদ লাগিয়ে ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল ইত্যাদি বিষয়ে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে করুণা, ভালোবাসা, মানবতা, দুর্বলতা এবং মোহ মন থেকে চিরতরে রহিত হয়। তাই একাডেমি প্রধান Araleh Sherf মোসাদ ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে একসময় বলেছিলেন, "আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে- প্রতারণার মাধ্যমে অর্জন। তোমরা ক্যাডেটরা এ মুহূর্তে নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য এক ধরনের কাঁচামাল। এ কাঁচামাল দিয়ে আমরা এমন একটি প্রোডাক্ট বানাব যা হবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন মানবসত্ত্বা। আমরা কাউকে পাশ মার্ক দেই না যতক্ষণ না পর্যন্ত সে শতভাগ যোগ্যতা অর্জন না করে[১]"।

আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ওয়ারেন হার্ডিং তার এক ভাষণে বলেছিলেন, 'Do not do an immoral thing for a moral reason' অর্থাৎ নৈতিক কারণে অনৈতিক কোন কাজ করনা। মোসাদ একাডেমির ট্রেনিং পদ্ধতি ঠিক তার উল্টো। মানবতা কিংবা শান্তিতে

---

১. বাই ওয়ে অব ডিসেপশন- ভিক্টর অস্ট্রোভাস্কি (অবঃ) মোসাদ কেইস অফিসার

২. তৎকালীন ইসরাইলি টিভি প্রধান ইউসুফ লেপিড মোসাদকে সরাসরি এ প্রস্তাব দেন। বহুল প্রচারিত ইসরাইলি পত্রিকা 'মারিভ' এ সংবাদ প্রকাশ করে।

৩. Anna's House: The American Colony in Jerusalem by Odd Karsten Tveit

৪. দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্ আগস্ট ২৮, ১৯২২ ইং

অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে সহাবস্থান এ সমস্ত নীতিবাক্য মোসাদ স্পাইদের কাছে সামান্যই তাৎপর্য বহন করে।

ইহুদি জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় - পৃথিবীতে যুগে যুগে, মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, কালে কালে যে সমস্ত অপরাধ সংগঠিত হয়েছে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইহুদি জাতি পেছনে কলকাঠি নেড়েছিল এবং এ সমস্ত কারণে পরিশেষে ইহুদিদের ভাগ্যে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিল। তাদেরকে হাজার হাজার বছর নির্বাসিত জীবনযাপন এবং যুদ্ধবিগ্রহে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হয়েছিল যদিও তারা ধনসম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ব্যবসাক্ষেত্রে, বুদ্ধি ও সাহসিকতায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় অধিক অগ্রগামী।

অবসরপ্রাপ্ত মোসাদ কেইস অফিসার ভিক্টর অস্ট্রোভাক্সি তার বই 'বাই ওয়ে অব ডিসেপশন'–এ লিখেছেন, মোসাদ ক্যাডারদেরকে প্রতিটি কাজ হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এমনকি মোসাদ হেড কোয়ার্টারে প্রায় ১০০ ফিট মাপের একটি ফোল্ডিং স্ক্রিন রয়েছে যেখানে বাস্তবে দেখানো হয় ইসরাইলের শত্রুরা কে কোথায় অবস্থান করছে বা কি করছে। এ স্ক্রিনের পেছনে অসংখ্য কম্পিউটার এবং ইনফরমেশন টেকনোলজি লুক্কায়িত রয়েছে যেখানে নির্দিষ্ট টেকনিশিয়ান ছাড়া অন্যদের প্রবেশাধিকার নেই।

ধরুন- একজন ফিলিস্তিনি শত্রু নেতা এ মুহূর্তে কোথায় অবস্থান করছে, গত তিনদিন সে কোথায় ছিল এটা জানতে হলে ঐ নেতার নাম কম্পিউটারে পুশ করলেই তার সঠিক অবস্থান জানা যাবে। বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত মোসাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চ চব্বিশ ঘন্টা এ ধরনের তথ্য সরবরাহে নিয়োজিত এবং এ সব তথ্য প্রতিটি মূহূর্তে কম্পিউটারে আপডেট করা হয়। এ কারণে মোসাদ স্পাই রিং তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয় না। তাদের অব্যর্থ এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ তাদেরকে পৃথিবীর সেরা স্পাই প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইহুদিরা ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী লোক এবং মুসলিম সমৃদ্ধ দেশগুলোকে তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে ভাবে। যে কারণে মোসাদ স্পাই রিং-এ কর্মরত প্রত্যেক ক্যাডারকে ট্রেনিংকালীন সময়ে ছয় সপ্তাহ ইসলামি রীতিনীতি এবং ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের উপর বিশেষ ট্রেনিং নিতে হয়। মোসাদ হিট স্কোয়ার্ডের সদস্যদেরকে খুন-খারাবির জন্য বিভিন্ন দেশে ছদ্মবেশে অনুপ্রবেশের জন্য জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করতে হয়। জাল পাসপোর্ট তৈরির জন্য তাদের রয়েছে স্পেশাল ডিপার্টমেন্ট এবং জনবল।

অবিকল পাসপোর্ট, ভিসা তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম, কোড নাম্বার ইত্যাদির জন্য যাবতীয় সিলমোহর প্রস্তুতে তাদের জুড়ি নেই। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি বড় বড় হোটেলের মূল চাবির ডুপ্লিকেট মাস্টারকপি তাদের সংগ্রহে রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে যত নামকরা তালা প্রস্তুতকারী কারখানা রয়েছে তাদের প্রস্তুতকৃত তালার মান-নিয়ন্ত্রণের জন্য লন্ডনে এর একটি কার্যালয় রয়েছে। যে কোনো ধরনের তালা প্রস্তুত করার পর লন্ডনস্থ মান-নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে পাঠানোর বিধান রয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের পর এ তালা বাজারে ছাড়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। লন্ডনস্থ তালার মান-নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে কর্মরত মোসাদ স্পাই কিংবা সায়ানিমের (সাহায্যকারী) মাধ্যমে মোসাদ চাবির ফটো কৌশলে সংগ্রহ করে থাকে যাতে করে মোসাদ গোপনে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ কিংবা তথ্য সংগ্রহের জন্য শত্রুর আস্তানায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র টেলিফোন যন্ত্র প্রতিস্থাপন করে আড়ি পাতার কাজে ব্যবহার করতে পারে।

বিদেশে বসবাসরত ইহুদি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা ইহুদি স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ মোসাদ তাদের সাহায্য নেয়। মোসাদের ভাষায় তাদেরকে 'সায়ানিম' বা সাহায্যকারী বলা হয়। বিভিন্ন দেশে মোসাদের হাজার হাজার 'সায়ানিম' রয়েছে, শুধুমাত্র লন্ডন শহরে প্রায় দুইহাজার 'সায়ানিম' রয়েছে এবং সমগ্র ব্রিটেন জুড়ে আরও ছয়হাজার 'সায়ানিম' মোসাদের লিস্টে আছে। সায়ানিমরা রেন্ট-এ-কার, বিভিন্ন দেশের দূতাবাস, হোটেল, মানি এক্সচেঞ্জ এবং বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, মোসাদ স্পাই রিং এদের সাহায্য নিয়ে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন করে।

মুসলিম দেশগুলোর কাছে মিসাইল, সাবমেরিন ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত টর্পেডো, বিমান ও ট্যাংক বিধ্বংসী মিসাইল, দুরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র কিংবা আধুনিক যুদ্ধবিমান তৈরির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই এবং বর্তমান মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ইরান, তুরস্ক, কাজাখিস্থান এবং পাকিস্তানের কাছে এসমস্তের প্রযুক্তি থাকলেও খুচরো যন্ত্রাংশ প্রস্তুতে আমদানী নির্ভর হওয়ায় তাদেরকে ফ্রান্স, আমেরিকা, ব্রিটেন কিংবা রাশিয়ার কাছ থেকে ক্রয় করে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হয়।

উন্নত দেশগুলোর অস্ত্র কারখানায় কর্মরত অসংখ্য ইহুদি টেকনিশিয়ান এবং বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় মোসাদ জানতে পারে সামরিকভাবে মুসলিম দেশগুলোর কোন্‌টি কতটুকু শক্তিশালী। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম দেশের অভ্যন্তরে সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সামরিক ও বে-সামরিক

কর্মকর্তা কিংবা রাজনৈতিক নেতাদের অনেককেই বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগ করে, ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার শর্তে, বিভিন্ন লবিং-এর মাধ্যমে, ব্ল্যাকমেইল কিংবা টাকার বিনিময়ে ক্রয় করে মোসাদ গোপন তথ্য জানতে পারে।

মোসাদ কেইস অফিসার ভিক্টর অস্ট্রোভাস্কি তার বই 'বাই ওয়ে অব ডিসেপশন'–এ লিখেছেন, মোসাদ বিভিন্ন দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা, সরকারের মন্ত্রীসভার মধ্য হতে শক্তিশালী মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী কিংবা উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাকে কৌশলে রিক্রুট করে তাদের স্বার্থে কাজ করতে প্রভাবিত করে এবং সুচারুরূপে সে কাজ সম্পন্ন করে। তাছাড়া তথ্যপ্রযুক্তিতে ইসরাইলি বিশেষজ্ঞরা বর্তমান বিশ্বে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর তথ্য প্রযুক্তির নেপথ্যে ইসরাইলি গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের এক গোপনীয় সংযোগ রয়েছে যে কারণে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আরব দেশগুলো নিজেদের মধ্যে যে গোপনীয় তথ্যসমূহ আদানপ্রদান করে তাতে মোসাদ অনায়াসে আড়ি পাততে পারে। ভূমধ্যসাগরের তলদেশ দিয়ে যে 'সারমেরিন ক্যাবল' প্রতিস্থাপন করা হয়েছে তা ইতালীর পালমোর-এ এসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ইসরাইল এ সংযোগস্থলে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে আড়ি পেতে সকল গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম।

ইসরাইল রাষ্ট্রের উত্থান

১ম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ফিলিস্তিনসহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ভাগাভাগি হয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছে চলে যায়। ১৮৯৭ সালে সুইটজারল্যান্ডের বাসেলে ইহুদি নেতা 'থিওডর হার্জেল'-এর নের্তৃত্বে বিশ্ব ইহুদি সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'আর্থার বেলফোর' বিশ্ব ইহুদি সংস্থার চাপে প্রথমবারের মত মুসলিম অধ্যুষিত ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দেন।

১৯২২ সালে এর বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য ব্রিটেনের নের্তৃত্বে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা বিশ্ব ইহুদি সংস্থার চাপে পড়ে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তৎপর হয়ে উঠে। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিল পাশ হয়। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ফিলিস্তিনকে ভাগ করে মাত্র ৫% ইহুদি জনগোষ্ঠির জন্য ২৫% ভূমি নিয়ে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪৯ সালে ইসরাইলকে জাতিসংঘ ৫৯তম সদস্য দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ স্বীকৃতির পরপরই ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হতে ইসরাইলে ইহুদিরা জড়ো হতে থাকে। ইসরাইল ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের ফেরত সেনাসদস্যদেরকে নিয়ে তাদের মিলিটারি ইউনিট 'হাগানা' সংগঠিত করার পর ক্রমেই জোরপূর্বক ফিলিস্তিনিদের জমিজমা জবরদখল করার পরিকল্পনায় মেতে উঠে। ফলে ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে পাঁচটি আরব স্টেট ইসরাইলি সেনাদের উপর আক্রমণ চালায়। ১৯৪৮ সালের মে হতে ১৯৪৯ সালের জুলাই পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলে। প্রতিটি নবগঠিত ইসরাইলের পেশাদার সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের পৈতৃক ভিটা হতে উচ্ছেদ অভিযানে নামে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের নীরব সম্মতিতে ক্রমেই সমগ্র প্যালেস্টাইনের মুসলিম অধ্যুষিত ৭৫% এলাকার অধিকাংশ ভূমি ইহুদিদের হাতে চলে যায়।

মুসলিম দেশসমূহ এতে ক্ষুব্ধ হয় এবং ইসরাইলিদের হাতে বঞ্চনার শিকার ফিলিস্তিনিদের উপর অন্যায় এ আচরণের জন্য সোচ্চার হয়। ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের সাথে মিসর, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ছয়দিনের এ যুদ্ধে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সাহায্যে ইসরাইল এ সমস্ত দেশসমূহের বিস্তৃত ভূ-খণ্ড নিজেদের অধিকারে নিতে সমর্থ হয়। মিসরের

সিনাই উপত্যকা, সিরিয়ার গোলান মালভূমি, জর্ডানের অধীনে গাজা ভূ-খণ্ড, জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর এবং জর্ডানের অধীনে ভাগাভাগিকৃত জেরুজালেম নগরীর অর্ধেক অংশের দখল ইসরাইলের হাতে চলে যায়। ব্যক্ত থাকে যে, ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তি মোতাবেক ফিলিস্তিনিদের জন্য ইসরাইল অভ্যন্তরে পশ্চিম জেরুসালেম এবং পশ্চিম তীরের গাজা উপত্যকার আলাদা ভূ-খণ্ড ও পিএলও-র নের্তৃত্বে একটি সরকার গঠনের ব্যাপারে দু-পক্ষ সম্মত হয়।

১৯৭৯ সালে মিসরের সাথে ইসরাইলের শান্তি চুক্তি হয়। দখলকৃত সিনাই উপত্যকা মিসরের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার বিপরীতে মিসর এ শান্তি চুক্তিতে সই করে। মেনাচেম বেগিন ও আনোয়ার সাদাত এ চুক্তিতে সই করেন এবং দু'জনকেই শান্তি চুক্তি করার জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

১৯৯২ সালে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইসহাক রবীন-এর আমলে ভারত এবং চীনের সাথে ইসরাইলের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯৪ সালে শান্তি চুক্তি মোতাবেক ফিলিস্তিনের গাজা ও জেরিকো ভূখণ্ডে পিএলও-র নের্তৃত্বে ফিলিস্তিন সরকার গঠিত হয়। একই সালে ইসরাইল-জর্ডান শান্তি চূক্তি কার্যকরী হয়। ইসরাইলের ইসহাক রবিন, সিমন পেরেজ এবং ইয়াসির আরাফাত জাতিসংঘের শান্তিপদক লাভ করেন।

১৯৯৫ সালে ইসহাক রবিন ইহুদি এক যুবকের গুলিতে নিহত হন। সিমন পেরেজ রবিনের স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯৯৬ সালে ওমান এবং কাতারের সাথে ইসরাইলের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার পান।

১৯৯৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপিত হয়। ২০১৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্যায়ভাবে এবং একক সিদ্ধান্তে জেরুসালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ জাতিসংঘের অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য দেশ ট্রাম্পের একক এ সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়নি এবং এ আদেশ জাতিসংঘে গৃহীত জেরুজালেম সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিপরীতমুখী অবস্থানে যাওয়ার প্রতিবাদে বিশ্বজুড়ে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

জাতিসংঘ, বিশ্ববিবেক এবং ফিলিস্তিনীদের ন্যায্য অধিকারের দীর্ঘ সংগ্রাম উপেক্ষা করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ০৫ ডিসেম্বর, ২০১৭ সালে জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেন এবং ২০১৮ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি আমেরিকার দূতাবাস তেলআবিব হতে জেরুজালেমে স্থানান্তরের নির্দেশ দেন এবং নির্দেশনানুযায়ী ১৪ মে,২০১৮ তে জেরুজালেমে আমেরিকার দূতাবাস স্থানান্তরিত হয়।

২০১৮ সালের ২৬ শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল অধিকৃত সিরিয়ার গোলান মালভূমি বিশ্ববিবেককে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইসরাইলের অংশ বলে স্বীকৃতি প্রদান করে যা জাতিসংঘসহ পৃথিবীর কোনো দেশই মেনে নেয়নি। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানসহ মুসলিম বিশ্বের নেতারা এবং জাতিসংঘসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশ এর বিপক্ষে প্রতিবাদ জানালেও ট্রাম্প অন্যায়ভাবে সিরিয়ার গোলান মালভূমি ইসরাইলকে দিয়ে দেয় যা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং জাতিসংঘ সনদের পরিপন্থী। যেখানে জাতিসংঘ এবং পৃথিবীর সবকটি দেশ গোলান মালভূমিকে সিরিয়ার ভূখণ্ড হিসাবে জানে সেখানে ট্রাম্প অন্য দেশের ভূখণ্ড ইসরাইলকে দিয়ে দিতে পারে কোন যুক্তিতে? ট্রাম্পের এ সিদ্ধান্তে আশকারা পেয়ে ইসরাইল অবশিষ্ট ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ডে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের ঘরবাড়ি অন্যায়ভাবে জবরদখল করা অব্যাহত রাখে। প্রতিবাদকারী নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি জনগণের উপর ইসরাইলি সেনারা গুলিবর্ষণ করলে প্রায় তিনশত ফিলিস্তিনি মৃত্যুবরণ করে এবং আরও কত ফিলিস্তিনি ভবিষ্যতে মৃত্যুবরণ করবে তার ইয়ত্তা নেই।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কা ট্রাম্প ইহুদি ব্যবসায়ী জারেড কোচনারকে বিয়ে করে। কোচনার এবং ইভাঙ্কা দুজনই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিশেষ উপদেষ্ঠার দায়িত্ব পালন করে আসছে। উভয়ই ইসরাইলী স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলী স্বার্থরক্ষায় উভয়ই তৎপর। ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলী আগ্রাসনকে ট্রাম্প, মেয়ে ও জামাতা সবসময়ই উৎসাহ প্রদান করে আসছে। এ কারণে ইসরাইল-আমেরিকান কাউন্সিল ইভাঙ্কাকে ৯ জানুয়ারী ২০২০ সালে 'ফ্রেন্ডস আব ইসরাইল' খেতাবে ভূষিত করে নেভেদা অঙ্গরাজ্যের লাস-ভেগাসে পুরষ্কৃত করে।

আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ ইহুদি লবির হাতে।

ইরাকের তৎকালীন ক্ষমতাধর শাসক সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে বুশ প্রশাসন 'অপরেশন ডেজার্ট স্টর্ম' নামে ইরাকে মিলিটারি অপারেশন চালায় যদিও সাদ্দাম হোসেন কুয়েতের তেলক্ষেত্র নিয়ে আমেরিকার সাথে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং সিআইএ-র সবুজ সংকেতের প্রেক্ষিতে সাদ্দাম কুয়েত আক্রমণ করার সাহস পায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিআইএ-র সৃষ্টি সাদ্দাম হোসেনের মত একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর বিরুদ্ধে আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ইহুদি লবি সাদ্দামকে বিশ্বাস করতে পারছিল না এবং এ স্বৈরশাসক ভবিষ্যতে ইসরাইলের ক্ষতির কারণ হতে পারে বিধায় ইরাককে দূর্বল করে দিতে বুশ প্রশাসনকে ইহুদি লবি রাজি করাতে সমর্থ হয়েছিল। এর কারণ ছিল সাদ্দাম চীন হতে কিছুসংখ্যক দুরপাল্লার স্কাড মিসাইল সংগ্রহ করেছিল। আমেরিকা ও রাশিয়া হতে অত্যাধুনিক মিগ-২১ ও এফ-১৫ বিমানবহর এবং রাসায়নিক অস্ত্রসম্ভার আয়ত্তে আনতে পেরেছিল। সাদ্দাম অস্ত্রের ঝনঝনানি দেখাতে ভালোবাসত। প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিল ইরাক অচিরেই পারমাণবিক শক্তিধর দেশে রূপান্তরিত হবে যা ইসরাইল সরকার এবং বুশ প্রশাসনের ইহুদি নীতিনির্ধারকরা ভাল চোখে দেখেনি। সাদ্দামের এ প্রকাশ্য ঘোষণা বুমেরাং হয়ে পরবর্তীতে তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইসরাইল ইরাকের কাছে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করেছিল এবং ইরাকের সেনাবাহিনীকে সিআইএ এবং মোসাদ যুক্তভাবে ট্রেনিং দিয়েছিল। ইসরাইল চায় না পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলো সামরিক শক্তিতে তাদের চেয়ে অগ্রগামী হোক। তাই ইহুদিবেষ্ঠিত বুশ প্রশাসনের বিভিন্ন উপদেষ্ঠা ও সিনেটররা ইরাক আক্রমণে বুশকে উৎসাহিত করে। কুয়েতের তেলক্ষেত্রের উপর আমেরিকার প্রভাব ইরাকের অংশীদারত্বের কারণে অনেকাংশে বিঘ্নিত হবে- এ ধরনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণ দেখিয়ে বুশকে ইরাক আক্রমণে বাধ্য করে।

আমেরিকান-ইসরাইল পাবলিক এফেয়ার্স কমিটি (AIPAC) যেভাবে আমেরিকান প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রন করে

১৯৫১ সালে 'ইশাইয়া এল. সি. কেনেন' কর্তৃক এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। কেনেন প্রথমে ছিলেন আমেরিকান জায়োনিস্ট কাউন্সিলের প্রবর্তক। শক্তিশালী ইহুদি লবি হিসেবে খ্যাত এর পরিবর্তিত নাম 'আমেরিকান-ইসরাইল পাবলিক এফেয়ার্স কমিটি' (AIPAC) এবং এ কমিটিতে রিপাবলিকান, ডেমোক্রেটস্ এবং স্বতন্ত্র পার্টির মধ্য হতে প্রভাবশালী ইহুদি ধর্মাবলম্বী রাজনৈতিক নেতা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, টিভি চ্যানেলসমূহের মালিক, অন্যান্য গণমাধ্যমকর্মী এবং বিশিষ্ট ধনকুবের ব্যবসায়ীরা রয়েছেন যাদের মধ্য হতে আমেরিকার সাধারণ নির্বাচনে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচনপ্রার্থী থাকেন। তাদের পছন্দমতো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর নির্বাচন প্রচারণায় এ লবি অর্থসম্পদ ও জনবলের যোগান দিয়ে থাকে।

এককথায় এ ইহুদি লবির সমর্থন ছাড়া কোনো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারে না। এ কারণে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরপরই প্রশাসনে তার বিভিন্ন উপদেষ্ঠা ইহুদি পরিবেষ্ঠিত থাকে। জাতিসংঘের সমর্থন বা দূর্যোগে আমেরিকান সাহায্য পেতে এ লবির সমর্থন অত্যন্ত জরুরী। যে দেশ আমেরিকান প্রশাসনের সুনজরে থাকে সে দেশ অবশ্যই ইহুদি এ লবির সমর্থনপুষ্ট হতে হবে। অর্থনৈতিক অবরোধ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির প্রশ্নে আমেরিকান প্রশাসনকে এ লবি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। ইসরাইলকে যে দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে কিংবা ইসরাইলের সাথে যে সমস্ত দেশসমূহের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান সে দেশ ইহুদি প্রভাবে আমেরিকান প্রশাসনের সুনজরে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, যে ভারত একসময় রাশিয়ান ব্লকের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল এবং ১৯৭১ সালে রাশিয়ার পরম বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাত ছিল সে ভারত আজ ইসরাইলের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইপেক-এর ইহুদি লবির সুনজরে পড়ে আমেরিকার অন্যতম বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আমেরিকার এককালের পরম বন্ধু পাকিস্তান, আফগানিস্তানে আমেরিকার স্বার্থ সংরক্ষণে অনেক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হওয়া সত্ত্বেও আজ পাকিস্তান আমেরিকার অর্থনৈতিক সাহায্য বঞ্চিত এবং কাশ্মীর সমস্যা দূরীকরণে সাম্প্রতিককালে আমেরিকান যুগপোযুগী অস্ত্র কিংবা রাজনৈতিক সমর্থনও পাচ্ছে না বরং ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করতে ইসরাইল

মরীয়া হয়ে উঠেছে এবং ভারতকে আমেরিকার তৈরি বিভিন্ন মরণাস্ত্র ইসরাইল পরোক্ষভাবে সরবরাহ করছে।

বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোকে আমেরিকার কাছে নতজানু রাখা এবং ইসরাইল-আমেরিকার স্বার্থে এ সমস্ত দেশসমূহকে সবসময় চাপের মধ্যে রাখা এ লবির প্রধান লক্ষ। সাম্প্রতিককালে ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তিন দেশসমূহের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি আর এ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ইসরাইল আমেরিকার মত শক্তিশালী দেশের ইহুদি লবি আইপেক-কে কাজে লাগাচ্ছে।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্দ্বন্ধ, শিয়া-সুন্নির দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলিম নিহত কিংবা পঙ্গুত্ববরণ, এ সবের পেছনে কাজ করছে আমেরিকান-ইসরাইল ইহুদি লবি। ফিলিস্তিনে সাম্প্রতিককালে ইসরাইলের বর্বরোচিত হামলায় হাজার হাজার লোক নিহত এবং পঙ্গুত্ববরণ করেছে কিন্তু মানবতার প্রশ্নে পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলো নিরবতা পালন করছে ইহুদি বলয়ের চাপে। সিরিয়া, ইরাক এবং লিবিয়ার লক্ষ লক্ষ সাধারণ জনগণ পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এ সমস্ত অবাঞ্চিত কর্মকাণ্ডের হোতা কারা? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে বিশ্ববিবেক নীরব কেন?

আমেরিকান-ইসরাইলি লবির অধীনে প্রায় একলক্ষ সদস্য রয়েছে। বিগত আমেরিকার সাধারণ নির্বাচনে ৫০ জনেরও অধিক ইহুদি ধনকুবের গড়ে জনপ্রতি বায়াত্তর হাজার আমেরিকান ডলার এ প্রতিষ্ঠানের ফান্ডে দান করেছে। তাছাড়া এর অন্যান্য সদস্যদের অর্থ সাহায্য এ প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক ভিত সুদৃঢ় করেছে। ইসরাইল প্রতি বৎসর আমেরিকার কাছ হতে তিন থেকে চার বিলিয়ন আমেরিকান ডলার সাহায্য পায়। এ সাহায্যের বেশির ভাগ অর্থই সামরিক খাতে ব্যয় হয়। আইপেকের ইহুদি সদস্যরা বর্তমানে ইরান, সিরিয়া, ইরাক এবং পাকিস্তানের পেছনে লেগে আছে যাতে এ সমস্ত দেশগুলোকে দূর্বল করা যায়।

পাকিস্তান এবং ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প ইসরাইলের গাত্রদাহ। তাই সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানকে দূর্বল করার প্রয়াসে ভারতকে সকল প্রকার সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করছে ইসরাইল। ২০১২ সালে আইপেক কনফারেন্সে পৃথিবীর ৫০ টি দেশের ইহুদি নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের ১৩,০০০ ডেলিগেট যোগদান করে, যে কনফারেন্সে বিষয়বস্তু ইসরাইল ও আমেরিকার স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

আন্তর্জাতিক আদালত কতটা নিরপেক্ষ?

ইরাক যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ ইরাকি সেনা হত্যার জন্য আমেরিকা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিক আদালতে এ গণহত্যার জন্য বিচার চাইলে আমেরিকা ও ইসরাইলি প্রভাবে এ যুদ্ধপরাধকে খাটো করে দেখা হয়। যুদ্ধের শেষভাগে জাতিসংঘে গৃহীত ৬৬০ নং সিদ্ধান্তনুসারে ইরাকি সেনাবাহিনী কুয়েতের মুতলা এবং ইরাকের বসরা হাইওয়ে হয়ে আত্মসমর্পণের জন্য যখন এগিয়ে যায় আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইসরাইলি বিমানবহর ঠিক ঐ সময় আত্মসমর্পণকারী ইরাকি নিরস্ত্র সেনাসদস্য ও তাদের বহনকারী গাড়িবহরের উপর নির্বিচারে নাপাম এবং ফসফরাস বোমার আক্রমণ চালায়। দীর্ঘ ষাট মাইল এলাকা জুড়ে দুইহাজারেরও বেশি গাড়িবহর, লক্ষ লক্ষ ইরাকি সেনাসদস্য ও সাধারণ জনতা এ আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

১৯৭৭ সালের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী নিরস্ত্র মানুষের উপর নাপাম এবং ফসফরাস বোমার অক্রমণ জেনেভা প্রটোকলের পরিপন্থী। ১৯৪৯ সালে জেনেভা কনভেনশন-এর আর্টিকেল-৩ অনুযায়ী কোনো দেশের নিরস্ত্র সেনাসদস্যের উপর আক্রমণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত দেশগুলো সাক্ষর করে অথচ আমেরিকা ও তার মিত্রপক্ষের বিমানবহর এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ইরাকি নিরস্ত্র সেনাসদস্য ছাড়াও হাইওয়েতে আশ্রয়ার্থী ফিলিস্তিনি এবং কুয়েতি শরনার্থীদের উপর নির্বিচারে আক্রমণ চালানোর ফলাফল হয় ভয়াবহ। ষাট মাইল হাইওয়ে জুড়ে লাশের মিছিলে বাতাস ভারী হয়। প্রায় তিনলক্ষ মানুষ এতে নিহত হয়। একসাথে এত নিরস্ত্র মানুষ হত্যার ঘটনা ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

আমেরিকান কংগ্রেস পার্টির সদস্য 'ড. পল ফিন্ডলে' তাঁর প্রকাশিত 'দ্য ডেয়ার টু স্পিক আউট' গ্রন্থে লিখেছেন, "আমেরিকা বর্তমানে পৃথিবী শাসন করছে, আর আমেরিকাকে শাসন করছে ইসরাইল।" তিনি আরও লিখেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে শুধুমাত্র ইসরাইল কেন আণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে? এর ফল হবে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে ইসরাইলি হুমকির মধ্যে চুপ থাকতে বাধ্য রাখা। একথা সত্য যে, আমেরিকাতে বসবাসরত ইহুদি

লবি অত্যন্ত সুসংহত এবং মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতাশালী। তারা আমেরিকার বৈদেশিক নীতি এবং জাতীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার উপর অত্যন্ত প্রভাবশালী। যার ফলে ইসরাইল প্রতিবছর আমেরিকার অর্থনৈতিক সাহায্যের সিংহভাগ পেয়ে থাকে।

আমেরিকায় আবিস্কৃত নূতন নূতন ক্ষেপণাস্ত্র ইসরাইলের অস্ত্রভাণ্ডারে প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে যাতে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোকে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের সম্পদ লুট করা যায় এবং পুরাতন মডেলের অস্ত্রসম্ভার সহজে বিক্রি করা সম্ভব হয়। আমেরিকার এ ধরণের দু'মুখো নীতি অনেক কংগ্রেসম্যানদের পছন্দ নয়। এ ধরণের নীতি অবলম্বনের জন্য প্রশাসনের উপর আমেরিকার ইহুদি লবির প্রভাবকে দায়ী করেছেন ড. পল। তিনি বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করে লিখেছেন- ইসরাইল মধ্যপ্রাচ্যকে এক অনাহূত হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

ড. পল ২২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান। ইহুদি লবির চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কারণে তার রাজনৈতিক পরিচয় ক্ষুণ্ন হয়। ড. পলের 'দ্য ডেয়ার টু স্পিক আউট' বইটি আমেরিকান জনগণের কাছে প্রশংসিত হয় এবং ওয়াশিংটন পোস্টের জরিপ অনুসারে 'বেস্ট সেলার বুক' হিসেবে লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়, পক্ষান্তরে ইহুদি শক্তিশালী লবি আমেরিকান প্রশাসনের উপর প্রভাব খাটিয়ে ড. পলের মত একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে রাজনীতির ময়দান হতে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

কলামিষ্ট 'মার্ক ফারেল' তাঁর এক নিবন্ধে লিখেছেন, ড. পল ফিন্ডলে একজন প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ। এ ধরনের প্রতিভাবান রাজনীতিবিদ আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে ক্ষণজন্মা। ড. ফিন্ডলে তার বইয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন এভাবে যে, আমেরিকার 'ইসরাইল- সর্বপ্রথম' (Israel first) নীতি ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্য হতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার কারণ হতে পারে। ড. ফিন্ডলের এ যুক্তি সিনেটর আর্নেট হলিংস্, কংগ্রেসম্যান জেমস্ মর্গান, জেনারেল এন্টনি জিন্নি এবং তৃতীয়-পার্টি প্রেসিডেন্সিয়েল পদপ্রার্থী রালফ্ নাদের সমর্থন করেছেন। ড. ফিন্ডলে আমেরিকার জনগণকে তাঁর বাইশ বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে আমেরিকায় বসবাসরত শক্তিশালী ইহুদি লবির মাস্টার প্ল্যান সম্মন্ধে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। যদিও আমেরিকান কংগ্রেসম্যানদের অনেকেই এ ব্যাপারে অবহিত কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হলে ইহুদি লবির অর্থনৈতিক

সাহায্য ছাড়া নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব হবে না ভেবে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ইহুদি লবির চাপের কারণে ইসরাইলি স্বার্থকে কেউ পাশ কাটিয়ে যেতে পারেনা।

ইরাক যুদ্ধের সময় ইসরাইলি যুদ্ধবিমান ভূমধ্যসাগরে দিনের আলোতে ইউএসএস লিবার্টি যুদ্ধজাহাজে বোমা মেরে ৩৪ জন আমেরিকান নাবিককে হত্যা করে এবং প্রায় ২০০ জনকে আহত করে। ইসরাইলি পাইলট ভুলবশতঃ এ আক্রমণ করেছে বলে জানালে আমেরিকান প্রশাসন নীরবে তা মেনে নেয়। আমেরিকায় বসবাসরত ইহুদি লবি ও ইসরাইল সরকার তাদের প্রভাব বিস্তার করে ভুলবশতঃ এ অতর্কিত আক্রমণের জন্য ইসরাইল-আমেরিকান সম্পর্ককে তিক্ত না করার অনুরোধ জানালে আমেরিকার বুশ প্রশাসন এ বিপুল ক্ষতিকে মেনে নেয়।

ইসরাইলি মোসাদ স্পাই 'জনাথন পুলক' আমেরিকার একান্ত গোপনীয় সামরিক দলিলসমূহ কপি করে ইসরাইলি মোসাদ স্পাই সংস্থার কাছে পাচার করার পরপরই আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা সিআইএর কাছে ধরা পড়লেও ইসরাইলি লবির চাপের মুখে বুশ প্রশাসন নিরব থাকে। ড. পল ফিন্ডলে ইসরাইলের জন্য আমেরিকান শক্তিশালী ইহুদি লবির কার্যকলাপ নিয়ে ৬০ মিনিটের একটি ভিডিও চিত্র ধারণ করে আমেরিকান জনগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। যাতে প্রমাণ করেছেন আমেরিকার ইরাক আক্রমণের পেছনে ইসরাইলি স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে। ইরাকের সামরিক শক্তি বিনষ্ট ও সাদ্দামকে ফাঁসি দেওয়ার নেপথ্যে ইহুদি লবি ইন্ধন জুগিয়েছে।

ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার একহাজারেরও উপরে সেনাসদস্য নিহত হয়েছে ড. পল ফিন্ডলে আমেরিকানদের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন এ হতাহতের বিনিময়ে কে লাভবান হয়েছে- আমেরিকা না ইসরাইল?

ফিন্ডলের এ প্রশ্ন সিনেটে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি বটে তবে আমেরিকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠি এ সত্যটি অনুধাবন করতে পেরেছে।

তিনি আরও বলেছেন মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে একমাত্র ইরানই ইসরাইলি সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার অথচ আমেরিকা-ইসরাইলের মিলিত শক্তি ইসরাইলিদের স্বার্থে ফিলিস্তিন, ইরাক, সিরিয়া কিংবা লিবিয়ার সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে অবলীলায় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে এবং বর্তমানে ইসরাইলি উস্কানীতে ইরানকে মেরুদণ্ডহীন বানানোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনি জনগণকে নিজেদের বসতভিটা হতে উৎখাত করে ইসরাইল একে

একে ইহুদি বসতি স্থাপন করছে অথচ বিশ্ববিবেক এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেও আমেরিকার ভেটো প্রয়োগে জাতিসংঘে তা প্রতিবারই নাকচ হয়ে যাচ্ছে। বুশ, ক্লিনটন, ওবামা কিংবা ডোনাল্ড প্রশাসন একই সূত্রে গাঁথা। তিনি আমেরিকান প্রশাসনকে নৈতিকতার পক্ষে রায় দিতে আহ্বান জানান। এজন্য ইহুদি লবিকে তিনি শুধুমাত্র দোষ দিচ্ছেন না, এর চেয়ে বেশি দোষে আখ্যায়িত করেছেন আমেরিকান পার্লামেন্টের সিনেটরদেরকে যারা ইসরাইলি চাপের মুখে নতজানু ভূমিকা পালন করে।

সাম্প্রতিককালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কার্যালয় 'সায়মন সেন্টারে' ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ১৫টি দেশের জনগণের মাধ্যমে সন্ত্রাসী দেশসমূহের ব্যাপারে ভোট গ্রহণের এক জরিপ কার্য সম্পন্ন হয়। সদস্যভূক্ত দেশগুলোর জনগনের এক বিরাট অংশ এই মর্মে রায় দেয় যে, ইসরাইল বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র যা ইরান, উত্তর কোরিয়া এবং আফগানিস্তানকেও ছাড়িয়ে গেছে। ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট রোমানো প্রোডি এবং সেক্রেটারি জেনারেল জেভিয়ার সলানাকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে বলা হয়েছে।

২০০৮-২০০৯ সালে ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত গাজা ভূ-খণ্ডে হামাসকে নিধনের অজুহাতে ইসরাইল নিরীহ ফিলিস্তিনি জনগণের উপর দমন-পীড়ন চালায় যাতে প্রায় ৩০০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়। ইসরাইলি সেনাবাহিনীর নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ ঢাকা দিতে ইসরাইল গাজা ভূ-খণ্ড অবরুদ্ধ করে রাখে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রথমে সিদ্ধান্ত নেয় গাজায় হামাস নের্তৃত্বের সাথে ইসরাইলের একটি সমঝোতার জন্য সংলাপ প্রয়োজন কিন্তু হঠাৎ পরবর্তী পর্যায়ে এ সিদ্ধান্ত পাল্টে যায় এবং হামাসকে অবরুদ্ধ করার পক্ষে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সায় দেয় এবং অবরোধের সুবিধার্থে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইসরাইলকে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে বলে রাজী হয়।

দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের ইহুদি রাজনীতিবিদদের মধ্যে ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট সারকোজি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বার্নাড কোচনার এবং ব্রিটিশ লেবার পার্টি নেতা ডেভিড মিলিবেন্ড, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ব্রিটিশ টাইকন স্যার কোহেন এবং আমেরিকান রাজনীতিবিদ আই লিউস গং-দের সিদ্ধান্তে গাজা ভূ-খণ্ডে ইসরাইলি অবরোধের পক্ষে সায় দেওয়া হয়। ব্যক্ত থাকে যে, সারকোজি, কোচনার, ক্যামেরুন, মিলিবেন্ড, লিউস ও কোহেন প্রত্যেকেই ইহুদি ধর্মাবলম্বী এবং ইহুদি স্বার্থে নিবেদিত।

ইসরাইলের এ নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের বিচার হয়নি। ইসরাইল গাজা ভূ-খণ্ডে তখন বিষাক্ত কেমিক্যাল অস্ত্র পরীক্ষামূলকভাবে ফিলিস্তিনি জনগণের উপর প্রয়োগ করে। বিষাক্ত এ গ্যাস এমনই ভয়াবহ ছিল যে, কোনোরূপ গুলি ছাড়াই শিশু-নারী-পুরুষসহ হাজার হাজার ফিলিস্তিনি জনতার অস্থি হতে মাংস ঝরে পড়েছিল।

বিশ্বজুড়ে এ হত্যাযজ্ঞের নিন্দার মুখে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ রিচার্ড গোল্ডষ্টোনের নের্তৃত্বে এ অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের জন্য একদল প্রতিনিধি পাঠায়। গোল্ডষ্টোন নিজে একজন ইহুদি এবং তার প্রদত্ত রিপোর্ট ইসরাইলের পক্ষে যায় এবং গাজায় হত্যাজনিত সমগ্র ব্যাপারটি তাৎক্ষণিকভাবে চাপা পড়ে।

২০০৩ সালের ১৬ই মার্চে এসোসিয়েটেড প্রেসে প্রকাশিত এক নিবন্ধে ২৩ বছর বয়সী খ্রিস্টান কলেজছাত্রী আমেরিকান মানবাধিকার কর্মী 'রাসেল করী'-কে ইসরাইলি বুলডোজার কীভাবে হত্যা করেছিল তার বর্ণনা দেওয়া হয়। ফিলিস্তিনের গাজা ভূখণ্ডের রাফা শরণার্থী শিবিরে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদেরকে কীভাবে টেনে-হেঁচড়ে, গুলি করে এবং বুলডোজার দিয়ে ঘরবাড়ী তছনছ করে ইসরাইলি সেনাসদস্যরা তাদের বসতবাড়ী হতে বিতাড়িত করেছিল তার সাক্ষী ছিলেন রাসেল করী। তিনি ইসরাইলি সেনাসদস্যদের এমন নির্দয়, হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে প্রতিবাদ করেছিলেন। বুলডোজারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নিরস্ত্র মানুষগুলোকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। এ প্রতিবাদের উত্তরে ইসরাইলি সেনাসদস্যরা তার শরীরের উপর দিয়ে বুলডজার চালিয়ে তাকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। ১৯শে মার্চে ব্রিটেনের 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয় খ্রিস্টান নিয়মে যখন 'রাসেল কুরীকে' প্রায় ১০০ জন স্থানীয় লোক এবং বিদেশী পর্যটক দাফন সম্পন্ন করতে নিয়ে যায় তখন তারা ইসরাইলি সেনাসদস্যের এহেন অমানবিক কাজের নিন্দা জানায় ও প্রতিবাদমূখর হয়ে উঠে। ইসরাইলি পুলিশ তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ারগ্যাস এবং সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে। এমন এক হৃদয়বিদারক মূহূর্তে ইসরাইলি সেনাদের এহেন আচরণে বিশ্ববিবেক নিন্দা জানালেও ইহুদি লবির চাপের মুখে আমেরিকান প্রশাসন নিরব ভূমিকা পালন করে।

ইসরাইলের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডেভিড বেন গুরিয়ন তার এক ভাষণে বলেছিলেন, "যখন একজন আমেরিকান ইহুদি ও একজন দক্ষিণ আফ্রিকান ইহুদি নিজেদের মধ্যে সরকার নিয়ে আলোচনা করে তখন তারা নিজেদের

সরকার এবং রাষ্ট্র বলতে ইসরাইলকেই বুঝায়।" বেন গুরিয়নের কথা কতটুকু সত্য তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ইহুদি সম্প্রদায়ের কার্যকলাপে প্রমাণিত হয় যদিও এদের বেশিরভাগই কোনদিন ইসরাইল রাষ্ট্র ভ্রমণ করেনি বা স্বচক্ষে দেখেনি।

অবসরপ্রাপ্ত মোসাদ ক্যাটসা বা কেইস অফিসার ভিক্টর অস্ট্রোভাস্কি বলেন, "মোসাদের বিশেষ স্পাই নেটওয়ার্কে যোগদানের পর আমি প্রত্যক্ষ করলাম - এই সংস্থার ভিত্তি লোভ, লালসা ও খুন-খারাবী নিয়ে পরিচালিত। যেখানে মানবতার কোন মূল্যবোধ নেই- এ কারণে এ বইটি লিখতে আমি উৎসাহিতবোধ করেছি।"

অস্ট্রোভাস্কি লিখেছেন, মোসাদ এবং সিআইএ পরস্পর পরস্পরের কাছে তথ্য আদানপ্রদানে চুক্তিবদ্ধ। এতদসত্ত্বেও মোসাদ আমেরিকান নাগকিরদের উপর গোয়েন্দাগিরি করে। বিশেষ করে আমেরিকার নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন এবং বর্ডার এলাকাগুলোতে মোসাদ অধিক তৎপর। এ সমস্ত এলাকায় মোসাদ বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে আমেরিকান নাগরিকদেরকে মোসাদের পক্ষে কাজ করতে বাধ্য করে।

এ সমস্ত এজেন্টরা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে মোসাদকে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মানের বড় বড় হোটেলগুলোতে যেখানে 'মোসাদ ব্ল্যাকলিস্টেড' ভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ বিভিন্ন কার্যপোলক্ষে এ সমস্ত হোটেলে অবস্থান করেন তখন মোসাদ এজেন্টরা আগত বহিঃশত্রুর কার্যকলাপ হোটেলকক্ষে প্রতিস্থাপিত গোপনীয় ডিভাইসের মাধ্যমে আড়ি পেতে শুনে এবং মোসাদকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। এমনকি মোসাদ কিলিং স্কোয়াডকে সায়ানিম-এর মাধ্যমে (সাহায্যকারী ব্যক্তি বা সংস্থা) প্রয়োজনে হোটেলকক্ষের চাবি সরবরাহ করা হয় যাতে কিলাররা শত্রুপক্ষকে সহজে হত্যা করতে পারে।

লিবিয়ায় গাদ্দাফি প্যালেসে আমেরিকান হামলা প্রসঙ্গে অস্ট্রোভাস্কি তার বইতে লিখেছেন, লিবিয়ায় আমেরিকান সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন ছলচাতুরীর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ইসরাইলই নিয়ন্ত্রণ করেছিল এবং মোসাদই গাদ্দাফি প্যালেসে বোমা মেরে গাদ্দাফিকে হত্যার ছক এঁকেছিল।

লিবিয়ার মাটিতে মোসাদ গোপনে একটি রেডিও ট্রান্সমিটার প্রতিস্থাপন করেছিল এবং গোপনীয় এ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে আমেরিকান সেনাবাহিনীর উপর অক্রমণ করার নির্দেশ দেওয়া হতো। বুঝানো হতো, এ নির্দেশ

লিবিয়ার সামরিক বাহিনী তথা গাদ্দাফি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কিন্তু মোসাদের এ কৌশল আমেরিকান বাহিনীকে বোকা বানিয়ে লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির বিরুদ্ধে আমেরিকান সেনাবাহিনীকে উসকে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

ফলশ্রুতিতে আমেরিকান বিমানবহর গাদ্দাফি প্যালেসে আঘাত হানে। তিনজন আমেরিকান সৈন্য এবং গাদ্দাফির পালিত কন্যাসহ লিবিয়ার চল্লিশজন সেনাসদস্য এ আক্রমণে নিহত হয়। এভাবে লিবিয়ার মাটিতে ইসরাইলি মোসাদ গুপ্তচর সংস্থা বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে আমেরিকান সেনাসদস্যদেরকে যত্রতত্র বিমান হামলা পরিচালনাতে উৎসাহ যোগায় যে কারণে লিবিয়ার অসংখ্য নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়।

ইরাক-ইরান আটবছর মেয়াদি যুদ্ধকে প্রলম্বিত করেছিল আমেরিকা ও ইসরাইলি ষড়যন্ত্র। এ দুদেশের সেনাসংখ্যা ইসরাইলের শঙ্কার বিষয়বস্তু ছিল। তাই ইরাক-ইরানের সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে দেওয়াই ইসরাইলের প্রধান লক্ষ ছিল। ১৯৮৬ সালের ১লা মে থেকে মোসাদের প্রচারণা বিভাগ প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে বিশ্বশান্তির পথে অন্তরায় বলে প্রচার করে আসছে। এর পেছনে ইরাকের বিশাল সেনাসংখ্যা যারা ইসরাইলের দিকে তাক করে আছে তাদের শক্তিকে যেকোনো উপায়ে দূর্বল করে দেওয়ার নিমিত্তে প্রথমে ইসরাইল ইরাকের আণবিক প্রকল্পে ১৯৮১ সালে বোমার আঘাত হানে।

কোন দেশের উপর উস্কানীমূলক আক্রমণ জাতিসংঘের নীতি বিরুদ্ধ এ কারণে আমেরিকার জনগণ এবং সরকারকে প্রচারণা চালিয়ে আমেরিকান সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল ইসরাইল। ইরাক অধ্যুষিত কুর্দিস্তানে বিদ্রোহী কুর্দিদেরকে সিআইএ ও মোসাদ প্রচুর অর্থ ও সামরিক সরঞ্জাম গোপনে সরবরাহ করে। মোসাদের পরিকল্পনামাফিক বিদ্রোহী কুর্দিরা ইরাকি সেনাদের উপর গেরিলা আক্রমণ চালায় এবং ইরাকি গ্যাস বোমায় ক্ষতবিক্ষত নিরীহ কুর্দিদের বিভৎস চিত্র (অদৌ সত্যি ছিল কি না তা পরীক্ষা না করেই) আমেরিকার ইহুদি নিয়ন্ত্রিত টিভি চ্যানেল সিএনএন, এবিসি টিভি, ফক্স নিউজ, দি নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ইত্যাদি ইহুদি গণমাধ্যম ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়। এ কারণে বুশ প্রশাসনের নিরব ইঙ্গিতে মোসাদ ইরাকের একটি বিস্ফোরক ফ্যাক্টরীতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। তথাকথিত ইরাকি সুপারগান, পারমাণবিক শক্তিতে ইরাকের রূপান্তরের খবর, ইরাক জ্বালানী তেলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে ইত্যাদি ছিল মোসাদের প্রচারণার অংশবিশেষ যাতে

আমেরিকা ও তাদের মিত্ররা সাদ্দাম ও তার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে।

অবসরপ্রাপ্ত মোসাদ ক্যাটসা বা কেইস অফিসার ভিক্টর অস্ট্রোভাস্কি বিবেকের তাড়নায় তার দু'টো বই 'বাই ওয়ে অব ডিসেপসন' ও 'দ্য আদার সাইড অব ডিসেপসন' গ্রন্থদ্বয়ে মোসাদের গোপনীয় তথ্য তুলে ধরেছেন যা ভয়াবহ। এ বইগুলোর প্রকাশনা বন্ধ করার জন্য মোসাদ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় কিন্তু ভিক্টর শেষপর্যন্ত এক কানাডিয়ান প্রকাশকের মাধ্যমে বইগুলো প্রকাশ করতে সমর্থ হন। পরবর্তীতে তিনি একটি স্পাই নোবেল লিখেন যার নাম 'লায়ন অব জুদা'। এটি কাল্পনিক হলেও তিনি বিভিন্ন চরিত্রে মোসাদের আভ্যন্তরিণ প্রবঞ্চনার টেকনিক এবং নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে চরিত্রগুলোর রূপরেখা অংকিত করেছেন যা মোসাদের আভ্যন্তরিণ কার্যকলাপ সম্মন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারা যায়।

ইহুদি লবি সমর্থিত 'এডিএল' (এন্টি ডিফ্রেমেশন লীগ)- এ প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো ইসরাইলের অবমাননা হয় এমন কাজ থেকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে বিরত রাখা।

মোসাদ কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন মিডিয়া সিদ্ধান্ত নেয় ভিক্টর অস্ট্রোভাস্কিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত[২]। কিন্তু ইসরাইলে জন্ম নেওয়া প্রাক্তন মোসাদ কেইস অফিসারকে (কানাডার নাগরিক) হত্যা করলে কানাডার সাথে ইসরাইলের কূটনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে এ আশঙ্কায় পরে এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে ভিক্টরকে 'অর্থনৈতিক অবরোধ' করার পক্ষে এডিএল সায় দেয়। অবরোধের নিরব এ চাপ প্রয়োগে ভিক্টর প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েন।

তার অবর্তমানে কানাডায় তার বসতভিটা এক অজানা কারণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়, কানাডিয়ান এক প্রাইভেট টিভি-তে তার চাকরীরত মেয়ে অজানা কারণে চাকুরী হারায়। প্রকাশের অপেক্ষায় তার অন্য একটি গ্রন্থ 'দ্য স্পাই গেম" কোন প্রকাশক প্রকাশ করতে রাজি হয়নি। তার পাওনা পরিশোধে প্রকাশক বিভিন্ন অজুহাত দেখায়। প্রথমোক্ত দু'টো বই বাজেয়াপ্ত করার জন্য মোসাদ এবং এডিএল বিভিন্ন উপায় খুঁজতে থাকে। কানাডা এবং আমেরিকায় বসবাসরত ইহুদি সম্প্রদায়ভূক্ত লোকদের কাছে ভিক্টরকে হেয় প্রতিপন্ন করার সকল চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

---

২. তৎকালীন ইসরাইলি টিভি প্রধান ইউসুফ লেপিড মোসাদকে সরাসরি এ প্রস্তাব দেন। বহুল প্রচারিত ইসরাইলি পত্রিকা 'মারিভ' এ সংবাদ প্রকাশ করে।

ইসরাইল হতে প্রকাশিত 'জেরুজালেম পোস্ট' পত্রিকায় একজন ইহুদি বিশ্লেষক লিখেন, 'পৃথিবীর সবাই জানে, বোকা আমেরিকানরাও জানে যে, আমরা ইহুদিরা আমেরিকান সরকার বা হোয়াইট হাউসে যারাই থাকুক না কেন তাদেরকে নিয়ন্ত্রন করি। আমেরিকান প্রেসিডেন্টের কোন ক্ষমতা নেই আমাদের বিপক্ষে যাওয়ার। আমেরিকানরা আমাদের কি ক্ষতি করতে পারবে যেহেতু আমরা আমেরিকান কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রন করি, মিডিয়া নিয়ন্ত্রন করি এবং সরকারের সব চ্যানেলই নিয়ন্ত্রন করে থাকি। **আমেরিকায় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কটুক্তি করা যায় কিন্তু ইসরাইল রাষ্ট্রের সমালোচনা করা যায়না।**

আমেরিকার ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান পার্টির সকল সদস্যরাই এ ধরণের অপমানজনক মন্তব্য হজম করেন এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য ন্যায়বিচারে অনীহা প্রকাশ করেন।

গাজা ও আফ্রিকায় ইসরাইলের রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ

জীবাণু ও সংক্রামণ ছড়িয়ে পড়ে এমন ভয়ঙ্কর মরণাস্ত্র মোসাদ বিজ্ঞানীরা গাজা ভূ-খণ্ডে ফিলিস্তিনি জনগণের উপর ২০০৮-০৯ সালে এবং আফ্রিকার সুইটোতে ১৯৮৬ সালে পরীক্ষা করে। এর ভয়াবহতা লক্ষ করা যায় যখন গাজা ভূ-খণ্ডে শত শত নিরীহ মানুষের অস্থি হতে গুলির আঘাত ছাড়াই মাংস ঝরে পড়ে এবং আফ্রিকার সুইটোতে এইডসহ অন্যান্য নিরব ব্যাধির ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব ঘটে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে যেকোনো পরাশক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হলে ইসরাইল যাতে যুদ্ধজয়ে সমর্থ হয় সে কারণে ইসরাইল এ ধরণের রাসায়নিক ও সংক্রামক অস্ত্রভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

ইসরাইলের 'নেস জিওনা ফ্যাসিলিটি' যার অন্য নাম 'এবিসি ওয়ারফেয়ার ফ্যাক্টরী' যেখানে ইসরাইলি বিজ্ঞানীরা এ সমস্ত মরণাস্ত্র তৈরিতে লিপ্ত রয়েছে। এবিসি রূপক নাম যার অর্থ দাঁড়ায়- এ-তে এটম, বি-তে ব্যাকটেরোজিক্যাল এবং সি-তে কেমিক্যাল।

টুইন টাওয়ার হামলা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ আক্রমণের পেছনে ইহুদিদের ভূমিকা

টুইন টাওয়ার হামলার পেছনে আল-কায়েদা এবং তালেবান জঙ্গিরা জড়িত সন্দেহে বুশ প্রশাসন আফগানিস্তানে হামলা চালায়। এ হামলার পেছনে যদিও নির্দিষ্ট প্রমাণ বুশ প্রশাসনের হাতে ছিল না। সিআইএ কিংবা এফবিআই-য়ের সামরিক কর্মকর্তাদের অনেকেই আল-কায়েদা বা তালেবানদের এহেন শক্তি সম্পর্কে এখনো সন্দিহান কিন্তু ইহুদি নিয়ন্ত্রিত প্রশাসন প্রেসিডেন্ট বুশকে বিশ্বাস করাতে সমর্থ হয় যে এটা ওসামা বিন লাদেনের নের্তৃত্বে পরিচালিত আল-কায়েদার কাজ। অনেক আমেরিকানরা বিশ্বাস করেন যে, টুইন টাওয়ার হামলার পেছনে মোসাদ জড়িত তা না হলে হামলার দিন টুইন টাওয়ারে কর্মরত প্রায় চারহাজার ইহুদিরা প্রাণে বেঁচে গেল কিভাবে? অবশ্যই এ হামলার ব্যাপারে সতর্ক করে টুইন টাওয়ারে কর্মরত ইহুদিদেরকে পূর্বেই জানানো হয়েছিল যে কারণে ঐদিন ইহুদিরা কর্মবিরতি পালন করছিল।

বুশ প্রশাসনে ২০০৩ সালে কর্মরত উচ্চপদস্থ আংশিক ইহুদি নীতিনির্ধারকদের তালিকা

রিচার্ড পার্ল (Richard Parle)

প্রেসিডেন্ট বুশের বৈদেশিক নীতি উপদেষ্টা রিচার্ড পার্ল (ইহুদি) বুশের আমলে পেন্টাগনের প্রতিরক্ষা নীতি বোর্ডেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। একসময় পার্ল ১৯৭০ সালে সিনেটর হেনরী জ্যাকসনের অফিস 'জাতীয় প্রতিরক্ষা এজেন্সি' হতে আমেরিকাস্থ ইসরাইলি দূতাবাসে জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের মূল্যবান দলিল হস্তান্তরের অপরাধে সিনেটর জ্যাকসনের অফিস হতে বহিস্কৃত হন। পরবর্তী পর্যায়ে পার্ল ইসরাইলের 'সলটাম' নামক অস্ত্র কারখানার গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রেসিডেন্ট বুশের উপদেষ্টা এবং পেন্টাগণের প্রতিরক্ষা নীতিনির্ধারক হিসেবে বুশ তারই প্ররোচনায় ইরাক আক্রমণে সম্মতি দেন। পার্ল একজন নিবেদিত ইহুদি হিসাবে ইসরাইলের স্বার্থে কাজ করার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

পল উলফইতজ (Paul Wolfowitz)

বুশ প্রশাসনে কর্মরত ডেপুটি প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি এবং রিচার্ড পার্ল-এর প্রতিরক্ষা নীতি বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য পল একজন ইহুদি। ইসরাইলি মিলিটারী প্রশাসনের সাথে পরোক্ষভাবে জড়িত। প্রেসিডেন্ট বুশকে ইরাক আক্রমণ করতে পল উৎসাহিত করেছিলেন।

ডগলাস ফেইথ (Douglas Feith)

আন্ডার সেক্রেটারি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় এবং পেন্টাগনের একজন ইহুদি নীতি নির্ধারক। ডগলাস ইসরাইলি স্বার্থে নিবদিতপ্রাণ এবং আরববিদ্বেষী। ইসরাইলি সমরাস্ত্র প্রস্তুতকারক এবং ইসরাইলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইরাক আক্রমণে পূর্বোক্ত দু'জনের মত তিনি বুশকে প্রভাবিত করেন।

অ্যাডওয়ার্ড লুতবক (Edward Luttwak)

আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনীর সদর দফতর পেন্টাগণের জাতীয় প্রতিরক্ষা দফতরের একজন গুরুত্বপূর্ণ ইহুদি সদস্য। ইসরাইলি পত্রপত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ও ইহুদি সম্প্রদায়ের দিক-নির্দেশক। অন্যান্যদের মত প্রেসিডেন্ট বুশকে ইরাক আক্রমণে প্রভাবিত করেন।

হেনরী কিসিঞ্জার (Henry Kissinger)

পৃথিবীর অনেক ধ্বংসযজ্ঞের সফল হোতা এই ইহুদি কূটনীতিবিদ। রিচার্ড পার্ল-এর অধীনে পেন্টাগন প্রতিরক্ষা দফতরের একজন নীতি নির্ধারক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং লাওসের কিলিং মিশনে আমেরিকার পক্ষে নের্তৃত্বদানকারী। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সময় সংঘটিত ওয়াটারগেট কেলেংকারীতে কিসিঞ্জার সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম নিধনে সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট মিলোসভিকের পরামর্শদাতা, দক্ষিণ আমেরিকার চিলি, কিউবা, পানামা ইত্যাদি দেশে গণহত্যার পেছনে ইন্ধনদাতা, ইসরাইলের স্বার্থে ইরাক যুদ্ধের পেছনে বুশ প্রশাসনকে ইন্ধন জোগানো, আফগানিস্তানে আমেরিকার সামরিক হস্তক্ষেপ, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসরাইলি স্বার্থে সমর্থন আদায়, ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরাইলের অন্যায় আচরণের জন্য যখন বিশ্ববিবেক সোচ্চার তখন ইসরাইলের অন্যায় আচরণের পক্ষে জাতিসংঘে আমেরিকার ভেটো প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিসিঞ্জার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ফিলিস্তিনিদের দেশান্তর এবং গণহত্যা করতে প্রয়াত ইসরাইলি প্রতিরক্ষা প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন যে ভূমিকা পালন করে, কিসিঞ্জারকে মুসলিম বিশ্বে অশান্তি আর সাম্প্রতিককালের গণহত্যার জন্য সমভাবে দায়ী করা হয়। টুইন টাওয়ার পতনের পেছনে কারা দায়ি তা নিরুপণের জন্য প্রেসিডেন্ট বুশ কিসিঞ্জারকে লোকদেখানো তদন্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করে। কিসিঞ্জার বুশ প্রশাসনকে ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়েদা দায়ী বলে রিপোর্ট প্রদান করার পরপরই বুশ প্রশাসন আফগানিস্তানের নিরীহ জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আমেরিকার সিআইএ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আল-কায়েদার কাছে টুইন-টাওয়ার ধ্বংসের তেমন সরঞ্জাম বা শক্তি ছিল না বরং ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ-এর পক্ষে এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব।

ডোভ জাকেইম (Dov Zakheim)

বুশ প্রশাসনের অধীনে আমেরকিার প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি ও চীফ ফিনেন্স কম্পট্রোলার। ডোভ একজন ইহুদি পুরোহিত বা রাব্বি। ইহুদি স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ এবং আমেরিকার ইহুদি লবির একজন নীতিনির্ধারক। ইরাক এবং আফগানিস্তান আক্রমণে ইহুদি লবির সমর্থনের সাথে তিনি একাত্ম ছিলেন।

কেনেথ আদেলম্যান (Kenneth Adelman)

বুশ প্রশাসনের অধীনে আমেরিকার প্রতিরক্ষা দফতরের একজন প্রভাবশালী ইহুদি সদস্য। ইরাক আক্রমণে বুশ প্রশাসনকে প্রভাবিত করা এবং ইসরাইলের প্রতিরক্ষায় আমেরিকার সাহায্য অব্যাহত রাখার স্বপক্ষে পরামর্শদাতা হিসেবে পরিচিত। মুসলিম ও আরব বিদ্বেষী ভুমিকায় ইহুদি মিডিয়া 'ফক্স নিউজে' প্রায়শই বক্তব্য রাখতে দেখা যায়।

লিউইস লিবি (Lewis Libby)

প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চিনির চীফ অব ষ্টাফ লিবি একজন ইহুদি। ডিক চিনি এবং প্রেসিডেন্ট বুশকে ইরাক আক্রমণে লিউস প্রভাবিত করে। আমেরিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ইসরাইলি মোসাদ স্পাই 'মার্ক রিচ' আমেরিকার সিআইএ-র কাছে ধরা পড়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়। স্কুটার লিউস

লিবির উকালতিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন মার্ক রিচকে ক্ষমা করে মুক্তির আদেশ দেয়।

রবার্ট সাতলফ (Robert Satloff)

আমেরিকার জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের একজন উপদেষ্ঠা। আমেরিকাস্থ ইহুদি লবির চিন্তাশালার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং পূর্ব-এশিয়ার নীতিনির্ধারক।

এলিয়ট আব্রামস (Elliott Abrams)

আমেরিকার জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের একজন প্রভাবশালী ইহুদি উপদেষ্ঠা। প্রেসিডেন্ট রিগেন-এর শাসনামলে সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল-এর দায়িত্ব পালন করেন। ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরানের কাছে আমেরিকান অস্ত্রসম্ভার বিক্রি করে এ যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করার সকল প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রাখে যাতে এ দুটো দেশ ইসরাইলের সাথে কোনদিন যুদ্ধে লিপ্ত না হতে পারে। বুশ (সিনিয়র) কোন দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণের পূর্বে তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন এ ব্যক্তির পরামর্শ নিয়ে অগ্রসর হতেন।

মার্ক গ্রসম্যান (Marc Grossman)

বিল ক্লিনটন এবং বুশের আমলের একজন রাজনৈতিক উপদেষ্ঠা। প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্ঠা হিসেবে ইহুদি স্বার্থে সবসময়ই তৎপর। মুসলিম বিশ্বের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ইহুদি স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে ইহুদি লবির সাথে একযোগে কাজ করার প্রমাণ রয়েছে।

রিচার্ড হস (Richard Haass)

বুশ (সিনিয়র) প্রশাসনে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের পরিকল্পনা কমিশন এবং পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক ডিরেক্টর। বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের দূত হিসেবে কোথায় কাকে পাঠানো হবে তার পরিকল্পনাকারী। একসময়ে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের এ সদস্য ইরাকের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের সপক্ষে উৎসাহদাতা।

রবার্ট জোএল্লিক (Robert Zoellick)

বুশ (জুনিয়র) প্রশাসনে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিষয়ক কেবিনেট সেক্রেটারি। ইরাক দখল করে এবং ইরাককে দ্বি-খন্ডিত করে একাংশে আমেরিকার একটি পুতুল সরকার গঠনে একজন পরামর্শদাতা এবং ইরাকের তেলক্ষেত্র

আমেরিকার দখলে নিতে বুশ (জুনিয়র)-কে প্রভাবিত করে। ইসরাইল এবং আমেরিকার ষড়যন্ত্রে ইরাকের কুর্দি বিদ্রোহীরা কুর্দি অধ্যুষিত এলাকা জুড়ে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে তাই আজ সোচ্চার। কুর্দিদেরকে ইসরাইল ও আমেরিকা সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করছে। ব্যক্ত থাকে যে, মুসলিম অধ্যুষিত সুদানকে কয়েকবছর পূর্বে ঠিক এভাবেই দ্বিখণ্ডিত করে দক্ষিণ সুদানে আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স খ্রিস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

আরি ফ্লেইসচার (Ari Fleischer)

বুশ (জুনিয়র) প্রশাসনে হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র। হাসিডিক গোত্রের এ ইহুদি প্রবল মুসলিমবিদ্বেষী এবং বুশ প্রশাসনকে মুসলিম স্বার্থ বিরোধী কাজে উৎসহিত করত।

জেমস আর. শ্লেসিঞ্জার (James Schlesingre)

বুশ (জুনিয়র) প্রশাসনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দফতরের একজন উপদেষ্ঠা এবং পেন্টাগনের জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন কমিশনার। প্রতিরক্ষা বিষয়ক ইহুদি ডিরেক্টর রিচার্ড পার্ল-এর সাথে সুর মিলিয়ে ইরাক আক্রমণের ব্যাপারে একজন উৎসাহদাতা।

ডেভিড ফ্রুম (David Frum)

বুশ (জুনিয়র) প্রশাসনে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য লেখক। ইরাক আক্রমণের প্রাক্কালে প্রেসিডেন্টের অনেক মিথ্যে বক্তব্য লিখে ইরাক আক্রমণে বিশ্বের সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট ছিল।

জশুয়া বোল্টেন (Joshua Bolten)

হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ। ইহুদি কমিউনিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ মুখপাত্র হিসেবে বুশ প্রশাসনকে দিক-নির্দেশনা দিত।

জন বোল্টন (John Bolton)

বুশ প্রশাসনে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের আর্মস্ কন্ট্রোল এবং আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক একজন সিনিয়র উপদেষ্ঠা। আমেরিকান ইহুদি লবির ভাইস-প্রেসিডেন্ট। সিরিয়া আণবিক শক্তিসম্পন্ন হওয়ার প্রচেষ্ঠা চালাচ্ছে বলে আক্টোবর ২০০২ সালে একটি গুজব রটান যাতে আমেরিকা এ বাহানা দেখিয়ে ইরাকের পরে সিরিয়া আক্রমণ করতে পারে। বর্তমানে বোল্টন

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামরিক উপদেষ্ঠা। আমেরিকা ইরানকে আক্রমণ করতে এবং অর্থনৈতিক অবরোধ অরোপ করার উৎসাহদাতা।

ডেভিড রামসার (David Wurmser)

জন বোল্টন-এর বিশেষ সহকারী পরামর্শক। তার স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের অনেকেই ইসরাইলি গুপ্তচরসংস্থা মোসাদের সক্রিয় সদস্য। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে মধ্যপ্রাচ্যের মিডিয়া রিসার্চ ইন্সটিটিউট-এ আরবি সংবাদপত্র হতে বেছে বেছে প্রকাশিত সংবাদ তর্জমা করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোকে হেয় করার মিশনে এ ইন্সটিটিউট তৎপর রয়েছে।

এলিওট এ. কোহেন (Eliot Cohen)

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা নীতি বোর্ডের পরিচালক ইহুদি 'রিচার্ড পার্ল-এর' উপদেষ্টা। আরব ও মুসলিমবিদ্বেষী হিসেবে খ্যাত এ ইহুদি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে লিখে "ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরকে শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করতে হবে, সন্ত্রাসী হিসেবে নয়।"

মেল সেম্বলর (Mel Sembler)

যুক্তরাষ্ট্রের আমদানি-রপ্তানি বিষয়ক ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট। রিপাবলিকান এ ইহুদি একসময় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্টিত ছিলেন। আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলো হতে কিভাবে অর্থ আহরণ করলে আমেরিকা ও ইসরাইল লাভবান হবে এ ব্যাপারে তার অবদান অনস্বীকার্য।

মাইকেল চের্টফ (Michael Chertoff)

বুশ প্রশাসনে কর্মরত বিচার বিভাগের সহকারী এটর্নী জেনারেল। আমেরিকান ইহুদি লবি AIPAC-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং ইসরাইলি স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ।

স্টিভ গোল্ডস্মিথ (Steve Goldsmith)

প্রেসিডেন্ট বুশ (জুনিয়র)-এর সিনিয়র উপদেষ্ঠা। আমেরিকার অঙ্গরাজ্য ইন্ডিয়ানাপলিসের প্রাক্তন মেয়র। ইসরাইলি মেয়র ইয়াহুদ ওলমার্ট-এর

বিশিষ্ট বন্ধু এবং ইসরাইল-আমেরিকান সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালনকারী।

অ্যাডাম গোল্ডম্যান (Adam Goldman)

হোয়াইট হাউসে আমেরিকান ইহুদি সম্প্রদায়ের স্বার্থ তুলে ধরার জন্য বিশেষ মুখপাত্র।

জোসেফ বার্নাড গিলডেনহোর্ন (Joseph Gildenhorn)

সুইজারল্যান্ডে নিযুক্ত আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং প্রেসিডেন্ট বুশ (জুনিয়র)-এর নির্বাচন সঙ্গী। ইহুদি লবি এবং আমেরিকায় বসবাসরত ইহুদি সম্প্রদায়ের ভোট যাতে পছন্দনীয় প্রেসিডেন্ট বুশ (জুনিয়র)-এর বাক্সে যায় তার প্রচারাভিযানকারী হিসেবে সর্বাদিক পরিচিত।

ক্রিস্টোফার গের্সটেন (Christopher Gersten)

বুশ প্রশাসনে শিশু ও পরিবার বিষয়ক উপ-প্রধান সহকারী সেক্রেটারি। তার স্ত্রী লিন্ডা সেভেজ ইসরাইলি ও ইহুদি স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ এবং স্বামীকে ইসরাইলি ও ইহুদি স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহদানকারী।

মার্ক ওয়াইনবারগার (Mark Weinberger)

বুশ প্রশাসনের সময় থেকে নিযুক্ত সমাজ ও শহর উন্নয়ন বিষয়ক সহকারী সেক্রেটারি। আমেরিকাসহ বিশ্বের অন্যান্য স্থানে বসবাসরত ইহুদি সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় তৎপর।

স্যামুয়েল বডম্যান (Samuel Bodman)

বুশ প্রশাসনে নিযুক্ত বাণিজ্য বিষয়ক ডেপুটি সেক্রেটারি। বোস্টনের ক্যাবট কর্পোরেশনের প্রধান। ইহুদি সম্প্রদায়ের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের স্বার্থে পক্ষপাতদুষ্ট।

বোনি বেইনব্রিজ কোহেন (Bonnie Cohen)

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি। ইহুদি স্বার্থে সোচ্চার।

লিনকলিন পি. ব্লুমফিল্ড জুনিয়র (Lincoln Bloomfield)

বুশ প্রশাসনে কর্মরত রাজনৈতিক ও মিলিটারি সংক্রান্ত সহকারী সেক্রেটারি।

জয় লেফকোইতজ (Jay Lefkowitz)
প্রেসিডেন্ট বুশের রাজনৈতিক উপ-সহকারী এবং ডমেস্টিক পলিসি কাউন্সিলের ডিরেক্টর। ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ।

কেন মেলমান (Ken Melman)
হোয়াইট হাউসের একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক। আমেরিকা ও ইসরাইলের স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর।

ব্রাড ব্লাকমেন (Brad Blakeman)
হোয়াইট হাউসে নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট বুশের দৈনন্দিন কর্মপন্থা বিশ্লেষক ও পরিচালক।

র‍্যান্ডি স্‌চিউনেম্যান (Randy Scheunemann)
বুশ প্রশাসনের সময় গঠিত কমিটি ফর লিবারেশন অব ইরাক-এর প্রেসিডেন্ট। প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামস্‌ফিল্ডের ইরাক নীতির পরামর্শদাতা।

রবার্ট রুবিন (Robert Rubin)
আমেরিকার প্রাক্তন ট্রেজারী সেক্রেটারি। বুশ-ক্লিনটন প্রশাসনে ইহুদি স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হিসেবে অধিক পরিচিত।

এ্যালান গ্রিনস্প্যান (Alan Greenspan)
প্রাক্তন ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান। পরবর্তী পর্যায়ে রিগেন, বুশ ও ক্লিনটন প্রশাসনের খাদ্য ভান্ডারের চেয়ারম্যান ছিলেন।

জ্যাক লিউ (Jack Lew): প্রেসিডেন্ট ওবামার ট্রেজারী সেক্রেটারি।

টিম গেইথ্‌নার (Tim Geithner) : প্রেসিডেন্ট ওবামার ট্রেজারী সেক্রেটারি।

হেনৃক পলসন (Hank Paulson) : প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বুশের ট্রেজারী সেক্রেটারি ।

রবার্ট রবিন (Robert Rubin) : প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ক্লিংটনের ট্রেজারী সেক্রেটারি ।

বেন বার্ন্যানকি (Ben Bernanke) : ফেডারেল রিজার্ভ -এর চেয়ারম্যান।

জনেত ইয়লেন (Janet Yellen): ফেডারেল রিজার্ভ -এর ডেপুটি চেয়ারম্যান।

ডোনাল্ড এল. কহেন (Donald Cohn) : ফেডারেল রিজার্ভ -এর প্রাক্তন ডেপুটি চেয়ারম্যান।

রুথ এ. ড্যাভিস (Ruth Davis)

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত ট্রেনিং ডিরেক্টর। বিদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতসহ দেশীয় সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মকর্তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে থাকেন। সাম্প্রতিককালে তারই বদৌলতে বিদেশে বেশিরভাগই ইহুদি সাবেক ও বর্তমান রাষ্ট্রদূত কর্মরত আছেন এমন কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ড্যানিয়েল সি. কুর্টজার (Daniel Kurtzer): ইসরাইলে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত।

ক্লিফোর্ড সোবেল (Cliff Sobel) : নেদারল্যান্ডে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত।

স্টুয়ার্ট বার্নস্টেইন (tuart Bernstein): ডেনমার্কে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত।

ন্যান্সি ব্রিঙ্কার (Nancy Brinker): হাঙ্গেরীতে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত।

ফ্র্যাঙ্ক ল্যাভিন (Frank Lavin) : সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত।

রন উইসের (Ron Weiser) : স্লোভাকিয়ায় নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত।

মেল সেম্বলর (Mel Sembler) : ইতালীতে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত।

মার্টিন জে. সিলভারস্টেইন (Martin Silverstein) : উরুগুয়েতে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত।

বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনস্থ ইহুদি উপদেষ্টা ও কর্মকর্তা :

আব্রাহাম আবি বার্কোউইচ (Avrahm (Avi) Berkowitz): প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়র উপদেষ্টা কোচনারের বিশেষ সহকারী।

জারেড কুশনার (Jared Kushner): সিনিয়র উপদেষ্টা (প্রেসিডেন্ট জামাতা)

ডেভিড ফ্রাইডম্যান (David Friedman) ইসরাইলে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত।

জেসন গ্রীণব্লাট (Jason Greenblatt) : ইসরাইল-ফিলিস্তিন সম্পর্কিত বিশেষ প্রতিনিধি।

ষ্টিভ মনুচিন (Steve Mnuchin) : ট্রেজারী সেক্রেটারী।

স্টীফেন মিলার (Stephen Miller) : সিনিয়র উপদেষ্ঠা, নীতি নির্ধারণ।

এ্যনি নিউবার্গার (Anne Neuberger) : উপ-ব্যবস্থাপক, জাতীয় প্রতিরক্ষা।

গ্যারি কোহেন (Gary Cohn) : পরিচালক, হোয়াইট হাউস ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিল।

রিড কর্ডিস (Reed Cordish): প্রেসিডেন্টের সহকারী, সরকারী টেকনোলজি বিষয়ক।

রড রসেনষ্টেইন (Rod Rosenstein) প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী।

ইলান কার (Elan Carr) : প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত

জেফ্রে এ রসেন (Jeffrey A. Rosen) : ডেপুটি সেক্রেটারী, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

বিভিন্ন দেশে প্রাক্তন ইহুদি প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীবর্গ :

ডেভিড ক্যামেরুন (David Cameron) : প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

নিকোলাস সারকোজী (Nicolas Sarkozi) : ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট।

বরিস ইয়ালসিন (Boris Yeltsin): সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট।

মিখাইল গর্ভাচেভ (Michail Gorvachev): সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট।

ম্যাক্সিম লাতিনভ (Maxim Litvinov): সোভিয়েত প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

ডেভিড মার্শাল (David Marshal): সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

আইজ্যাক ইসাক (Issac Isaacs): অষ্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেল।

বেঞ্জামিন ডিসরেইলি (Benjamin Disraeli): ব্রিটিশ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও স্বনামধন্য লেখক।

ইয়েভগেনি প্রিমাকভ (Yevgeny Primakov): রাশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

জর্জ সম্পইও (Jorge Sampaio : পর্তুগালের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট।

হার্ব গ্রে (Herb Gray): কানাডার প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী।

পিরি মেন্ডেস (Pierre Mendes): ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

মাইকেল হাওয়ার্ড (Michael Howard): ব্রিটেনের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ব্রুনো ক্রেইস্কাই (Bruno Kreisky): অষ্ট্রিয়ার প্রাক্তন চ্যান্সেলর।

ব্যক্ত থাকে যে, আমেরিকার বিমানবাহিনীর সাম্প্রতিক রিপোর্টে প্রকাশ করা হয় যে, ইসরাইলের কাছে কমপক্ষে ৮০-১৫০টি পারমাণবিক বোমা মওজুদ আছে অথচ ইহুদি লবির শক্তিশালী ভূমিকায় যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে সবসময় নিরব ভূমিকা পালন করে আসছে এবং ইসরাইলকে কখনও এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করেনি।

সাম্প্রতিককালে সিরিয়ার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের গুজব ও গৃহযুদ্ধের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকেই দায়ী করেছে রাশিয়া। রাশিয়া এবং বিশ্ববিবেক যদি সিরিয়ার পক্ষ না নিত তাহলে আমেরিকা ইহুদি লবির প্ররোচনায় সিরিয়া আক্রমণে পিছপা হতোনা। গোপনে সিরিয়ার বিদ্রোহীদেরকে ইসরাইল ও আমেরিকা রাসায়নিক অস্ত্রসহ প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করেছে যাতে গৃহযুদ্ধের ফলে সিরিয়ার মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়।

ইতোমধ্যে এ গৃহযুদ্ধে একলক্ষের উপরে নিরীহ জনগণ প্রাণ দিয়েছে, এরমধ্যে পঞ্চান্ন হাজারের উপরে নারী ও শিশু রয়েছে। বাস্তুভিটা হারিয়ে প্রায় ছাপ্পান্ন লক্ষ জনতা তুরস্ক এবং পার্শবর্তী দেশসমূহের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। ইসরাইলের হিট লিষ্টে রয়েছে এখন শুধুমাত্র ইরান। আমেরিকা ও ইসরাইল বাহানা খুঁজছে কিভাবে ইরানেরও মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেওয়া যায়। প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোকে একে একে পঙ্গু করে দিচ্ছে ইহুদি সাম্রাজ্যবাদ। মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বিধ্বস্থপ্রায়। মধ্যপ্রাচ্যসহ আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলোর হাজার হাজার মুসলিম জনগণ আজ ইসরাইল ও আমেরিকার নজিরবিহীন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমণে হাত পা ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে যে কারণে পৃথিবীর মুসলিম দেশগুলোতে ইয়াতিম এবং ফকির মিসকিনদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আমেরিকান দূতাবাসে কূটনৈতিক পর্যায়ে ইহুদি লবির পরামর্শে কর্মরত রয়েছেন অসংখ্য ইহুদি কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্রদূত যাদেরকে সনাক্ত করা কঠিন যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে তারা খ্রিস্টান নাম ব্যবহার করে থাকে। তারা নিজেদেরকে কখনো ইহুদি ধর্মের অনুসারী বলে পরিচয় দেয় না কারণ ইহুদিরা সাধারণত শত্রু এড়াতে নিজেদেরকে আড়াল করে রাখে। বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে আমেরিকার ইহুদি রাষ্ট্রদূতেরা সে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অনুপ্রবেশ করে রাজনৈতিক নেতাদেরকে প্রভাবিত করে। মুসলিম সমাজকে শ্রেণি, গোষ্ঠি ইত্যাদিতে বিভক্ত করে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে তারা অধিক তৎপর।

আমেরিকা এবং বিশ্বের অন্যান্য প্রভাবশালী ইহুদি মালিকানাধীন অস্ত্র ব্যবসায়ী, আন্তর্জাতিক দরপত্র ব্যবসায়ী, তৈল সম্পদ আহরণকারী প্রতিষ্ঠান, ঔষধ কোম্পানি, সফট ড্রিঙ্ক সরবরাহকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, মিলিটারি ট্রেনিং দানকারী প্রতিষ্ঠান, বিমানের খুচরো যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ভারী শিল্পসামগ্রী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে আমেরিকা ও ইসরাইলকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে।

আমেরিকার বিভিন্ন আইনি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পেশাজীবি এটর্নিরা, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকসহ প্রশাসনে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কমকর্তারা কিংবা নামকরা হাসপাতালের ডাক্তারদের বেশিরভাগই ইহুদি। আমেরিকার ল্যান্ডফোন এবং সেল ফোন কোম্পানিগুলোর সম্পূর্ণ বিলিং সিষ্টেম, পেন্টাগন এবং হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তার দায়িত্বে ইহুদি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে।

ইহুদি রাজনীতিবিদরা আমেরিকার রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেট উভয় পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে আসীন রয়েছে। তাদের রয়েছে শক্তিশালী ইহুদি লবি। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী যে পার্টিরই হোক না কেন ইহুদি সম্প্রদায় কিংবা ইসরাইলের স্বার্থ রক্ষায় যে প্রার্থী অধিক নমনীয় তারই প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

২০০৮ সালে আমেরিকার সাধারণ নির্বাচনে মোট ৩৬ জন ইহুদি প্রভাবশালী ব্যাক্তিবর্গ প্রেসিডেন্ট ওবামাকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিল। আমেরিকার দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন এ দুটো দলের শক্তিশালী ইহুদি রাজনীতিবিদরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাদের স্বার্থের অনুকূলে তথা ইসরাইলি স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে একাট্টা হয়ে যায় এবং নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর যাবতীয় খরচ বহন করে থাকে।

তাই ইসরাইল রাষ্ট্র আমেরিকার অর্থে পুষ্ট এবং ইসরাইল কর্তৃক আরব এবং মুসলিম বিশ্বে যেকোনো অন্যায়কে আমেরিকা সমর্থন দেয় এবং ইসরাইলি স্বার্থে জাতিসংঘে প্রয়োজনে ভেটো প্রয়োগ করে। ইসরাইলের পার্শবর্তী মুসলিম দেশগুলোতে তথা মুসলিম বিশ্বে অশান্তি লেগেই আছে। ইরাক, লিবিয়া, মিসর, ইরান, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন ইসলামি দেশসমূহ ইসরাইল এবং আমেরিকার আগ্রাসনে নতজানু। এমনকি পৃথিবীজুড়ে যত

মুসলিম দেশ রয়েছে প্রত্যেক দেশই কোনো না কোনভাবে ইসরাইল এবং আমেরিকার প্রভাবে অন্তর্দ্বন্ধে লিপ্ত রয়েছে। ইসরাইলের মোসাদ গুপ্তচর সংস্থা মুসলিম দেশগুলোর নের্তৃবৃন্দকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে, গোপনে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে কিংবা তাদের আজ্ঞাবহ এক পুতুল সরকার সে দেশকে উপহার দিচ্ছে।

এ সমস্ত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গুপ্তহত্যার বিচার কোনোদিন হয়নি, হওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ইসরাইল ফিলিস্তিনি জনগণকে দেশান্তর করে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। তাদের সামাজিক জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে অথচ বিশ্ববিবেক নীরব ভূমিকা পালন করছে। সাম্প্রতিককালে ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লেবানন, কাশ্মীর এবং পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নি মুসলিমদের হিংসাত্বক কার্যকলাপে নিহত হাজার হাজার মুসলিম নরনারী ও শিশুরা ইহুদি আগ্রাসনের নিরব শিকার। ইতিহাসের পাতায় দৈনন্দিন লিখা হচ্ছে পৃথিবীজুড়ে মুসলিম জনগণের করুণ আর্তনাদের কাহিনি। জাতিসংঘ ইহুদি প্রভাবে এবং ইহুদি স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে।

ইহুদি নিয়ন্ত্রাণাধীন জাতিসংঘ!

(যেভাবে ইহুদিরা তাদের জাতীয় স্বার্থে জাতিসংঘকে ব্যবহার করে আসছে)

জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব ইহুদি বুট্রোস বুট্রোস গালি বসনিয়ায় সার্ভ কর্তৃক মুসলিম নিধনকে প্রকারান্তরে অনুমোদন দিয়েছিলেন। গালির নেপথ্য অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সার্ভরা বসনিয়ার নিরীহ মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর যে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল তা ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে 'হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ' এর দফতর রয়েছে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যে মানবতার ধ্বংসযজ্ঞ চলছে কিংবা ইসরাইলি এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের আগ্রসনে মানবাধিকার যেভাবে লঙ্গিত হচ্ছে এ ব্যাপারে 'হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ'-কে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না। বাংলাদেশের মতো অনেক ছোট্ট মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে যখন একজন সিরিয়াল কিলার অন্যায়ভাবে সন্ত্রাস চালায় কিংবা একের পর এক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সাথে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় কিংবা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে তখন এ 'হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ' সংস্থাটি ঐ অপরাধীর পক্ষ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করে।

প্রায়ই এ সমস্ত খবর ইহুদি পরিচালিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোতে এবং উক্ত সংস্থাটির বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ পায় ফলে সে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। জাতিসংঘ সত্যিকার অর্থে আজ ইহুদি নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল বুট্রোস বুট্রোস গালি, কফি আনান ইহুদি লবি সমর্থিত প্রার্থী ছিলেন।

কফি আনান নেনী আনানকে বিয়ে করেন। নেনী আনান জাতিসংঘের শিক্ষা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবি এবং একজন চিত্রশিল্পী হিসেবে ও তার খ্যাতি আছে। সুইডেনের বিখ্যাত ইহুদি শিল্পপতি পরিবারে জন্ম নেওয়া নেনী ইহুদি স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ। কফি আনান এবং নেনী আনানের পিতামাতা ইহুদি সম্প্রদায়ভূক্ত।

বুট্রোস বুট্রোস গালি মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্ম নেওয়া ইহুদি শিল্পপতির কন্যা লিয়া নাডলারকে বিয়ে করেন। লিয়ার অন্য দুই বোনের বিয়ে হয় ইসরাইলের প্রাক্তন দুজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবা ইভান ও ডেভিড

লেভীর সাথে। বসনিয়ায় মুসলিম নিধনে সার্ভদের হত্যাযজ্ঞের নিরব সমর্থক ছিলেন কফি আনান এবং হেনরী কিসিঞ্জার।

ইরাকে জাতিসংঘের প্রধান অস্ত্র পরিদর্শক স্কট রিটার এবং রিচার্ড বার্টলার ইসরাইল সমর্থিত ছিলেন যারা ইরাকে অস্ত্র পরিদর্শনে গিয়ে জাতিসংঘের কাছে মিথ্যে রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন যাতে এই সূত্র ধরে ইরাক আক্রমণ সহজতর হয়। ১৯৯৮ ইং-র ২৬শে আগস্ট স্কট রিটার আমেরিকার এফবিআই-এর কাছে ধরা পড়েন এই অভিযোগে যে, তিনি ইসরাইলের কাছে আমেরিকার অনেক গোপনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন।

১৯৪৮ সালে নরওয়ের অধিবাসী জাতিসংঘের মহাসচিব ট্রিগভে হাভডেন লি (Trygve Lie) এবং তাঁর মিলিটারি ইনটেলিজেন্স অফিসার আলফ্রেড রশচার (Alfred Roscher) ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ফিলিস্তিনি স্থানীয় জনগণের বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচারণা চালিয়ে ইহুদিদের পক্ষে বিশ্ব জনমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন[৩]।

১৯৯৮ সালের ১৪ই মে আমেরিকার ইহুদি লবি জাতিসংঘের প্রধান অস্ত্র পরিদর্শক সুইডিস নাগরিক 'রলফ্ ইকিয়াস' ও তার টিমকে সম্মানিত করে এই মর্মে যে, রলফ্-এর রিপোর্ট অনুয়ায়ী ১৯৯১-৯৭ সাল পর্যন্ত ইরাকের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ অবরোধ অরোপ করাতে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৯৯ সালের ৬ই জানুয়ারী এসোসিয়েটেড প্রেস এ প্রকাশিত এক খবরে এবং বিবিসির রিপোর্ট থেকে জানা যায় আমেরিকা ও ইসরাইল অস্ত্র পরিদর্শকের নামে ইরাকে স্পাই পাঠিয়েছিল যাতে ইরাকের অস্ত্রসম্ভার সম্মন্ধে বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয়।

১৯৯৬ সালে ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত গাজা ভূ-খণ্ডে ইসরাইল নারী-পুরুষ শিশুসহ প্রায় তিনহাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। বিশ্векবিবেক এ হত্যাযজ্ঞের নিন্দা জানালে জাতিসংঘ ইহুদি সমর্থিত পরিদর্শক টিমের প্রধান পরিদর্শক রিচার্ড গোল্ডস্টোনকে অনুসন্ধানে পাঠায় এবং তার প্রদত্ত রিপোর্ট ইসরাইলের পক্ষে যায়।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রধান জ্যান এলিয়াসন (Jan Eliasson) একজন ইহুদি এবং জায়োনিষ্ট বোর্ড অব ট্রাষ্টির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

জেরুজালেম পোস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্ট হতে জানা যায়- আফ্রিকার ডারবানে ইহুদি এনজিও সংস্থার এক পার্টিতে জাতিসংঘের হাইকমিশনার 'মেরী রবিনসন' গর্ব করে বলেছিলেন, "আমি ইহুদি এবং ইহুদি হিসেবে গর্ব অনুভব করি"।

জাতিসংঘের প্রথম নামকরণ হয়েছিল 'লীগ অব ন্যাশনস্'। যেটা ইহুদি পরিকল্পনায় গঠিত হয়েছিল। এমনটাই দাবি করেছেন ইহুদি কলামিস্ট 'নাহোম সকোলো'[৪]।

ইসরাইল সরকার বর্তমানে প্রকাশ্যে বিশ্বকে জানাচ্ছে যে, ইরান আণবিক শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে - সুতরাং নীরব দর্শক হয়ে আমরা বসে থাকতে পারি না। ইসরাইল ইরাকের বিরুদ্ধেও একসময় এ ধরণের প্রচারাভিযান চালিয়েছিল যা পরবর্তী পর্যায়ে মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছিল। ইরানকে দুর্বল, অবরুদ্ধ এবং একঘরে করার লক্ষে ইসরাইল এ ধরনের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরাইলি মিডিয়া এবং ট্রাম্পের জামাতা কোচনারের প্রচারণায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবরোধ অরোপ করেছেন অথচ ইসরাইলের অস্ত্রভাণ্ডারে ৮০-১৫০টির মত পারমাণবিক বোমা এবং প্রচুর পরিমাণ কেমিক্যাল অস্ত্রসম্ভার রয়েছে তা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ এবং জাতিসংঘ জানলেও এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস কারোর নেই।

---

৪. দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্ আগস্ট ২৮, ১৯২২ ইং

জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের ভূমিকা

জাতিসংঘের সাবেক প্রধান অস্ত্র পরিদর্শক হ্যানস্ বিক্লস একজন সুইডিস ইহুদি[৫]। সিরিয়া সরকার বিদ্রোহীদের উপর কেমিক্যাল অস্ত্র প্রয়োগের সূত্র ধরে জাতিসংঘ আমেরিকা ও ইসরাইলি সরকারের প্রভাবে হ্যানস্ বিক্লস-কে সিরিয়ায় পাঠায় এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য। হ্যানস্ বিক্লস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সিরিয়ায় প্রায় ৪২টি কেমিক্যাল অস্ত্রের গুদাম রয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে যদিও রাশিয়া এর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে। রাশিয়ার দাবি বিদ্রোহীদেরকে ইসরাইল ও আমেরিকা কেমিক্যাল অস্ত্র সরবরাহ করেছে এবং বিদ্রোহীদের দ্বারা এ অস্ত্র প্রয়োগে প্রচুর প্রাণহানি ঘটেছে। সিরিয়া আক্রমণ করে চিরতরে সিরিয়ার সামরিক শক্তি বিনাশ করাই ছিল ইসরাইলের উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য সাধনে তারা যথেষ্ট সফল হয়।

ইরাকের তৎকালীন প্রধান অস্ত্র পরিদর্শক ছিলেন সুইডিস ইহুদি সম্প্রদায়ভূক্ত রলফ্ ইকিয়াস। ইরাকে কেমিক্যাল এবং পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার রয়েছে বলে রলফ্ জাতিসংঘে রিপোর্ট প্রদান করেন কিন্তু পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, ইরাকে কোন পরমাণু অস্ত্র ছিলনা এবং অতি সামান্যই কেমিক্যাল গ্যাস ছিল। ইসরাইলি স্বার্থে আমেরিকার পক্ষে ইরাক আক্রমণ যাতে সহজতর হয় সে কারণে তিনি জাতিসংঘে অতিরঞ্জিত এ রিপোর্ট প্রদান করেন।

ইহুদি সম্প্রদায়ভূক্ত হ্যানস্ বিক্লস সুইডেনের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এবং ইহুদি সম্প্রদায়ভূক্ত সুইডেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলা উলস্টন এর ঘনিষ্ট সহযোদ্ধা হিসেবে ইহুদি স্বার্থে কাজ করেছেন।

---

৫. সুইডিস ইহুদি পত্রিকা 'জুডিকস্ ক্রনিকা' নং-৪ ১৯৮৫ সালে সুইডেনের বিখ্যাত ইহুদি সম্প্রদায়ভূক্ত লোকদের একটি তালিকা প্রকাশ করে। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি এবং ইহুদি নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমের তালিকা এতে সন্নিবেশিত হয়। খ্যাতিমান ইহুদি ব্যক্তিবর্গের তালিকায় হ্যানস্ বিক্লস এবং রলফ্ ইকিয়াস সম্মন্ধে বিস্তারিত জানা যায়।

আমেরিকা, রাশিয়া ও ব্রিটেনসহ বিশ্বের শতকরা ৯৬% প্রচার মাধ্যম ইহুদি নিয়ন্ত্রণাধীন

(ইহুদি নিয়ন্ত্রিত আমেরিকান মিডিয়াসমূহ[৬])

বিশ্বের নামকরা প্রচারমাধ্যমগুলোর ৯৬% ইহুদি মালিকানাধীন, যে কারণে ইহুদি পরাশক্তি বিশ্বব্যাপী তাদের স্বার্থের অনুকূলে প্রচারিভযান চালিয়ে যাচ্ছে। সুপরিচিত প্রচারমাধ্যমগুলো জাল বিস্তার করে আছে বিশ্বজুড়ে এবং এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে নের্তৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। আমেরিকার ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং সিইও মিখাইল এইসনার একজন ইহুদি। এ কোম্পানির অধীনে রয়েছে ওয়াল্ট ডিজনি টিভি, টাচস্টেন টিভি, বোনা ভিসতা টিভি, ডিজনির নিজস্ব কেবল টিভি নেটওয়ার্ক, দুটি ফিচার ফিল্ম ভিডিও প্রোডাকশন কোম্পানি যার প্রোডাক্ট টাচষ্টেন পিকচার্স, হলিউড পিকচার্স ও ক্যারাবান পিকচার্স নামে পরিচিত। তাছাড়াও ডিজনি-র অধীনে রয়েছে মিরামেক্স ফিল্ম কোম্পানি। ইহুদি সিইও 'জো রথ' পরিচালিত এ সমস্ত ফিল্ম কোম্পানিগুলোর অধীনে শুধু আমেরিকাতেই রয়েছে ২২৫টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং সমগ্র ইউরোপ জুড়ে রয়েছে এর অসংখ্য শাখা প্রশাখা। 'নিউজউইক' সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন (ওয়াশিংটন পোস্টের সিস্টার পাবলিকেশন) ইহুদি মালিকানাধীন ম্যাগাজিন যা প্রতি সপ্তাহে ৩৫ লক্ষ কপি ছাপা হয় এবং বিশ্বজুড়ে এর অগণিত গ্রাহক রয়েছে। এর পরিচালক মিসেস ক্যাথেরিন মেয়ের গ্রাহাম একজন ইহুদি।

সাপ্তাহিক ইহুদি মালিকানাধীন ম্যাগাজিন 'ইউ এস নিউজ' এবং 'ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট' যেগুলোর প্রকাশ সংখ্যা সাপ্তাহিক ২৫ লক্ষ কপি - এ দুটো ম্যাগাজিনের মালিক 'মর্টিমার জাকারম্যান'। জাকারম্যান প্রকাশনার 'দি ডেইলি নিউজ', 'নিউইয়র্ক ট্যাবলয়েড' এবং 'মাসিক আটলান্টিক' পত্রিকাগুলো প্রকাশনার ষষ্টম স্থান দখল করে আছে।

---

৬. সূত্র ঃ Jewish Chronicle, 11-01-2002/Jewish Media

ইহুদি সিইও 'স্টিভেন বর্নস্টেইন' পরিচালিত এবিসি কেবল সাবসিডিয়ারী (ABC Cable Subssediary), ইএসপিএন (ESPN) এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এবিসি রেডিও নেটওয়ার্ক, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন এবং লস এঞ্জেলস ছাড়াও সমগ্র আমেরিকা জুড়ে এর নিয়ন্ত্রণে ৩,৪০০ টি ট্রান্সমিশন প্ল্যান্ট রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে আরও রয়েছে অসংখ্য দৈনিক পত্রিকা এবং পাবিলিশিং কোম্পানিগুলোর অধীনে রয়েছে ফেয়ারচাইল্ড পাবলিকেশনস্, চিলটন পাবলিকেশনস্, ডাইভারসিফাইড পাবলিকেশনস্ গ্রুপ ইত্যাদি। দ্য ওয়াশিংটন পোষ্ট, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, দ্য নিউইয়র্ক টামইস্- আমেরিকা এবং বিশ্বজুড়ে পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এর সবকটির মালিকই ইহুদি। আমেরিকায় প্রকাশিত প্রায় ৮০-৪০০টি সাময়িকী এবং দৈনিক সংবাদপত্র কোনো না কোনো পাবলিশিং কোম্পানির সাথে জড়িত যেগুলো ইহুদি মালিকানাধীন।

'টাইম ওয়ার্নার ইনকর্পোরেশন' এর সামগ্রিক কার্যক্রম ইহুদি সিইও ও চেয়ারম্যান 'গেরার্ল্ড লেভিন' কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে 'পে-টিভি' এবং 'কেবল নেটওয়ার্ক' তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ডেনি গোল্ডবার্গ (ইহুদি) পরিচালিত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট মিউজিক কোম্পানি হিসেবে খ্যাত 'ওয়ার্নার মিউজিক কোম্পানি' সমগ্র বিশ্বের গানপ্রিয় মানুষের চাহিদা পূরণ করে আসছে।

স্টুয়ার্ট হার্টস্ (ইহুদি) পরিচালিত 'ওয়ার্মার ভিশন' এবং 'ওয়ার্মার মিউজিক ভিডিও প্রোডাকশন' সাংস্কৃতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। টাইম ওয়ার্নার পাবলিশিং ডিভিশনের সিইও এবং এডিটর-ইন-চীফ 'নরমান পার্লস্টাইন' (ইহুদি)-এর তত্ত্বধানে টাইম, স্পোর্টস্ ইলাস্ট্রেইড, পিপল এবং ফরচুন ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। বহুল প্রচারিত এ ম্যাগাজিনগুলো প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ইহুদি জনগোষ্ঠির কল্যাণ এবং সার্বিকভাবে ইসরাইলি সরকারের স্বার্থ যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণ করে আসছে। মুসলিম দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ তুচ্ছ সমস্যা নিয়ে অনর্থক নাক গলানো কিংবা মুসলিম বিশ্বের ছোটখাট এবং তুচ্ছ ঘটনাপ্রবাহগুলোকে বড় করে দেখিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে মুসলিম সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে এ সমস্ত ম্যাগাজিন মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তারে নানা কৌশল অবলম্বন করে আসছে অথচ মুসলিম দেশসমূহের রাজনীতিবিদরা উপরোক্ত পত্রপত্রিকায় এবং ম্যাগাজিনে ছাপাকৃত ঘটনাসমূহকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে এবং প্রাধান্য দিয়ে ভুল পথে নিজেদের দেশকে পরিচালিত করে।

কেবল টিভি নিউজ নেটওয়ার্ক এবং টিভি চ্যানেল CNN, CBS, MTV, NICKELODEON, VIACOM, FOX TV, SONY CORPORATION OF AMERICA, NBC, SEAGRAM ইত্যাদি ফিল্ম কোম্পানি ও টিভি চ্যানেল সম্পূর্ণ ইহুদি নিয়ন্ত্রণাধীন। ফিলিস্তিন, ইরান, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, বসনিয়া এবং আফগানিস্তানের যুদ্ধে সিএনএন-এর মুসলিমবিরোধী বিভ্রান্ত সংবাদ পরিবেশন এবং ইসরাইল, ব্রিটেন ও আমেরিকান এ্যাকশনের পক্ষে শ্লোগান বিশ্ব বিবেককে প্রতারিত করে। সাদ্দাম, গাদ্দাফি, ওসামা বিনলাদেন এবং অন্যান্য আল-কায়েদা ও ফিলিস্তিনি নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিশ্বের কাছে সিএনএন উদ্দেশ্যমূলকভাবে অতিরঞ্জিত ও বিভ্রান্তিমূলক খবর পরিবেশন করে জাতিসংঘ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশসমূহকে প্রভাবিত করছে। ইরাক যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সিএনএন একজন অজ্ঞাত লোককে আরবী পোষাকে সজ্জিত করে টিভি পর্দায় জুতা ছোঁড়ার দৃশ্য দেখিয়ে পরোক্ষভাবে মুসলিমজাহানকে অপমানিত করার দৃশ্য চোখে পড়ার মত। এ দৃশ্য দেখার পর মুসলিম বিশ্বে কোনো প্রতিবাদের ঝাড় উঠেনি।

আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রমণের মূল নায়ক বলে সিএনএন প্রচার করেছে অথচ আমেরিকান সিআইএ-র অনেক উর্ধ্বতম কর্মকর্তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন ওসামা বিন লাদেনের পক্ষে এ ধরনের অক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব নয় বরং ইসরাইলি স্পাই প্রতিষ্ঠান মোসাদের পক্ষেই এ ধরনের আক্রমণ সম্ভব। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আক্রমণ সম্মন্ধে আমেরিকা ও বহির্বিশ্বে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে।

আক্রমণের দিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্রায় চারহাজার ইহুদি কর্মজীবির কর্মবিরতি, পাঁচজন ইহুদি কর্তৃক ধারণকৃত ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের ভিডিও ফুটেজ এবং আনন্দ উল্লাস প্রকাশ বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দেয়। যেন এ সমস্ত ভিডিও ফুটেজ তোলার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল। প্রায় ৩৪% আমেরিকানরা বিশ্বাস করে এ আক্রমণের পেছনে ইসরাইলি মোসাদ জড়িত অথচ ইহুদি পরিবেষ্টিত বুশ প্রশাসন ও আমেরিকান মিডিয়া সংস্থাগুলো ওসামা বিন লাদেনকে অভিযুক্ত করে আফগানিস্তানের আল-কায়েদা ঘাঁটিগুলোতে নজিরবিহীন আক্রমণ চালায়। ইহুদি প্রচারমাধ্যম যারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তাদের প্রধান ইহুদি কর্মকর্তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল :

বারবারা ওয়ালটার্স (Barbara Walters) : এবিসি নিউজ।

ইউজেনে মাইয়ার (Eugene Meyer) : ওয়াশিংটন পোস্ট।

হেনরী গ্রুনওয়াল্ড (Henry Grunwald): এডিটর ইন-চীফ, টাইম ম্যাগাজিন।
ক্যাথারিন গ্রাহাম (Katherine Graham): পাবলিশার্স্, ওয়াশিংটন পোস্ট।
জোসেফ লেলিএল্ড (Joseph Lelyyeld): এক্সিকিউটিভ এডিটর, দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্।
ম্যাক্স ফ্রাঙ্কেল (Max Frankel) : এডিটর, দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্।

ইহুদি প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা

ইহুদি বিজ্ঞানীরা যে সমস্ত প্রযুক্তি আবিষ্কার করে বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন যাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

গুগল

সার্গে মিখাইলোভিচ ব্রিন (Sergey Mikhaylovich Brin) এবং ল্যারি পেজ (Larry Page) এর আবিষ্কারক। ইন্টারনেট জগতে গুগল আজ সর্বাধিক জনপ্রিয়। এলিয়ট স্কার্গ (Elliot Schrage), ইথান বিয়ার্ড (Ethan Beard) উদি মেনবার (Udi Manber) নামক অন্যান্য ইহুদি বিজ্ঞানীরা গুগল-এর উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

ফেসবুক

মাত্র ২৫ বছর বয়সী মার্ক জুকারবার্গ (Mark Zuckerberg) সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক আবিষ্কার করে বিশ্বের যুবসমাজকে নূতন এক সেতুবন্ধনে বাঁধতে পেরেছেন। বিশ্বের প্রতিটি সম্প্রদায়ভূক্ত লোকেরা অভূতপূর্ব এ সামাজিক মাধ্যমকে অতি আগ্রহের সাথে বরণ করে নিয়েছে। মার্ক জুকারবার্গ ফেসবুক আবিষ্কার করে বিলিয়নার হিসেবে নাম লিখিয়েছেন এবং তিনি বিশ্বের কনিষ্ঠতম একজন প্রতিভাবান আবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী টাইকন। গুগল আবিষ্কারক সার্জি এবং ল্যারি পেজ-এর সাথেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

ইয়াহু

সুসান ডেকার (Susan Decker) এর ইয়াহু ইন্টারনেট জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ই-মেইলের জগতে এ আবিষ্কার এক নূতন দিগন্তের সূচনা করে।

উইকিপিডিয়া

জিমি ওয়েলস ও তার সহযোগীরা উইকিপিডিয়া তৈরি করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞানেন্বেষনের পথ সুগম করে দেন। ইতিহাস এবং চলমান ঘটনাপ্রবাহ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়ে উইকিপিডিয়া এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। উইকিপিডিয়ার অন্যান্য শাখা Wikibooks, Wikiquote, Wikiversity, Wikivoyage, Wikisource, Wikidata, MediaWik, Meta-Wiki, Wikinews, Wikispecies, Wikitionary ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পার্সোনাল কম্পিউটার

মাইকেল ডেলের (Michel Del) মালিকানাধীন আমেরিকার পিসি ম্যানুফেক্টরিং এন্টারপ্রাইজ আজ বিশ্বে সুপরিচিত। পার্সোনাল কম্পিউটার-এর ব্যবসা করে আজ তিনি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক।

ওরাকল সফটওয়্যার

ল্যারি এলিসন (Larry Ellison) ১৯৭৭ সালে ওরাকল সফটওয়্যার আবিষ্কার করে। ওরাকল সবচেয়ে জনপ্রিয় ডাটাবেজ সফটওয়্যার। সমগ্র বিশ্বে ওরাকল সফটওয়্যার সার্ভার জগতে এক অনন্য ভূমিকা রাখছে।

মাইক্রোসফট্

স্টিভ বলমার (Steve Ballmer) মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিলিয়নার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইনটেল পেনটিয়াম

অ্যান্ড্রু গ্রুভ (Andrew Grove) কম্পিউটারের এ গুরুত্বপূর্ণ অংশটি সংযোজন করে কম্পিউটারকে এক নূতন মাত্রা এনে দেন।

কম্পিউটার নেটওয়াকিং

লিওনার্দ ক্লেইনরক (Dr. Leonard Kleinrock) এ নেটওয়ার্ক আবিষ্কার করে কম্পিউটার জগতকে বিস্তৃত করেন।

TCP/IP protocol

ড. বব কোহেন (Dr. Bob Kahn) এ সফটওয়্যার আবিষ্কার করে ই. মেইলকে এক নতুন রূপ দেন।

বেসিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ

জন জর্জ কেমেনি (Dr. John George Kemeny) এ সফ্টওয়্যার আবিষ্কার করে কম্পিউটার জগতকে এক নতুন মাত্রা এনে দেন।

কম্পিউটারে ব্যবহৃত সংকেতলিপি

উইলিয়াম এফ. ফ্রেইডম্যান (Dr. William F. Friedman) এর সংকেতলিপির ব্যবহার কম্পিউটারকে গতিশীল করেছে।

ইন্টারনেটে ব্যবহৃত ডিএনএ এবং সিকিউিরিটি সিস্টেম

লিওনার্ড এডলম্যান (Dr. Leonard Adleman) আবিষ্কৃত এ সফটওয়্যার কম্পিউটারকে নিরাপদ রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মাইক্রো প্রসেসিং চিপস্

স্ট্যানলি মাজোর (Stanley Mezor) আবিষ্কৃত মাইক্রো প্রসেসিং চিপস্ কম্পিউটার হার্ডওয়ারের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় এক উপাদান।

কোয়ান্টাম মেকানিজম, লাইনার প্রোগ্রামিং, সেট থিওরী ইত্যাদি

জন ভন নিউম্যান (Dr. John von Neumann) আবিষ্কিৃত একটি প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার যা প্রোগ্রামিং তৈরি করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

কম্পিউটার সিকিউরিটি সিষ্টেম এবং প্রোগ্রাম চেকিং

ম্যানুয়েল ব্লুম (Dr. Manuel Blum) কর্তৃক আবিষ্কৃত অত্যাবশ্যকীয় এক সফটওয়্যার।

অপটিক্যাল ফাইবার কেবল

পিটার স্যুলটজ্ (Peter Schultz) আবিস্কৃত আন্তমহাদেশীয় সংযোগ এ কেবল-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

মাই স্পেস

টম এন্ডাসন (Tom Anderson) - এর মাই স্পেস কম্পিউটার জগতে এক নতুন সংযোজন।

লোটাস ১, ২, ৩ : মিচ কাপোর (Mitch Kapor) আবিস্কৃত অফিসিয়াল কাজে এ প্রোগ্রাম দক্ষতা বৃদ্ধি করেছে।

পেপাল এবং ই-বে (PayPal & eBay): (Dustin Moskovitz, Max Rafael Levchin, Jeff Skoll এবং Peter Thiel) বিল পরিশোধে, কেনাকাটায় এর গুরুত্ব অপরিসীম।

রিয়েল নেটওয়ার্ক (Real Networks) Audio, video, music and games to computers : Ron Glaser

ব্রডকাষ্ট.কম এবং এইচডি নেট (Broadcast.com & HDNet): Radio and television broadcasting over the Internet : (Mark Cuban)

Qualcomm/3G (Wireless telecommunication technology: (Irwin Jacobs) ৬৫ বছর বয়স্ক ইসরাইলী বৈজ্ঞানিক (Yossi Vardi) ইসরাইলের টেকনিক্যাল গুরু হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছেন।

যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ই-মেইল আজ সর্বাধিক জনপ্রিয়। প্রিয়জনের খবরাখবর, দেশ-বিদেশের খবর, ব্যবসায়ের যোগাযোগের এককালের একমাত্র মাধ্যম চিঠিপত্র আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। পরিবর্তে স্থান করে নিয়েছে ইন্টারনেট, ই-মেইল, মেসেন্জার এবং অন্যান্য গণমাধ্যম। যারা এর পুরোধা তাদের অধিকাংশই ইহুদি বৈজ্ঞানিক। মানবসভ্যতাকে তারা যেমন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তেমনি তারা ফুলে ফেঁপে উঠছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে।

পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ০.৫% ইহুদিরা আজ স্বপ্ন দেখছে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উপর কর্তৃত্ব ফলাতে এবং পৃথিবী শাসন করতে। এ স্বপ্ন তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে মানবসভ্যতার শীর্ষ স্তরে। তারা জীবনকে দেখছে অন্যভাবে। শিক্ষা, অধ্যাবসায় এবং বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে তারা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সম্পদ আজ তাদের হাতের মুঠোয়। হাতিয়ে নিচ্ছে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের মাধ্যমে। নিত্যনতুন আবিষ্কারে কোনো না কোনোভাবে ইহুদি বৈজ্ঞানিকদের হাত রয়েছে।

জনসংখ্যার দিক থেকে তারা নগন্য হলেও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তারা বিশ্বের শতকরা ৩০% ভাগ দখল করে আছে। একথা অনস্বীকার্য যে, যদিও ইহুদিরা বিশ্বের অন্যান্য সম্প্রদায়ভূক্ত লোকদের কাছে চরমভাবে ঘৃণিত তাদের হিংসা, লোভ, স্বার্থ এবং ষড়যন্ত্রের কারণে তবুও তাদের নিত্যনতুন আবিষ্কারকে ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে বিশ্ববাসী।

ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত বিভিন্ন সফটওয়্যার বর্তমান বিশ্বকে যেমন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তেমনি কম্পিউটার ভাইরাস আজ এক ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকার পেন্টাগন স্বীকার করেছে যে, সাইবার আক্রমণ করে শত্রুরা বিভিন্ন সময় অচল করে দিচ্ছে কম্পিউটার-এ সংরক্ষিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রবাহকে।

আমেরিকার বিভিন্ন প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সংস্থার প্রধান হিসেবে ৪১% ম্যানেজার, এক্সিকিউটিভ হিসেবে ১৩% এবং ব্যবসাক্ষেত্রে ৭% ভাগ ইহুদিরা দখল করে আছে। অন্যদিকে আমেরিকার খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের বিশাল জনগোষ্টির মধ্যে প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ৪৬%, প্রফেশনাল এবং টেকনিক্যাল পদে ২৯%, ম্যানেজার এবং এক্সিকিউটিভ হিসেবে ১২% এবং ব্যবসাক্ষেত্রে ৫% আমেরিকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পার্সোনাল কম্পিউটার আবিষ্কারের নেপথ্যে

সমগ্র বিশ্ব আজ তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর। ইটালিয়ান বিজ্ঞানী Pier Giorgio Perotto ১৯৬৪ সালে প্রোগ্রামা-১০১ নাম দিয়ে প্রথম ডেক্সটপ কম্পিউটার আবিষ্কার করেন। ১৯৬৫ সালে বাণিজ্যিকভাবে এর বিক্রি শুরু হয়। ১৯৬৫-৬৯ মীর স্পেস-এ কর্মরত সোভিয়েত বিজ্ঞানী Victor Glushkov ডেক্সটপ কম্পিউটারকে ছোট আকারে পূনর্বিন্যাস করতে

সক্ষম হন। ক্রমেই পার্সোনাল কম্পিউটারের উন্নত সংস্করণ উদ্ভাবনে সমগ্র উন্নত বিশ্ব উঠেপড়ে লেগে যায়। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বশতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে ক্রমেই এর বিস্তারলাভ ঘটায়। ১৯৭৩ সালে বিশ্বখ্যাত আইবিএম, আপেল, ডেল, এইচপি, কমোডোর পেট ইত্যাদি কোম্পানী বিশ্বজুড়ে কম্পিউটার বিক্রি করে রাতারাতি ধনী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। ক্রমেই ডেক্সটপ, টেবলেট কম্পিউটার, আলট্রা মোবাইল পিসি, পকেট পিসি ইত্যাদি নামে ছোট আকারের কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়।

কম্পিউটারে ব্যবহৃত মনিটর, মাদারবোর্ড, চিপস্, মাউস, রেম, স্লট, সকেট, ফ্লপি ডিক্স, সিডি, ডিক্স ড্রাইভ, সিডি রুম, মেমোরী কার্ড ইত্যাদি সফটওয়্যার পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহারকারীদেরকে ধাপে ধাপে নিত্যনূতন সুযোগ সৃষ্টি করে। কম্পিউটার সমগ্র বিশ্বকে একে অপরের নাগালের মধ্যে নিয়ে এসেছে। ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পায়ন, আফিসিয়াল কর্মকান্ডে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, চিকিৎসাকেন্দ্রসহ এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহার হয়না।

ইহুদি বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, অর্থনীতিবিদ এবং সমাজসেবীরা

অ্যান্ড্রু স্চ্যাল্লি (Andrew Schally): নোবেল বিজয়ী এ বিজ্ঞানী বহুমূত্র ও গলগ্রন্থি রোগ নিরাময়ের চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

আরোন টি. বেক (Aaron Beck): মানসিক ভারসাম্যহীনতা, আতঙ্ক, বিষণ্নতা ইত্যাদির নিরাময়পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তাঁকে কগনিটিভ থেরাপীর জনক বলা হয়।

গ্রেগরি গুডউইন পিন্‌কাস (Gregory Pincus): জন্ম নিয়ন্ত্রন পিল-এর আবিষ্কারক।

জর্জ ওয়াল্ড (George Wald): নোবেল বিজয়ী এ বিজ্ঞানী মানবচক্ষুর উপর গবেষণা করে চক্ষু রোগের উপর অনেক অজানা তথ্য উদঘাটন করেন।

স্টানলী কোহেন (Stanley Cohen): নোবেল বিজয়ী এ বিজ্ঞানী ভ্রূণতথ্যের অনেক অজানা রহস্য উদ্ঘাটন করেন।

উইলিয়াম জন কফ (Willem Kolff): এ বিজ্ঞানী কিডনির ডায়ালাইসিস পদ্ধতি আবিষ্কার করে খ্যাতি অর্জন করেন।

লিও সজিলার্ড (Leo Szilard): এ বিজ্ঞানী প্রথম নিউক্লিয়ার চেইন রিয়েক্টর আবিষ্কার করেন।

চার্লস অ্যাডলার (Charles Adler): ট্রাফিক লাইটের আবিষ্কারক।

বেনু স্টুরাস (Benno Strauss): স্টেইনলেস ষ্টিলের আবিষ্কারক।

ইসাডর কিসে (Isador Kisee): সাউন্ড মুভীর আবিষ্কারক।

এমিলি বার্লিনর (Emile Berliner): টেলিফোন মাইক্রোফোনের আবিষ্কারক।

চার্লস গিনসবুরগ (Charles Ginsburg): ভিডিও টেপ-এর আবিষ্কারক।

পৃথিবী খ্যাত পোশাক ডিজাইনার : রালফ লউরেন (Polo Shirts), লিভি স্ট্রস (Levi's Jeans), হাওয়ার্ড শুল্ট্স (Starbuck's), ইরভ রবিন্স (Baskins & Robbins) উল্লেখযোগ্য।

উইলিয়াম জেমস্ সিদিস : একজন ইহুদি বিদ্যুষী। যার আই কিউ - ২৫০-৩০০ এবং এত বেশি আই কিউ সম্পন্ন খুব কম সংখ্যক মানবসন্তান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে থাকে। মাত্র ৬ বছর বয়সে সিডিস গ্রামার স্কুলে ভর্তি হয় এবং মাত্র ৭ মাসে কোর্স সমাপ্ত করে। ৯ বছর বয়সে হার্ভাড স্কুলে এবং ১১ বছর বয়সে হার্ভাড ভার্সিটিতে পড়াশোনা করে মাত্র ১৬ বছর বয়সে ভার্সিটির মাস্টারস্ ডিগ্রি অর্জন করে। ১৮ বছর বয়সে হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইনশাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিস্টতম অধ্যাপক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ব্যক্ত থাকে যে, বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের আই কিউ ছিল ১৮০-২২০ (বুদ্ধিমত্তার প্রখরতার পরিমাপ) অথচ সিডিসের ছিল : ২৫০-৩০০।

বিখ্যাত ইহুদি দানবীর জর্জ সরস বিজ্ঞানীদের উৎকর্ষ সাধনে পৃথিবী জুড়ে প্রায় ৫০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে চার বিলিয়ন ডলার দান করেন। অন্য একজন ইহুদি ব্যবসায়ী দানবীর ওয়াল্টার আন্নেনবার্গ ১০০টির উপরে লাইব্রেরির উন্নতিকল্পে দুই বিলিয়ন ডলার দান করেন। কথিত আছে জর্জ সরস কিংবা ওয়াল্টার সম্পদ অর্জনে বিভিন্ন মাফিয়া সংগঠনকে অর্থের যোগান দিতেন যাতে ওদের মাধ্যমে তাদের সম্পদের উৎস ক্রমেই বাড়তে থাকে।

বিভিন্ন দেশ হতে ইহুদিরা বিতাড়িত হওয়ার কারণ

২৫০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ১১৪টি স্থান হতে ইহুদিরা বিভিন্ন শাসক এবং সরকার কর্তৃক বিতাড়িত হয়। হাজার হাজার বছর তারা নির্বাসিত জীবনযাপন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি, স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ব্রিটেন, মধ্যপ্রাচ্য, ফিলিস্তিন এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ হতে সময় সময় ইহুদি জনগোষ্ঠিকে বিতাড়িত করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং রাষ্ট্রনায়করা বর্ণনা করেছেন ইহুদিরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য সবসময় ষড়যন্ত্র করে এসেছে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে বিভেদ এবং কলহ সৃষ্টি করাই এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর ইতিহাসে যত বড় বড় ষড়যন্ত্র কিংবা যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে তার পেছনে ইহদী ষড়যন্ত্রকারীদের কলকাঠি নাড়ার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

১৮৬২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর আমেরিকার তৎকালীন মিলিটারি জেনারেল ইউলিসিস এস. গ্রান্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল জন অ্যারোন রলিন্স এর কাছে একটি পত্রে লিখেছিলেন,

> "ইহুদিরা সর্বক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারী এবং আইন লংঘনকারী। তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যেকোনো কিছু করতে পারে। আমেরিকার ট্রেজারী ডিপার্টমেন্টের অনেক আইন তারা লঙ্গন করেছে। তারা সবসময়ই সুযোগসন্ধানী। সমাজের সর্বক্ষেত্রে তারা ছলে বলে অগ্রাধিকার সুনিশ্চিত করে এবং অন্যের ঘাড়ে পা দিয়ে স্বার্থ হাসিল করে। এ কারণে আমি তাদের অনেককেই ট্রেজারি এবং মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট হতে চাকুরীচ্যুত করেছি।"

১৯৫৫-১৯৯২ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে মোট ৬৫ বার ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হয়। সমগ্র বিশ্ববিবেক মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর নির্যাতিত জনগণের পাশে দাঁড়ালেও আমেরিকা এ প্রস্তাবগুলোর বিরুদ্ধে ১৯৭২-১৯৯০ সাল পর্যন্ত মোট ৩০ বার ভেটো প্রয়োগ করে[৭]। যার ফলে ইসরাইল আস্কারা পেয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে এবং ফিলিস্তিনি নিরীহ জনগণের উপর নির্যাতনের ষ্টিম রোলার চালিয়ে মানবতাবিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে নিরন্তর। পরম বন্ধু হিসেবে

---

৭. Findley's Deliberate Deceptions, 1998, pages 192-194

আমেরিকা ইসরাইলি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের পথকে সুগম করে দিচ্ছে পক্ষান্তরে প্রতিবাদী মুসলিম দেশগুলোকে নমনীয় রাখতে অর্থনৈতিক অবরোধের মত বিভিন্ন কলা কৌশল অবলম্বন করে শক্তিহীন করে দিচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে ইহুদি জনসংখ্যা

দেশ	জনসংখ্যা
ইসরাইল	৬,৬৯৭,০০০ (২০১৯)
আমেরিকা	৬,৫৪৩,৮২০ (২০১৮)
ফ্রান্স	৪৫৩,০০০-৬০০,০০০
কানাডা	৩৯০,৫০০-৫৫০,০০০
ব্রিটেন	২৯০,০০০-৩৭০,০০০
আর্জেন্টিনা	১৮০,৩০০-৩৩০,০০০
রাশিয়া	১৭২,০০০-৪৪০,০০০
জার্মানি	১১৬,০০০-২২৫,০০০
ব্রাজিল	৯৩,২০০-১৫০,০০০
সাউথ আফ্রিকা	৬৯,০০০-৮০,০০০
ইউক্রেন	৫০,০০০-১৪০,০০০
হাঙ্গেরী	৪৭,৪০০-১০০,০০০
মেক্সিকো	৪০,০০০-৫০,০০০
নেদারল্যান্ড	২৯,৮০০-৫২,০০০
বেলজিয়াম	২৯,২০০-৪০,০০০
ইতালি	২৭,৫০০-৪১,০০০
সুইজারল্যান্ড	১৮,৬০০-২৫,০০০
চিলি	১৮,৩০০-২৬,০০০
উরুগুয়ে	১৬,৭০০-২৫,০০০
বেলারশ	১৬,৫০০
তুরস্ক	১৫,০০০-২১,০০০
সুইডেন	১৫,০০-২৫,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	১,০০,০০০
লাটাভিয়া	৮,২১০(২০১৯)
চেকোশ্লোভাকিয়া	৬০১ (২০১৯)
এস্তোনিয়া	১,৯২১ (২০১৯)
ফিনল্যান্ড	১,০৯৩ (২০১৭)
নরওয়ে	৭৮৯ (২০১৮)
পোলান্ড	৩০,০০০
চিলি	২৫,৪০০
ইরান	২৫,০০০

ভেনিজুয়েলা	২০,৯০০
সুইডেন	১৮,০০০
আজারবাইজান	১৬,০০০
জর্জিয়া	১৩,০০০

বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় এককোটি ছেচল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার ইহুদি জনসংখ্যার মধ্যে সত্তর লক্ষ আমেরিকায়, পঞ্চাশ লক্ষ এশিয়া মহাদেশে, বিশ লক্ষ ইউরোপে এবং আফ্রিকার দেশগুলো জুড়ে দশ লক্ষ ইহুদি জনবসতি রয়েছে। মোট ১১১টি দেশে ইহুদিরা আছে। প্রতি একজন ইহুদির বিপরীতে একশো জন মুসলিম রয়েছে। কিন্তু শক্তির তুলনায় ইহুদি জাতি মুসলিম জাতি হতে হাজারগুণ বেশি শক্তিশালী। এ শক্তি বিজ্ঞানের, শিক্ষার, সংহতির, শৃঙ্খলার এবং সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তির। ইহুদি জাতি প্রমাণ করেছে সংখ্যা দিয়ে পৃথিবীকে আয়ত্তে আনা যায় না বরং বুদ্ধি, জ্ঞান এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে পৃথিবী শাসন করা যায়।

ইহুদি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ

আমেরিকা ও কানাডার বুকে প্রতিষ্ঠিত এশিয়া সোসাইটি, ওপেন সোসাইটি ইন্সটিটিউট, ইন্সটিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড, আমেরিকান ফার্স্ট পার্টি, হেরিটেজ ফাউন্ডেশন, ন্যাশনাল এনডোমেন্ট ফর ডেমোক্রাসি, সেন্টার ফর মিডল-ইস্ট পিস এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন, হাডসন ইন্সটিটিউট, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব পপুলার কালচার, কার্নিজ কাউন্সিল অন ইথিক্স এন্ড ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স, ম্যানহাটান ইন্সটিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজ, এসোসিয়েশন অব আমেরিকান পাবলিশার্স, পিপলস্ ফর দি আমেরিকান ওয়ে, সেন্টার ফর লিবারেশন স্টাডিজ, মিডল-ইস্ট ফোরাম, দি ইন্সটিটিউট অব ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার্স, দি মিটার অর্গেনাইজেশন, ইথিক্স এন্ড পাবলিক পলিসি সেন্টার, ড্রাগ পলিসি এলায়েন্স, এডুকেশন পলিসি ইন্সটিটিউট, সেন্টার অন দি প্রেস, পলিটিক্স এন্ড পাবলিক পলিসি, ওয়ার্ল্ড এফেয়ার্স কাউন্সিল, অ্যাসপেন ইন্সটিটিউট (মগজ ধোলাইজনিত কলাকৌশলের প্রতিষ্ঠান) ইত্যাদি।

এসপেন ইন্সটিটিউট নামক প্রতিষ্ঠানে বাদশাহ ফয়সলকে হত্যার উদ্দেশ্যে তারই ভ্রাতুষ্পুত্র প্রিন্স মোসাইদকে মগজ ধোলাই করা হয়েছিল এবং ফলশ্রুতিতে প্রিন্স মোসাইদ বাদশাহ ফয়সলকে পারিবারিক ঈদের অনুষ্ঠানে গুলি করে হত্যা করে। প্রাক্তন আমেরিকান কূটনীতিবিদ ইউ এস

সেক্রেটারি হেনরী কিসিঞ্জার ও প্রাক্তন ইউ এস প্রথম মহিলা সেক্রেটারি মেডিলিন অলব্রাইট এসপেন ইন্সটিটিউটের সাথে যুক্ত ছিলেন।

বিশ্বজুড়ে ইহুদি মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রচারণামূলক মিডিয়া প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা নিরন্তর ইহুদি স্বার্থে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে:-

ফ্রন্ট পেজ ম্যাগাজিন, রেডিও ফ্রি ইউরোপ, রেডিও লিবার্টি, আমেরিকান ফিল্ম ইন্সটিটিউট, রেকর্ডিং ইন্সটিটিউট অব আমেরিকা, ন্যাশনাল ফিল্ম বোর্ড অব কানাডা, দি মিডিয়া কোয়ালিশন ইনকর্পোরেশন, দ্য মিডিয়া এক্সেস প্রোজেক্ট, কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ, আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন, দ্য আমেরিকান সোসাইটি অব কম্পোজারস্ এসোসিয়েশন, আমেরিকান সোসাইটি অব ম্যাগাজিন এডিটরস্ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকার হলিউড চলচ্চিত্র কোম্পানি ইহুদি পরিচালিত। নীল গ্যাবলার তার প্রকাশিত গ্রন্থে 'কীভাবে ইহুদিরা হলিউড ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রী আবিষ্কার করে পৃথিবীর টিভি স্ক্রীনগুলো দখল করে নিল' তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন।

উপরোক্ত ইহুদি মালিকানাধীন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই ইহুদি স্বার্থে সোচ্চার এবং সমগ্র বিশ্বকে বিভিন্ন কৌশলে এ সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলো অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, জাতিসংঘ এবং আমেরিকার ব্যবসাক্ষেত্রে ইহুদি প্রভাব

(সাবেক ও বর্তমান)

১. বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট James D. Wolfensohn

২.আইএম এফ (IMF) এর প্রধান Strauss Kahn, (আমেরিকাস্থ ইসরাইলি লবি গ্রুপ প্রধান)

৩.আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ সিষ্টেম-এর চেয়ারম্যান/পরিচালক Alan Greenspan, Larry Mishel, Vice President: Ross Eisenbrey, Hugh Freedberg.

৪. চিকাগো বোর্ড অব ট্রেড এর চেয়ারম্যান Nickolas J. Neubauer

৫. নিউইয়র্ক বোর্ড অব ট্রেড-এর এক্টিং চেয়ারম্যান Charles H. Falk, ভাইস চেয়ারম্যান Frederick W. Schoenhut

৬. আমেরিকান ন্যাশনাল ষ্টান্ডার্ডস্ ইন্সটিটিউট এর প্রেসিডেন্ট Mark W. Hurwitz

৭. ইলেকট্রনিকস্ রিটেইলিং এসোসিয়েশন এর চেয়ারম্যান Linda A. Goldstein.

৮. জেমোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট অব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট Lee Berg.

৯. আমেরিকান সিকিউরিটি অব এক্সচেঞ্জ এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট Arthur Levitt, সেক্রেটারি Jonathan G. Katz, কমিশনার Cynthia A. Glassman I Harvey J. Goldschmid.

১০. ডাইরেক্ট মার্কেটিং এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট H. Robert Weintzen.

১১. ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিল প্রধান Stephen Friedman.

১২. আমেরিকান কাউন্সিল ফর ক্যাপিটাল ফরমেশন-এর প্রেসিডেন্ট Mark A. Bloomfield.

১৩. বিজনেস কাউন্সিল ফর সাসটেনেবুল এনার্জির চেয়ারম্যান Scott A. Wiener.

১৪. কনজ্যুউমার এনার্জি কাউন্সিল অব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট Ellen Berman.

১৫.কনজ্যিউমারস্ ইউনিয়নের ডিরেক্টর Gene Kimmelman, পলিসি এনালিষ্ট Adam Goldberg.

১৬. নিউক্লিয়ার কন্ট্রোল ইন্সটিটিউট এর প্রতিষ্ঠাতা Paul Leventhal (যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক সংস্থার প্রাক্তন সিনিয়র মেম্বার)

১৭. সেন্টার ফর স্ট্রেটেজিক এন্ড বাজেটারী এসেসমেন্ট বোর্ড-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান Richard Danzig-কে সাম্প্রতিককালে আমিরিকান নৌ-বাহিনীর সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

১৮. আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রধান Jacob Kellenberger (ইহুদি বিধায় ইহুদি জনগোষ্টির কল্যাণে রেডক্রসের সাহায্য উন্মোক্ত করে দেন অথচ বিশ্বের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির ভয়ংকর বিপদে রেডক্রসের ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য)। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যেকেই শক্তিশালী ইহুদি লবির সাথে যুক্ত।

১৯. জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলে কর্মরত পরিদর্শকদের অনেকেই ইহুদি। সিকিউরিটি কাউন্সিল ছাড়াও সাধারণ পরিষদ ও জাতিসংঘ পরিচালিত বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিযুক্ত ইহুদি কর্মকর্তারাই ইসরাইলি স্বার্থে নেপথ্যে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সাবেক ও বর্তমান ইহুদি প্রধানদের তলিকা

Harvard University USA: প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট Lawrence Summers (replaced by Neil Rudenstine)

Tufts University USA: সাম্প্রতিককালে Lawrence S. Bacow এ প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কার্যভার চালিয়ে আসছেন। তাছাড়া বয়স্ক ইহুদি কমিউনিটির জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর এবং হিব্রু কলেজের তিনি একজন ট্রাষ্টি।

Princeton University USA: প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট Harvey Shapiro, ২০০১ সলে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

Dartmouth College USA: প্রেসিডেন্ট James O. Freedman.

Cornell University USA: প্রেসিডেন্ট Jeffrey Lehman.

University of Pennsylvania USA: প্রেসিডেন্ট Judith Rodin.

Northwestern University USA: প্রেসিডেন্ট Henry Bienen.
University of California USA: প্রেসিডেন্ট Richard Atkinson.
Stanford University USA: চেয়ারম্যান অব দি বোর্ড Isaac Stein.
McGill University (Canada): প্রিন্সিপাল Heather Munroe-Blum
Carnegie Mellon University USA: প্রেসিডেন্ট Jared L. Cohon
West Chester University USA: প্রেসিডেন্ট Madeleine Wing Adler.
Yale University USA: প্রেসিডেন্ট Richard L. Levin.
The University of Alberta (Canada): দুজন ইহুদি প্রেসিডেন্ট Max Wyman Ges এবং Myer Horowitz.
New School for Social Research USA: ডিন Richard Bernstein
Centre for Jewish-Christian Relations (Cambridge University U.K): এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর Edward Kessler.

এছাড়া বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, রাশিয়া, স্লোভাকিয়া এবং গ্রেট ব্রিটেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে কর্মরত রয়েছেন অসংখ্য ইহুদি পণ্ডিত ব্যক্তিগণ।

স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, প্লাটিনাম, মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান পাথরসামগ্রীর ব্যবসা ইহুদি নিয়ন্ত্রিত

ইসরাইল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মূল্যবান পাথরসামগ্রী রপ্তানীকারক দেশ। 'জেরুসালেম পোস্ট' পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী তেলআবিবের সন্নিকটে অবস্থিত রামাত গান এলাকায় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হীরা ব্যবসার প্রসার ঘটেছে। ইসরাইল প্রতি বছর ২.৫ মিলিয়ন ডলারের হীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করে। আন্তর্জাতিক বাজারে ইসরাইল হীরার প্রাত্যাহিক মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। পাশাপাশি অন্যান্য মূল্যবান পাথরসামগ্রী যেমন আকিক, নীলা, রুবী, গোমেজ ইত্যাদি হতে তৈরি গলার হার, কানের ঝুমকো, আংটি ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক অলংকারাদিও রপ্তানী করে থাকে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ইসরাইলের অর্থনীতিতে এর বিরাট প্রভাব রয়েছে। প্রাগৌতিহাসিক যুগ হতে ইহুদিরা স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, মুক্তো ও

অন্যান্য পাথরসামগ্রী ও সুদের কারবারের সাথে জড়িত। বিশ্বের বড় বড় মানি একচেঞ্জ, ষ্টক একচেঞ্জ এবং বিখ্যাত বিভিন্ন ব্যাংকের মালিকানা ইহুদি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। ভারতের গোলকান্দা, ব্রাজিল এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে অবস্থিত স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরাসহ মূল্যবান পাথর সামগ্রী আহরণের জন্য এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত খনি আবিস্কৃত হয়েছে তার ৯০% এর মালিকই ইহুদি। বিশ্বের মানি মার্কেটগুলোর বেশিরভাগই ইহুদি নিয়ন্ত্রিত। লন্ডনের বুলিয়ন মার্কেট, পশ্চিম ইউরোপের এন্টওয়ার্প শহরের মূল্যবান জেমস্ পাথরসামগ্রীর মার্কেট কিংবা জুরিখ-এর স্বর্ণ মার্কেট-এর বেশিরভাগ মালিকই ইহুদি।

ইহুদি মালিকানাধীন খ্যাতনামা রথচাইল্ড কোম্পানি এবং হফম্যান কোম্পানি আফ্রিকার বিভিন্ন স্বর্ণ খনি হতে একচেটিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম ও হীরা উত্তোলন করে থাকে। ভারতের গোলকান্দা হতেও এ কোম্পানি প্রচুর হীরা আহরণ করার ইতিহাস রয়েছে। এদিকে লন্ডন ও জুরিখ-এর স্বর্ণ মার্কেটের খ্যাতনামা তিনজন মালিক এন এম রথচাইল্ড এন্ড সন্স, মোকাট্টা এন্ড গোল্ডস্মিথ এবং স্যামুয়েল মন্টাগু এন্ড কোং স্বর্ণের প্রতিদিনের দর নির্ধারণ করে থাকে। সমস্ত পৃথিবীর স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা এ তিনটি কোম্পানির প্রতিদিনের রেট অনুযায়ী স্বর্ণ বেচাকেনা করে থাকে। প্রতিদিনের দর নির্ধারণ করে এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য মণিমুক্তো নিলামে বিক্রি করে ইহুদি ব্যবসায়ীরা সমগ্র পৃথিবীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রচুর টাকা হাতিয়ে নেয়।

বর্তমান পৃথিবীতে সাড়ে সাতশ কোটির উপরে লোকের বাস। পৃথিবীর আহরিত সম্পদের শতকরা ৯০ভাগই নিয়ন্ত্রন করছে প্রায় দশহাজার লোক। তারমধ্যে ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে জন্ম নেওয়া ইহুদি 'আমস্‌কেল রথচাইল্ড' ব্যবসা শুরু করেন। তার পাঁচ ছেলের মধ্যে নাথান ইংল্যান্ডে, জেমস্ ফ্রান্সে, সলোমন অস্ট্রিয়াতে, আমস্‌কেল জুনিয়র প্রোসিয়াতে এবং কার্ল ইতালীতে প্রথম ব্যাংকিং ব্যবসা শুরু করেন। ক্রমান্বয়ে ব্যাংক ব্যবস্থা উপরোক্ত দেশসমূহে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

রথচাইল্ড কোম্পানির সম্পদের পরিমাণ অবিশ্বাস্যভাবে বাড়তে থাকে। এর শাখাপ্রশাখা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে একতরফা ব্যবসায়িক মুনাফা লুটে। সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের রিজার্ভ ব্যাংক ছাড়াও উন্নত দেশগুলোর ব্যাংক ব্যবসা তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। তাছাড়া ষ্টক একচেঞ্জ,

ইনস্যুরেন্স, লন্ডন এবং জুরিখের গোল্ড মার্কেট, হীরা এবং সোনারূপাসহ অন্যান্য মূল্যবান পাথর সামগ্রীর মার্কেট ক্রমেই তাদের করায়ত্ব হয়। বর্তমানে রথচাইল্ড পরিবারের সম্পদের পরিমাণ বিশ্বের বিলিয়নারদের মধ্যে প্রথম স্থানে অবস্থান করছে।

ইসরাইলি কোম্পানি হীরা যাচাই ও সঠিক মাপে কাটিং-এর জন্য কম্পিউটার সফট্ওয়্যার ও কাটিং এন্ড পলিশিং মেশিন আবিষ্কার করেছে যা ইহুদি হীরা ও পাথর ব্যবসায়ীদেরকে একধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

ইহুদি হীরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে মসিয়ে ওয়েস এন্ড সন্স, টিফানী এন্ড ভেন ক্লীপ, হফম্যান এবং আর্পেল কোম্পানি উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা ও ইউরোপের ষ্টক একচেঞ্জের ইহুদি ব্যবসায়ীরা নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ অরোপ করে একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করেছে।

বিশ্বখ্যাত জুয়ার রাজধানী আমেরিকার লাস ভেগাস ইহুদিদের দখলে

আমেরিকার নেভেদা অঙ্গরাজ্যের শহর লাসভেগাস শহরের জুয়ার আসর সর্বজনবিদীত। বছরে এখানে ৫.৭ বিলিয়ন ডলারের জুয়ার ব্যবসা হয়। পৃথিবীর ধনকুবের বিশেষ করে ইহুদি ধনী জুয়ারীরা[৮] এখানে তাদের স্বর্গরাজ্য বানিয়ে নিয়েছে বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরা এবং ক্যাসিনো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাগসি সিগেল, মায়ার ল্যানস্কি, শেল্ডন অ্যাডেলসন, স্টিভ ওয়াইন, বার্নার্ড গোল্ডস্টেইন, লিওনার্ড স্টেইনবার্গ, স্টিভ ওয়েন, বিল মিলার, মো ডালিটজ, সো কের্জনার (Bugsy Siegel , Meyer Lansky, Sheldon Adelson, Steve Wynn, Bernard Goldstein, Leonard Steinberg, Steve Wynn, Bill Miller, Moe Dalitz, Sol Kerzner) এদের মত বিভিন্ন ইহুদি ধনুকুবেররা এসমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক। এদের মিলিত শক্তি এবং একতা আমেরিকার ইহুদি সম্প্রদায়কে অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা রাখে। ইসরাইলের অর্থনীতি চাঙ্গা রাখতে এবং আমেরিকান প্রশাসনে প্রভাব বিস্তারে এদের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

---

৮. Jews and the Gambling Business, Radio Islam (Swdeen)

পোশাক শিল্পে ইহুদি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

পৃথিবীর নামকরা পোশাক ডিজাইনার যাদের তৈরি পোশাক এবং ফেব্রিক্স বিশ্বজুড়ে সমাদৃত তাদের মধ্যে ইহুদি মালিকানাধীন Donna Karan, Ralph Lauren, Playtex, Calvin Klein, Hugo Boss, DeltaTextiles, Delta Galil, GUESS ইত্যাদি ডিজাইনার প্রতিষ্ঠান বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। রলফ লরেন- এর তৈরি জিনস্ কাপড়ের প্যান্ট-সার্ট একসময় পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল যা আজও পৃথিবীর তরুণ সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রতিবছর এ সমস্ত ডিজাইনার কর্তৃক আবিস্কৃত বিভিন্ন ডিজাইনের পোষাক সর্বসাধারণের দৃষ্টি কাড়ে। বিশ্বের ধনকুবের সম্প্রদায় এবং রাজকীয় পোষাক ডিজাইনকারী এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক সবকটিই ইহুদি পরিচালিত।

ইহুদি নিয়ন্ত্রিত ফাস্ট ফুড ও কোমলপানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

ইহুদি নিয়ন্ত্রনাধীন ফাষ্ট ফুড কোম্পানিগুলোর মধ্যে বার্গার কিং, ডানকিন ডোনাটস্, ম্যাকডোনাল্ড, কে এফ সি (ক্রয়সূত্রে বর্তমানে ইহুদি মালিকানাধীন), বাম্বল বি, কারমেল, ব্রস্ট এবং তরল পানীয় যেমন পেপসি, কোকাকলা, মিরেন্ডা, সেভেনআপ, টাইগার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অসংখ্য টিনফুড প্রোডাক্ট-এর মধ্যে নেস্‌লে ফুড, হোম ডিপোট ফুড, ক্রাফট মাখন, বাটার, দধি, আইসক্রিম পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশে পাওয়া যাচ্ছে।

এশিয়া মহাদেশে ইহুদি প্রভাব

১৯৯৭ সালে আমেরিকান পত্রিকা 'দ্য ওয়ার্ল্ড ষ্ট্রিট জার্নাল'- এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে জানা যায় চীনের হংকং- এ ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটে ইরাকের বাগদাদ হতে ইহুদি কাদরী সম্প্রদায়ভূক্ত একদল ইহুদি ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। ইহুদি সম্প্রদায়ভূক্ত লোকেরা ক্রমেই চীনের বড় বড় শহরে ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটায়। চীনের সাংহাইয়ে বর্তমানে প্রায় ৩০০ ইহুদিদের বাস। বিভিন্ন ব্যবসা নিয়ে বসবাসরত ইহুদিরা সাংহাইয়ের অর্থনৈতিক অঙ্গনে এক বিরাট ভূমিকা রাখছে।

ধনুকুবের এ সমস্ত ব্যবসায়ীরা আমেরিকা ও ইসরাইলের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণে এক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। চীন বহির্বিশ্বে সামরিক

শক্তিধারী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পূর্বে ও পরে ইসরাইল হতে প্রচুর সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় করে যার মধ্যে আমেরিকান টেকেনোলজি ট্রান্সফারও রয়েছে। চীন সামরিক ক্ষেত্রে নিজস্ব টেকনোলজির পাশাপাশি আমেরিকান টেকনোলজিকে ব্যবহার করে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠে।

পরাধর শক্তিশালী পারমাণবিক দেশ হিসেবে চীন আজ আমেরিকা, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে তাদের নির্মিত আন্তদেশীয় মিসাইল, হাইড্রোজেন ও এ্যাটম বোমা, কেমিক্যাল অস্ত্র, আধুনিক যুদ্ধবিমান ইত্যাদি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এবং অর্জন করে নিয়েছে জাতিসংঘের ভেটো পাওয়ার। ইসরাইল শুধু মূল চীনের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে ক্ষান্ত হয়নি। চীন বিদ্রোহী তাইওয়ানের কাছেও যুগপৎভাবে আমেরিকা ও ইসরাইল প্রচুর অস্ত্রসম্ভার সরবরাহ করে চীনের প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়েছে[৯]।

সাংহাইয়ে ইহুদিদের নিজস্ব উপাসনালয় এবং বাজার রয়েছে। তাছাড়া চীন নিয়ন্ত্রিত হংকং-এ প্রায় ২২,০০০ ইহুদিদের মধ্যে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে এবং ব্যবসাক্ষেত্রে যথারীতি তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে।

আধুনিক তুরস্ক প্রতিষ্ঠার পেছনে ইহুদি ষড়যন্ত্র

১ম বিশ্বযুদ্ধের পরপর বিশ্ব ইহুদি সংস্থা ও ব্রিটেন চক্রান্ত করে প্রথমে অটোম্যান সাম্রাজ্যের শেষ শাসক সুলতান আব্দুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করে তৎকালীন মিলিটারি কর্নেল কামাল আতাতুর্ক-এর মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান শক্ত করার প্রয়াস পায়।

কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পূর্বে কেউ জানতোনা যে, তিনি সাবতাই জেভীর ভক্ত একজন ইহুদি। 'সাবতাই জেভী' ১৭শ শতাব্দীতে নিজেকে ইহুদিদের প্রতি প্রেরিত একজন নবী বলে দাবি করে। তৌরাত বা তোরাহ ধর্মগ্রন্থে সাবতাই জেভী সম্মন্ধে কোন উল্লেখ নেই বলে ইহুদিরা সাবতাই জেভীকে একজন ভন্ড নবী বলে আখ্যায়িত করে।

মোস্তফা কামাল পাশা আলবেনিয়া এবং তুর্কি সীমান্ত সেলোনিকায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৮৬ সালে প্রায় তিনশত ইহুদি পরিবার স্পেন হতে

---

৯. VNN news (Independent Military world affairs), Dec 14, 16 & Radio Islam, Sweeden

বিতাড়িত হয়ে আলবেনিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা তুরস্কের সেলোনিকায় আশ্রয় নেয়। স্পেনে খ্রিস্টান শক্তির উত্থানের পরপর ভয়ভীতির কারণে তারা ইহুদি হতে মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এ সমস্ত পরিবার মুসলিম নামধারী হলেও গোপনে 'সাবতাই জেভীর' প্রচারিত ইহুদি ধর্মে বিশ্বাস করত। এ ধরণের একটি পরিবারে জুবাইদা নামধারী এক মহিলার গর্ভে জন্ম নেন মোস্তফা কামাল পাশা। ছোটবেলায় তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। ১২ বছর বয়সে পিতার ইচ্ছায় তিনি মিলিটারি একাডেমিতে ভর্তি হন এবং পিতার ইচ্ছায় সাবতাই জেভীর প্রচারিত ইহুদি ধর্মে আকৃষ্ট হন।

১৮০০ শতাব্দীর শেষভাগে তুরস্কের অটোম্যান শাসক ইউরোপের কয়েকটি ইহুদি পরিচালিত ব্যাংক হতে উচ্চ সুদে প্রচুর টাকা ধার নেয়। সময়মতো পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ইহুদি ব্যাংকগুলো সুলতান আব্দুল হামিদকে প্রস্তাব দেয় সুলতানের ধার নেওয়া টাকা ব্যাংকগুলো মওকুফ করে দেবে যদি সুলতান তুর্কিশাসিত ফিলিস্তিন ইহুদিদের কাছে হস্তান্তর করেন।

ব্রিটিশ এবং ইহুদি চক্রান্তের এখানেই শুরু। ১৯০০ শতাব্দীতে সেলোনিকায় প্রায় ২০,০০০ ইহুদি পরিবারের বসবাস ছিল। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে সেলোনিকা গ্রিক দখলে চলে যাওয়ার পর এবং মুসলিম নামধারী সাবতাই জেভীর অনুসরণকারী ইহুদিরা তুরস্কের ইস্তাম্বুলে পাড়ি জমায়। এই বিশহাজার পরিবারের তরুণরা নিজেদের সত্যিকার ধর্মীয় পরিচয় গোপন রেখে অটোম্যান খলিফাদের অধীনে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। মোস্তফা কামালও উক্ত সময় সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অটোম্যান খলিফাদের পতনের পেছনে মুসলিম নামধারী গোপন এ ইহুদি সেনাসদস্যের সাথে ব্রিটিশ শাসক এবং তাদের ইহুদি দোসররা গোপন আঁতাত শুরু করে। ইহুদি বেষ্টিত সুলতানের মিনিষ্ট্রি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সুলতান আব্দুল হামিদের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয় ঋণের টাকা মওকুফের বিনিময়ে যাতে ফিলিস্তিন প্রদেশ ইহুদিদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়। সুলতান রাজী না হওয়াতে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে ব্রিটিশ ও ইহুদি চক্রান্ত তৎপর হয়ে উঠে।

হিব্রু ভাষায় প্রকাশিত[১০] পত্রিকার জার্নালিস্ট ও প্রকাশক বেন-আবি তার প্রকাশিত এক নিবন্ধে লিখেন যে, মোস্তফা কামাল পাশা কথিত ইহুদি ভণ্ড নবি 'সাবতাই জেভীর' একজন ভক্ত যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত জেরুজালেমের জাতীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত এক গ্রন্থে।

---

১০. Radio Islam journal, Sweeden

তৎকালীন ইস্তাম্বুলে ১৯০৯ সালে মোহাম্মদ অর্পি পাশার (মুসলিম নামধারী ইহুদি যাদেরকে তুরস্কে ডনমেহ বলা হয়) নের্তৃত্বে 'গ্রান্ড ওরিয়েন্ট অটোম্যান' নামে প্রতিষ্ঠানটির পেছনে গোপন ইহুদি সেনাসদস্য যোগ দিতে থাকে এবং পরবর্তীতে সুলতানের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

মোস্তফা কামাল পাশা ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মিলিটারি জেনারেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯২৪ সালে প্রায় ৭০-৮০ হাজার মুসলিম নামধারী ইহুদি সেনাসদস্যের বিদ্রোহের কারণে ইস্তাম্বুলের সুলতান শাসিত ১৩০০ বছরের অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

মোস্তফা কামাল পাশা নুতন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং তিনি প্রথমে বিভিন্ন সংস্কারে মনোযোগ দেন। তৎকালীন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা আবিষ্কার করেন মুসলিম নামধারী মোস্তফা কামাল ভণ্ড নবি সাবতাই জেভীর একজন অনুসারী কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। সমগ্র তুরস্ক জুড়ে যখন এ গুজব রটে তখন কামাল পাশা নিজের সত্যিকার পরিচয় অস্বীকার করেন।

১৯৩৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বছরে তিনি তুর্কিকে পশ্চিমা সভ্যতার আদলে নূতন তুরস্কের জন্ম দেন এবং তার আমলেই প্রকৃত মুসলিম সংস্কৃতির কবর রচিত হয়। মোস্তফা কামাল পাশা সবসময় নিজেকে একজন আদর্শ মুসলিম হিসেবে তুর্কিদের কাছে দাবি করতেন অথচ তার কার্যকলাপের সবকিছুই ছিল ইসলাম পরিপন্থী।

তুরস্কের শাসনভার নেওয়ার পর তিনি মসজিদ হতে আরবীতে আজান দেওয়ার পরিবর্তে তুর্কি ভাষায় আজান দেওয়ার বিধান প্রবর্তন করেন। আজানে 'আল্লাহু আকবর' এর বদলে তিনি তুর্কি ভাষায় 'তানরী উদ্দুর' উচ্চারণ করতে মোয়াজ্জিনদেরকে নির্দেশ দেন।

তিনি জনসভায় বলেন, "আমরা আমাদের আইন আকাশ (অর্থাৎ কুরআন) থেকে পাইনি।" আমাদের বিধান আমাদেরকেই তৈরি করতে হবে।

মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য ব্যবহৃত জায়নামাজের পরিবর্তে খ্রিস্টানদের মত কাঠের বেঞ্চের উপর বসে নামাজ পড়ার বিধান প্রবর্তন করেন যাতে সেজদা প্রথা বিলুপ্ত হয়।

মহিলাদেরকে পর্দা করা চলবে না। পশ্চিমা আচরণ ও সংস্কৃতি অনুসরণ করতে হবে। বোরকা ছেড়ে স্কার্ট ড্রেস এবং ইচ্ছামত শরীর অনাবৃত করে মুসলিম রমনীরা তুরস্কে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারার

ব্যাপারে সরকারী নির্দেশ জারি করা হয়। মসজিদের ইমামদেরকে ইসলামিক নিয়মকানুন পরিহার করে তার দর্শন মোতাবেক নিয়মকানুন প্রবর্তনের আদেশ দেন। মসজিদের ভেতর জুতো নিয়ে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া যাবে না এবং মসজিদ প্রাঙ্গনে প্রয়োজনে গান বাজনাও করা যাবে।

ইসলাম যা বেদুঈন দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল (প্রকারান্তরে নবী করীম ﷺ উদ্দেশ্য করে) তার চালচলন ও নীতিকথা অনুসরণ না করে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার আদলে তুরস্কে ইসলামকে পরিচালিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রাগৌতিহাসিক যুগের ইসলামিক বিধিবিধানের সংস্কার করতে হবে।

স্বৈরশাসক মোস্তফা কামাল পাশার শাসনামলে তুরস্ক সত্যিকার অর্থে ইসলামিক মূল্যবোধ হারায়। ইসলামবিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য পশ্চিমা শক্তি এবং ইহুদিরা তাকে একসময় 'আধুনিক তুরস্কের জনক' উপাধিতে ভূষিত করে।

ইহুদি রাব্বি (ধর্মযাজক) 'হাইম নাহুম' যখন খলিফা আব্দুল হামিদকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ফিলিস্তিন প্রদেশ ইহুদিদের জন্য ছেড়ে দিতে তখন আব্দুল হামিদ অস্বীকৃতি জনিয়েছিলেন। সেই নাহুম পরিবারের সদস্যরাই মোস্তফা কামালের মন্ত্রীসভায় অর্থনৈতিক উপদেষ্ঠা ছিল এবং তুরস্কের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রনসহ তুর্কিতে ইহুদিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। হাইম নাহুম লর্ড কার্জনকে বলেছিল - নব্য তুরস্কের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেন, পরিবর্তে আমি ওয়াদা করছি তুর্কি হতে ইসলামের নাম মুছে দিব এবং খলিফাদের পুনরুত্থান রোধ করব। পরবর্তী পর্যায়ে হাইম নাহুম মোস্তফা কামাল এবং তার মন্ত্রীসভার একজন মহিলা সদস্য (ব্রিটিশ গুপ্তচর এজেন্ট) সাথে শলাপরামর্শ করে ১৯২৩ সালের ২৪শে জুলাই সুইজারল্যান্ডের লুসাইনে আমেরিকা, ব্রিটিশ, ফ্রান্স, ইতালী, রোমানিয়া, জাপান ও গ্রীসের স্বার্থ সংরক্ষণ করে তুরস্কের এলাকা নির্ধারিত করে একটি চুক্তি সম্পাদন করে। এতে বিশাল তুর্কি সাম্রাজ্য বলে আর কিছুই রইলনা।

১৯৮৩ সালের ১১ই নভেম্বর অতিরিক্ত মদ্যপানে সৃষ্ট লিভার সিরোসিসে মোস্তফা কামাল পাশার মৃত্যু হয়। ব্রিটিশ পত্রিকা 'দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ' কামাল পাশার মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জানায় এবং মন্তব্য করে যে, কামাল পাশা সত্যিকার অর্থে ব্রিটেনের পরম বন্ধু ছিলেন। ইসরাইল ও আমেরিকা একই সুরে সুর মেলায়। তুর্কি জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ইসলামকে এবং তুর্কি সালতানাতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কথা বলে গোপনে ইহুদি ভণ্ড নবি 'সাবতাই জেভী' অনুসারী কামাল পাশা চিরতরে ঐতিহ্যবাহী তুরস্ককে

অন্ধকারে নিপতিত করে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেব এরদোগান (সুন্নী) তুরস্ক অভ্যন্তরে ইসলামিক ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে নিবেদিত। আশা করা যাচ্ছে অদুর ভবিষ্যতে তুরস্ক অতীতের মত ইসলামিক ঐতিহ্য ফিরে পাবে।

পারমাণবিক বোমা তৈরিতে ইহুদি বৈজ্ঞানিকদের ভূমিকা

১৯৮৬ সালে ঐতিহাসিক রিচার্ড রহোদস কর্তৃক প্রকাশিত "The Making of the Atomic Bomb" গ্রন্থ হতে জানা যায় আমেরিকার ম্যানহোটান প্রজেক্টে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান এর নির্দেশে প্রায় সাত হাজার বৈজ্ঞানিক আণবিক বোমা তৈরির গবেষণার কাজে নিযুক্ত ছিল। এদের অধিকাংশই ছিল ইহুদি বৈজ্ঞানিক। ১৯৩০ সালের শেষ দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। ইহুদি পদার্থবিজ্ঞানীরা তখন এ বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার জন্য এগিয়ে আসে।

মোট ১১জন বিজ্ঞানী যারা পারমাণবিক বোমার রূপকার তাদের মধ্যে দশজনই ছিল ইহুদি, একজন ইটালিয়ান খ্রিস্টান বৈজ্ঞানিক যার নাম ছিল 'ফারমি' কিন্তু তার স্ত্রী ছিল ইহুদি। হাঙ্গেরীতে জন্মগ্রহণকারী জে. রবার্ট ওপেনহিমার (ম্যানহোটান আণবিক প্রজেক্টের তৎকালীন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান ব্যক্তিত্ব), থিডর ভন কারমেন, জর্জ ডি হ্যাভিসি, মাইকেল পলানি, লিও জিলার্ড, ইউগেন উইগনার, জন ভন নিউম্যান, এডওয়ার্ড টেলার প্রমুখ ইহুদি বৈজ্ঞানিকরা আমেরিকার ম্যানহাটান প্রজেক্টে প্রথম আণবিক বোমা তৈরির গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন।

রবার্ট ওপেনহিমারকে এর নের্তৃত্ব দেওয়ার জন্য আণবিক বোমা তৈরির জনক, এডওয়ার্ড টেলারকে শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমার জনক এবং অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী স্যামুয়েল টি কোহেনকে নিউট্রন পারমাণবিক বোমার জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এদের তিনজনই ইহুদি সম্প্রদায়ভূক্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষপ্রান্তে এসে আমেরিকা, ব্রিটেন, ইতালি, রাশিয়া ও অন্যান্য মিত্রবাহিনি জার্মানির আত্মসমর্পণের পর জাপানকে পরাভূত করতে জাপানের হিরোশিমাতে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট 'কর্নেল পল ডব্লিউ

তিব্বত' তার মায়ের নামে উৎসগীকৃত 'ইনোলা গে' বোমারু বিমান হতে হিরোসিমার সিমা সার্জিক্যাল ক্লিনিক এর উপর 'লিটল বয়' (৬৪ কে.জি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ) নামের আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। ৪.৪ মাইল এলাকা জুড়ে এর ধ্বংসযজ্ঞ চলে এবং নাগাসাকিতে এর দুদিন পর ৮ই আগস্ট 'ফ্যাট ম্যান' নামক অপেক্ষাকৃত ছোট ৬.৪ কে.জি ওজনের আণবিক প্লোটনিয়াম বোমা একটি টেনিস কোর্টে মেজর চার্লস ডব্লিউ সুইনি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়। এ বোমাটি শিল্প নগরী নাগাসাকিতে ৭,০৫০ ডিগ্রি উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং এর আণবিক কণা প্রতি ঘন্টায় ৬২৪ মাইল বেগে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

হিরোশিমাতে আহত এবং নিহতের সংখ্যা ১,৬৬,০০০ এবং নাগাসাকিতে এর সংখ্যা ছিল ৮০,০০০ তাছাড়া পরবর্তী সময়ে এ দুটো শহরে অসংখ্য লোকজন ও গবাদিপশু রেডিয়েশনজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে।

মরণাস্ত্র আণবিক বোমার আবিষ্কারক ও নিক্ষেপকারী মানবসভ্যতার ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম স্থান দখল করলেও আমেরিকাতে তাদেরকে বীরের সম্মান দেওয়া হয়। আণবিক বোমার আবিষ্কারক ইহুদি বিধায় সমগোত্রিয় ইহুদিরা তাদেরকে নিয়ে গর্ব করে। বিভিন্ন ধরণের মরণাস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ১ম বিশ্বযুদ্ধে ১ কোটি সেনাসদস্য ও ৭০ লক্ষ সাধারণ লোক মৃত্যুবরণ করে। অসংখ্য লোক আহত এবং পঙ্গুত্ববরণ করে। ২য় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ২ কোটি সেনাসদস্য ও প্রায় ৫ কোটি সাধারণ মানুষ মারা যায়। যুদ্ধের কারণে প্রায় ২ কোটি লোক অনাহারে, অর্ধাহারে এবং বিভিন্ন রোগে অক্রান্ত হয়।

আণবিক বোমা আবিষ্কারের জনক জে. রবার্ট ওপেনহিমার ১৯৬৭ সালে ৬৩ বছর বয়সে গলায় ক্যানসারজনিত রোগে মারা যায়। নিউট্রন বোমার আবিষ্কারক স্যামুয়েল টি. কোহেন ২০১০ সালের ২৮ শে নভেম্বর ৮৯ বছরে হৃদরোগে মারা যায়। তার মৃতদেহ তার শেষ ইচ্ছানুসারে জ্বালিয়ে ফেলা হয়। হাইড্রোজেন বোমার আবিষ্কারক এডওয়ার্ড টেলর ২০০৩ সালে ৯৫ বছর বয়সে স্ট্রোকে মারা যায়।

জাপানের হিরোশিমায় প্রথম আণবিক বোমা নিক্ষেপণকারী পল ডব্লিউ তিব্বত ৯২ বছর বয়সে শ্বাসকষ্টে মারা যায়। হিরোসিমাতে ১,৬৬,০০০ নিরোপরাধ লোকের মৃত্যুতে সে অনুতপ্ত নয় বলে এক সাক্ষাৎকারে জানায়। তার শেষ ইচ্ছানুযায়ী তার মৃতদেহ জ্বালিয়ে ইংলিশ চ্যানেলে ছাই নিক্ষেপ করা হয়। নাগাসাকিতে বোমা নিক্ষেপকারী জর্জ ডব্লিউ সুইনি নাগাসাকিতে

হতাহতের জন্য দুঃখিত নয় বরং জাপানীদেরকে সমূলে বিনাশ করাই উচিত ছিল বলে জানায়। ২০০৫ সালে হৃদরোগে সে মারা যায়।

মানবতার এ করুণ পরিণতির জন্য যুদ্ধবাজ খ্রিস্টানও ইহুদি সম্প্রদায়ভূক্ত লোকেরাই দায়ি। খ্রিস্টানও এবং ইহুদি সম্প্রদায়ভূক্ত লোকেরা অহরহ মানবতার দোহাই দেয় অথচ পৃথিবীতে ওরাই সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী এবং বিভিন্ন হত্যাযজ্ঞের মূল হোতা হিসেবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

হিটলারের গ্যাসচেম্বার এবং ইহুদি নিধন প্রসঙ্গে

বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ডেভিড ইরবিং ১৯৮৯ সালে অষ্ট্রিয়ায় তার এক ভাষ্যে Auschwitz এর গ্যাস চেম্বার নিয়ে মন্তব্য করেন যে "The gas chamber shown to the tourists at Auschwitz is a fake, built after the war by the Polish communists." অর্থাৎ Auschwitz এ ইহুদি নিধনের জন্য ১৯৪২-৪৪ সালে যে গ্যাস চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছিল এবং টুরিষ্টদের দেখানো হয় তা মেকি এবং আদৌ সত্য নয়। ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষে পোলান্ডের কমিউনিষ্টরা তাদের প্রয়োজনে এটা তৈরি করেছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন। ডেভিড ইরবিং বিশ্বাস করেন এবং ঘোষণা দেন ইহুদিরা বিশ্ববিবেকের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে এবং গুলি করে ৬০ লক্ষ ইহুদি নিধনের খবর অপপ্রচারের মাধ্যমে ইহুদি মিডিয়াসমূহ সামনে নিয়ে আসে যা অদৌ সত্য নয়।

একই সালে তার লিখিত বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন "আমি এডলফ্ আইকম্যানের (যাকে ইহুদি নিধনের প্রধান সংগঠক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ অপরাধে ইসরাইলি কোর্টের সংক্ষিপ্ত রায়ে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়) ব্যক্তিগত ফাইলপত্র ঘেটে নিশ্চিত হয়েছি যে, হিটলার এবং তার সহকর্মী নাজি সদস্যরা জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত দেশসমূহ হতে জড়োকৃত লক্ষ লক্ষ ইহুদি জনগোষ্ঠিকে ট্রেন-এ তুলে অন্যত্র সরিয়ে নেয় এবং জার্মান নাজিদের দৃষ্টিতে দোষী ইহুদি সদস্যদের কিছু অংশকে রেল লাইনের পাশে গুলি করে হত্যা করে তবে ৬০ লক্ষ ইহুদিদের বেশিরভাগকে গ্যাস চেম্বারে পুড়িয়ে মেরেছে এমন ইহুদি প্রচারণা সত্য নয়।" তিনি আরও বলেন হিটলার ইহুদি নিধনের এ মহাপরিকল্পনা এবং গ্যাস চেম্বার সম্মন্ধে তেমন কিছু জানতেন না যা ইহুদিদের মিথ্যে প্রচারণারই অংশ।

ডেভিড ইরবিং ১৯৮৯ সালে অষ্ট্রিয়াতে এ ঘোষণা দেওয়ার পর ইহুদি নিয়ন্ত্রিত সংক্ষিপ্ত আদালতের রায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে ২০০৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি জার্মানির মিউনিকে ১৩,৩০০ পাউন্ড জরিমানাসহ তাকে তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং জার্মানিতে সংরক্ষিত জাদুঘরে নাজিদের ফাইল ঘাটাঘাটি করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ জারী করা হয়। জার্মান নাজিদের এ হত্যাকাণ্ড অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে বেলজিয়াম, চেক রিপাবলিক, ফ্রান্স, জার্মানি, ইসরাইল, লিথুয়ানিয়া, পোলান্ড, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশে আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়।

ঐতিহাসিক ডেভিড ইরবিং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তার ভাষ্যে বলেন- আমি মনে করি ব্রিটিশ কোর্ট আমাদেরকে অনুমতি দেবে যে, আমরা এ সত্যের পক্ষে কিছু সাক্ষী যোগাড় করি! জার্মান কোর্ট এ আবেদন নাকচ করে দেয়। পোল্যান্ড সরকার স্বীকার করে যে, তথাকথিত Auschwitz এর গ্যাস চেম্বারটি ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে নির্মিত হয়েছিল।

ইরবিং তার অন্য একটি ভাষ্যে বলেন- "ইতিহাস একটি গজে ওঠা গাছের মতো, যতই ঘাটাঘাটি করবেন ততই বেশি জানবেন এবং আমি ১৯৮৯ সালে নাজিদের হলোকাস্ট সম্বন্ধে অনেকছুিই জেনেছি।" তাকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে- তাহলে কতজন ইহুদিদেরকে নাজিরা হত্যা করেছে বলে আপনি মনে করেন? উত্তরে তিনি বলেন- আমি এর প্রকৃত সংখ্যা জানি না যেহেতু আমি হলোকাস্ট বিশেষজ্ঞ নই। আমি একজন ইতিহাসবিদ হিসেবে মনে করি- আমার কথা বলার স্বাধীনতা আছে এবং আমি মনে করি অস্ট্রিয়ার সংসদ আগামী ১২ মাসের মধ্যে এ ব্যাপারে সত্যের পক্ষে তাদের অবস্থান নেবে।

ব্রিটেনের 'দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় ১৯৯৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ডেভিড ইরবিং ইরাক যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন- আমরা শক্তিশালী বিধায় ইরাকি নিরীহ জনগণের উপর অকাতরে বোমা বর্ষণ করেছি। তারা দূর্বল বলে তাদের আর্তচিৎকার কেউ শুনেনি। লন্ডনের ডাউনিং স্ট্রিটের নির্দেশে ব্রিটিশ রয়েল এয়ারফোর্স কি ইতিহাসে স্থান করে নেবে? তারা কি পত্রিকাতে প্রকাশিত নিরীহ ইরাকিদের ক্ষতবিক্ষত চিত্র দেখতে পায়নি? ব্রিটিশ রয়েল এয়াফোর্সের এ নির্দয় কাহিনী বর্তমান শতাব্দীর ইতিহাসে নির্মমতার সাক্ষ্য দেবে।

ইহুদি তালমুদ-এর পংক্তি শয়তানের উক্তি

ব্রাদার নাথানিয়েল কেপনার

হিব্রু ভাষায় বর্ণিত তালমুদ গ্রন্থ ইহুদিদের ধর্মীয় বিধানের নির্দেশ দেয় এবং এটি প্রাগৌতিহাসিক যুগের মৌখিক বিধিবিধানের পুস্তকাকৃত সংস্করণ। তালমুদ-এ বর্ণিত বিধানসমূহে প্রকাশ পেয়েছে ইহুদি ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, হিংসা-বিদ্বেষ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে অবমাননা ও ধর্মের উপর আক্রমণ যা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই। পুস্তকাকারে প্রকাশিত বিকৃত তালমুদকে তিনভাগে ভাগ করা যায় যাতে বর্ণিত হয়েছে,

ক) ইহুদিদের শ্রেষ্ঠত্ব।

খ) ইহুদি নয় এমন ব্যক্তি বা ধর্মকে ঘৃণা।

গ) খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং তাদের ধর্ম প্রচারক ঈসা ও তাঁর মাতা কুমারী মরিয়মকে অবমাননা এবং তাঁর চরিত্রের উপর আক্রমণ।

পরিবর্তিত তালমুদ গ্রন্থ অনুযায়ী ইহুদিদের প্রতি নির্দেশসমূহ :

১. যদি ভিন্ন ধর্মের কেউ একজন ইহুদিকে আঘাত করে তাহলে তাকে মেরে ফেলতে হবে। (সেনহিড্রিন ৫৮ বি)

২. যদি কোনো ইহুদি ভিন্ন ধর্মের লোকের কোনো মূল্যবান জিনিস কুঁড়িয়ে পায় তাহলে এর মালিককে জিনিষটি ফেরত দিতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। (বাবা মিজিয়া ২৪ এ)

৩. যদি কোনো ইহুদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর কাউকে হত্যা করে তাহলে বিচারে তাকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না। (সেনহিড্রিন ৫৭ এ)

৪. যদি একজন ইহুদি ভিন্ন ধর্মের কারোর জিনিস চুরি করে এবং তার কাছে রেখে দেয় তাহলে কোন অন্যায় হবে না। (সেনহিড্রিন ৫৭ এ)

৫. একজন ইহুদি প্রতারণার মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মের কারোর লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদ (মুসলমানি) করতে পারবে। (বাবা কাম্মা ১১৩এ)

৬. ভিন্ন ধর্মের সকল শিশু-কিশোররা পশুর মতো। (ইবামত ৯৮এ)

৭. ভিন্ন ধর্মের ঔরসে জন্ম নেওয়া শিশুকন্যাকে জন্ম থেকে ঋতুবতী নারীর তো নাপাক ভাবতে হবে। (আবদা জারাহ্ ৩৬ বি)

৮. ভিন্ন ধর্মের মানুষরা মানুষ নয়, তারা পশুসদৃশ। (বাবা মিজিয়া ১১৪বি)

৯. যদি একজন ইহুদি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সাথে একত্রে খায় তাহলে সে যেন কুকুরের সাথে খেলো। (টসাপত্, জেবামত্ ৯৪বি)

১০. ভিন্ন ধর্মের ভাল ব্যক্তিকেও মেরে ফেলা উচিত। (সফিরিম ১৫)

১১. ভিন্ন ধর্মের নরনারীর মধ্যে যৌনসঙ্গম পশুর যৌনসঙ্গমের ন্যায়। (সেনহিড্রিন ৭৪বি)

১২. শান্তিপূর্ণ সময়ে ভিন্ন ধর্মের কারোর সংস্পর্শে যদি কে নো ইহুদিকে আসতে হয় তাহলে পরোক্ষভাবে তার ক্ষতি করতে বাঁধা নেই যেমন মই-এ (সিড়ি) উঠা ব্যক্তির মই গোপনে সরিয়ে নেওয়া যাতে সে মাটিতে পড়ে আঘাত পায় বা মৃত্যু ঘটে। (সুলকান আরুক, ইউরে দি'য়া ১৫৮)

১৩. ঈসা নরকে পশুবিষ্ঠামিশ্রিত গরম জলের মধ্যে সিদ্ধ হচ্ছে। (গিট্টিন ৫৭এ)

১৪. ঈসার যৌনতা অনৈতিক এবং সে একজন ইটপূজারী। (সেনহিড্রিন ১০৭বি)

১৫. ঈসাকে তার মন্দ কাজের জন্য অনুতপ্ত না হওয়ার জন্য ইহুদি সমাজ হতে বহিস্কৃত করতে হবে। (সটাহ্ ৪৭এ)

১৬. ঈসার মা মরিয়ম একজন চুল বিন্যাসকারিনি এবং অসংখ্য লোকের সাথে যৌনসঙ্গম করেছে। (সাবাত ১০৪বি)

১৭. কুমারী মরিয়ম যাকে রাজকুমারীর সম্মান দেওয়া হয় সে একজন কাঠমিস্ত্রির সাথে বেশ্যাবৃত্তি করেছে। (সেনহিড্রিন ১০৬ এ)

১৮. যে খ্রিস্টান 'তালমুদ' অস্বীকার করে সে নরকে যাবে এবং অনন্তকাল শাস্তি পাবে (রস হাসানা ১৭এ)

(ব্যক্ত থাকে যে, হিব্রু ভাষায় বর্ণিত আল্লাহর নির্দেশ সম্বলিত মূল তালমুদের পংক্তিগুলো ইবরাহিম নবির আমল থেকে মুখে মুখে প্রচলিত এবং অবিকৃত ছিল যা পরবর্তী পর্যায়ে আগত অসংখ্য নবী রাসুল ও ধর্মযাজকদের মুখস্ত ছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় ইহুদি রাব্বি (ধর্মযাজক) সম্প্রদায়ের লোকেরা পংক্তিগুলোর অধিকাংশ নিজেদের সুবিধামত সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। ফলে তালমুদের মর্মবাণীতে বিভিন্ন পরিবর্তন আসে। উপরে তালমুদের কিয়দংশ উপস্থাপন করা হল যা কোনোক্রমেই আল্লাহর বাণী হতে পাওে না বরং ইহুদি রাব্বি শ্রেণীর ইচ্ছাকৃত পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। ইহুদিরা মনে করে একমাত্র তারাই আল্লাহর পছন্দনীয় জাতি এবং

তাদের তাবেদারির জন্যই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে আদিষ্ট করা হয়েছে। ঈসা (আ:) কিংবা মুহাম্মদ (স:) এবং তাদের মাধ্যমে প্রেরিত আসমানী কিতাবসমূহ ইঞ্জিল ও কুরআনে তাদের বিশ্বাস নেই। ঠিক একই কায়দায় খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা পবিত্র ইঞ্জিলে পরিবর্তন/বিয়োজন ঘটিয়েছে। পবিত্র ইঞ্জিল এ পর্যন্ত প্রায় একহাজারবার পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে এবং প্রতিটি সংস্করণেই পরিবর্তন আনা হয়েছে। অবিকৃত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সুরাতে ইহুদিদের তালমুদ/তৌরাত এবং খ্রিস্টানদের ইঞ্জিলে আল্লাহর বাণী পরিবর্তনের কথা বার বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং এজন্য তাদেরকে শেষ বিচারের দিনে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বলে কুরআনে হুঁশিয়ার করা হয়)

ইহুদি জাতি কেন আজ এত শক্তিশালী?

ইহুদি জাতি প্রমাণ করতে পেরেছে যে, শুধু বুদ্ধি এবং জ্ঞানের জোরে একটি জাতি কিংবা সমাজ সংখ্যার দিক থেকে নগণ্য হয়েও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। তাদের একতা, সংহতি এবং সামাজিক অবস্থান বিচার করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, একজন ইহুদির প্রতি অন্য ইহুদির সহমর্মিতাবোধ এবং সহযোগিতা তাদেরকে শৃঙ্খলিত জাতি হিসেবে পরিগণিত করেছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আবিষ্কারে তারা অগ্রজ ভূমিকা পালন করছে। ইহুদিরা প্রাচীন কাল হতে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত। প্রায় চল্লিশটি গোত্রের সমন্বয়ে ইহুদি জাতির বিকাশ লাভ ঘটলেও তালমুদ এবং তৌরাতের পরিবর্তিত বিভিন্ন অনুশাসনকে সামনে রেখে তারা তাদের ধর্মের ভিত্তিকে মজবুত করেছে। ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা তাদেরকে একই সূতায় বাঁধতে পেরেছে। আফ্রিকার কালো ইহুদি এবং ইউরোপের সাদা ইহুদিদের মধ্যে তারা পার্থক্য খুঁজেনা যে কারণে ইসরাইলে বসবাসকারী ইহুদি জনগোষ্ঠি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে এসে জড়ো হলেও গোত্রে গোত্রে পার্থক্য সৃষ্টি না করে তারা শান্তিতে সহবস্থান করছে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। "তারা ঈশ্বরের পছন্দনীয় জাতি সুতরাং তারাই পৃথিবী শাসন করবে"- এ বিশ্বাস তাদের মননে প্রভাব বিস্তার করে আসছে। ধন, দৌলতে তাদের প্রবল নেশা। তাই তারা সুদকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাংক ব্যবসা ছড়িয়ে দিয়েছে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে। খনিজ সম্পদ, মণিমুক্তা তাদের হাতের মুঠোয়। পৃথিবীজুড়ে ব্যবসা, বাণিজ্যে তারা একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করেছে। বিজ্ঞান নিয়ে তারা গবেষণা করে এবং নব নব আবিষ্কারের মাধ্যমে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার প্রয়াস

চালিয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোর ৯৬%-এর মালিক তারা। আন্তর্জাতিক রেডিও, টিভি, পত্রপত্রিকা এবং তাদের পরিচালিত মিডিয়াগুলোতে প্রচারিত সত্য এবং অসত্য খবর পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অকপটে বিশ্বাস করে। পৃথিবীতে জাতিতে জাতিতে কলহ, বিবাদ এবং যুদ্ধ বাঁধিয়ে তারা ফায়দা লুটে। তাদের সামনে যে প্রতিবন্ধকতা এসে দাঁড়ায় তা তারা সমূলে বিনাশ করে। পক্ষান্তরে মুসলিম জাতি আজ সমগ্র বিশ্বজুড়ে দ্বিধাবিভক্ত। আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকারে তারা পর্যুদস্ত। পশ্চিমাশক্তির রাহুগ্রাসের কবলে বিপন্ন হয়ে তারা নিজেদের অগাধ ধনভাণ্ডার তাদের হাতে অকাতরে তুলে দিচ্ছে। ইসলামের মূলমন্ত্রকে পরিত্যাগ করে মাজহাব, সিয়া, সুন্নি, আহলে হাদিস, বিভিন্ন মনগড়া ফতোয়া, মাসা'লা ইত্যাদির মধ্যে মুসলিমজাতি ঘুরপাক খাচ্ছে যে কারণে দুঃখ, দৈন্য আর আর মৃত্যুর মিছিল সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করছে।

এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জরিপে ইসরাইলকে সন্ত্রাসী দেশসমূহের শীর্ষে স্থান দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসে চ্যাম্পিয়ন ক্ষুদ্র এ দেশটির বিরুদ্ধে আমেরিকা কিংবা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অবরোধ অরোপ করছে না কেন? উত্তর একটাই, আমেরিকাসহ বিশ্বজুড়ে ইহুদি লবি এতটাই শক্তিশালী যে, শক্তিধর দেশগুলোর প্রশাসন সে ক্ষমতার কাছে নতজানু।

সিআইএ

(সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি)

আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র হেডকোয়ার্টার আমেরিকার ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের ল্যাংলেতে অবস্থিত। আলোচিত এ গোয়েন্দা সংস্থা আমেরিকার স্বার্থে পৃথিবীর আনাচে কানাচে সর্বত্রই বিরাজমান।

১৯৪৭ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে প্রায় ২১,৫৭৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী সরাসরি যুক্ত। বাৎসরিক বাজেট ১৫ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এর সেক্রেটারিয়েট রয়েছে। গত একযুগ ধরে সিআইএ বহির্বিশ্বে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে যার শিকার সে দেশগুলোর সামরিক সদস্য, রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ এবং নিরীহ জনগণ। বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বে ত্রাস সৃষ্টিকারী পাইলটবিহীন ড্রোন বিমান হামলার মাধ্যমে অকপটে হত্যাযজ্ঞের শিকার হচ্ছে অসংখ্য মানুষ।

কালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত 'জেনারেল এটোমিকস' কোম্পানি ড্রোন বিমান তৈরি করে আসছে। মাত্র ৬০টি পাইলট বিহীন ড্রোন বিমান দিয়ে শুরু করে বর্তমানে এর সংখ্যা বিভিন্ন মাপের ছয়হাজারেরও উপরে আমেরিকার অস্ত্রভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে। অত্যাধুনিক এ বিমানটি আকারে ক্ষুদ্র এবং বিভিন্ন ধরণের মিসাইলসহ মরণাস্ত্র বহনে সক্ষম। সংযুক্ত ক্যামেরা ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে অব্যর্থ আঘাত হানতে পারে ড্রোন।

২০০১ সালে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার বাজেট নিয়ে ড্রোন বিমান তৈরি শুরু হয় যা আজ ফুলে ফেঁপে এ বাজেটের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬.৯৭ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। ইসরাইলি টাডিরন কোম্পানি এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সরবরাহ করে যার মধ্যে স্ক্যানিং ক্যামেরা এর লক্ষ্যবস্তুকে মূহুর্তে রিমোট কন্ট্রোলের নাগালের মধ্যে এনে দেয়। ড্রোন বিমানের মধ্যে অনেক ধরণের প্রকারভেদ রয়েছে। কিছু বিমান শুধু বিশ্বজুড়ে নজরদারীর কাজে ব্যবহৃত হয়। এগুলো দেখতে অনেকটা বড় ফড়িংয়ের মত যা কোনো ধরনের রাডারে ধরা পড়ে না।

আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল ড্রোন হামলার জন্য তিনধরনের টার্গেট নির্ধারণ করে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল কর্তৃক

প্রস্তুতকৃত 'ব্যক্তির কিলিং লিস্ট' যা প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর করা হয়। সিআইএ তার নিজস্ব টার্গেট নির্ধারণ করে যা অনুমোদনের প্রয়োজন হয়না, তৃতীয় লিস্ট প্রস্তুত করে মিলিটারি জয়েন্ট স্পেশাল অপারেশনস্ কমান্ড। ২য় এবং ৩য় প্রতিষ্ঠানের অধীনে তাদের নিজস্ব ফাইটার পাইলট, পাইলটবিহীন ড্রোন বিমান, কমান্ড সেন্টার, বাজেট, লজিস্টিক সাপোর্ট ইত্যাদি স্বাধীনভাবে কাজ করে। যখন যেখানে আঘাত হানা প্রয়োজন সেখানে আঘাত হানতে তাদের কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

সিআইএর খরচের জন্য কোন রিসিট দাখিল করতে হয়না। এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা যখন যেখানে যেটুকু প্রয়োজন নিঃসংকোচে বিনা অনুমোদনে খরচ করে থাকে। ২০০৯ সাল পর্যন্ত সিআইএ এবং মিলিটারি কমাণ্ড ফিলিপাইন, ইয়েমেন, ইরাক, লিবিয়া এবং আফগানিস্তানে নির্বিবাদে প্রাণঘাতি ড্রোন হামলা চালায়। পরবর্তীতে আফগান-পাকিস্তানের সীমান্ত জুড়ে ড্রোন হামলা অব্যাহত থাকে। ২০০৮-১০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান অভ্যন্তরে সিআইএ ২২০ বার ড্রোন হামলা চালায় এবং আফগানিস্তানে উক্ত সময়ে তারও বেশি পরিমাণে রুটিনমাফিক ড্রোন হামলা পরিচালিত হয়। নীরব, একচেটিয়া এ হত্যাকান্ডে বে-সামরিক অগণিত নারী, শিশু, বৃদ্ধ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, কেউবা পঙ্গু হয়ে বেঁচে আছে। আমেরিকার মিলিটারি অপারেশন যে সমস্ত দেশগুলোতে নেই সিআইএ সে সমস্ত দেশের শত্রু নিধনে ড্রোন বিমান ব্যবহার করে থাকে।

ইয়েমেন এবং সোমালিয়াতে তথাকথিত আল-কায়দা সন্দেহভাজন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানে ড্রোন হামলার মাধ্যমে অনেক হতাহত হয়। আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় ড্রোন হামলায় অনেক বেসামরিক লোক, এমনকি বিবাহ মজলিসে সন্দেহাতীত লোক সমাগমের উপর ড্রোন হামলা চালানো হয়। অনেক নারী, শিশু ও বে-সামরিক জনসাধারণের মৃত্যুতে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের রাজনৈতিক ও মানবাধিকার সংস্থা প্রতিবাদ জানালে তৎকালীন সিআইএ প্রধান 'লিয়ন প্যানেটা' ঘোষণা দেন যে, তার অনুমোদন ব্যতিরেকে যেন ড্রোন হামলা চালানো না হয় যাতে বিশ্ববিবেক এ হত্যাযজ্ঞের নিন্দা না জানায়।

ইরাক যুদ্ধে আমেরিকা সমর্থিত সরকারী হিসাব মতে মৃতের সংখ্যা সামরিক ও বে-সামরিক মিলে প্রায় ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা এর অনেক উর্দ্ধে। ইরাকে যুদ্ধরত আমেরিকা ও কোয়ালিশন ফোর্সের

মৃতের সংখ্যা মাত্র ৪,৪৮৬ জন। আফগানিস্তানে এ পর্যন্ত সামরিক ও বে-সামরিক মৃতের সংখ্যা ৩০,০০০ হাজারের মতো অন্যদিকে আমেরিকার হিসাব মতে আমেরিকা ও কোয়ালিশন ফোর্সের মৃতের সংখ্যা এ পর্যন্ত ৩,৪২৯ জন এ দাঁড়িয়েছে। আফগানিস্তান ও ইরাকে বে-সামরিক অসংখ্য জনসাধারণ পঙ্গুত্ব বরণ করে বেঁচে আছে। সিআইএ সৃষ্ট ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরাকের দশ লক্ষ এবং ইরানের প্রায় ১৫ লক্ষ সামরিক, আধা-সামরিক ও বে-সামরিক লোকজন মৃত্যুবরণ করেছে। ইসরাইলি মোসাদ ও সিআইএ সৃষ্ট সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে এ পর্যন্ত বেসরকারী হিসাবমতে প্রায় তিনলক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করেছে এবং প্রায় ১০ লক্ষ লোক পার্শবর্তী দেশসমূহে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে।

মার্কিন বুদ্ধিজীবি ও কলামিষ্ট 'নোয়াম চমস্কি' তার এক কলামে[১১] লিখেছেন "ওসামা বিন লাদেনকে ৮০ জন কমান্ডোর সমন্বয়ে গঠিত হিট স্কোয়ার্ড নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করেছে। এ হত্যাকাণ্ড ছিল পরিকল্পিত এবং আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।" টুইন টাওয়ার ধ্বংসের একবছর পর এফবিআই প্রধান রবার্ট ম্যুয়েলার সন্দেহ পোষণ করেন যে, এ ধ্বংসের পরিকল্পনা হয় আফগানিস্তানে এবং বাস্তবায়নের কাজ চলে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও জার্মানিতে। সিআইএ কিংবা এফবিআই এ ঘটনার কূল কিনারা করতে পারেনি ২০০২ সালের শেষ অবধি পর্যন্ত।

৯/১১ ঘটনার পরপরই তালেবানরা ঘোষণা দিয়েছিল যে, টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ব্যাপারে আমেরিকা ওসামা বিন লাদেনের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ যদি দিতে পারে তাহলে তালেবানরা ওসামাকে আমেরিকার হাতে তুলে দেবে। শোনামাত্রই হোয়াইট হাউস এ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিল। আমেরিকা টুইন টাওয়ারে আল-কায়েদার ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোনো বিশ্বাসযোগ্য দলিল বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে পারেনি। পরিবর্তে একটি মনগড়া ভিডিও বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছে যা অপ্রমাণিত ও মিথ্যে বলে সিআইএ এবং এফবিআই-এর অনেক উর্ধ্বতম কর্মকর্তারাও মনে করেন।

লাদেন হত্যা অভিযানের নামকরণ করা হয়েছিল 'অপারেশন জেরোনিমো'। গোয়েন্দা পরিভাষায় বিন লাদেনের নামকরণ করা হয়েছিল জেরোনিমো"। জেরোনিমো ছিলেন একজন আমেরিকান রেডইন্ডিয়ান মুক্তিযোদ্ধা। তিনি তাঁর দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো শাসনকারী শ্বেতাঙ্গদের

১১. My Reaction to Osama Bin Laden's Death : Noam Chomosky

দখল-গণহত্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধার নামানুসারে বিন লাদেনের নাম রাখাকে অনেকে মনে করেন ওসামাকে প্রকারান্তরে মহিমান্বিত করা হয়েছে।

ওসামার পক্ষে এধরণের একটি ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর মত শক্তি এবং জনবল নেই বরং আমেরিকার অনেক বিজ্ঞজনেরা ইসরাইলের মোসাদকে সন্দেহ করেন কারণ মোসাদ এ ধরণের একটি পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে সক্ষম। টুইন টাওয়ারে ৯/১১-তে কর্মরত প্রায় চার হাজার ইহুদি কর্মকর্তা কর্মচারীর অনুপস্থিতি এ সন্দেহকে আরও ঘনীভূত করে তুলে।

ওসামাকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করা এবং মৃতদেহ সাগরে নিক্ষেপ করা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের আওতায় পড়ে। কোনো সন্দেভাজন ব্যক্তিকে বিচারের কাঠগড়ায় না এনে হত্যা করাটা একটি জঘন্য অপরাধ এবং এ জন্য নোয়াম চমস্কি প্রেসিডেন্ট বুশ ও ওবামাকে দায়ী করেছেন। বিভিন্ন দেশে মিথ্যে অপবাদে যুদ্ধ লাগিয়ে নিরাপরাধ মানুষ হত্যার পরিকল্পনাকারী প্রেসিডেন্ট বুশের বিচার হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

সিআইএ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের 'হিট লিষ্ট' তৈরি করে ভার্জিনিয়ার ল্যাংলের সিআইএ হেডকোয়ার্টারে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টের ভিত্তিতে। লিগ্যাল অ্যানালাইসিস ডিপার্টমেন্ট পেরিয়ে যখন হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট অনুমোদন কমিটিতে লিস্ট প্রেরণ করা হয় তারপরই এটি বাস্তবায়ন করে সিআইএ হিট স্কোয়ার্ড। আমেরিকার স্বার্থে আঘাত আসে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম বিভিন্ন গোয়েন্দা রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়। সিআইএ ছাড়াও আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই (ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) দেশের অভ্যন্তরে সর্বক্ষেত্রে নজরদারি বজায় রাখে। আমেরিকার আভ্যন্তরিণ এ গোয়েন্দা সংস্থার জন্ম হয় ১৯০৮ সালে 'ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' নাম দিয়ে। ১৯৩৫ সালে বৃহত্তর আকারে এর নামকরণ করা হয় এফবিআই। এ প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক বাজেট ৯.৬ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। প্রতি বৎসরই বাজেটের পরিধি বাড়ানো হয়। এর জনবল রয়েছে ৩৫,১০৪ জন।

বিভিন্ন অপরাধ দমন, ড্রাগ ট্রাফিকিং, ডাকাতি, খুন-খারাবি, আভ্যন্তরিণ গোলযোগ, শত্রু দমন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, বহির্বিশ্বের আক্রমণ, বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার অনুপ্রবেশ, সাইবার ক্রাইম, জাতীয় নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানটি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করে। আমেরিকার সর্বত্র এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড চলমান এবং নিরবিচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

অত্যন্ত শক্তিশালী এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিভিন্ন সেক্রেটারিয়েট এবং গবেষণাগার রয়েছে। এফবিআই-এর রয়েছে নিজস্ব বিমানবহর, পাইলট, উদ্ধারকারী দল, টেকনিশিয়ান, গুপ্তচর এবং অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিকস্ এবং অন্যান্য ভারী যন্ত্রপাতি। সমগ্র আমেরিকান নাগরিকদের এবং সন্দেহভাজন বিদেশী নাগরিকদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলে মোট ৯৬ মিলিয়ন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এফবিআই-এর কম্পিউটার প্রোগ্রামে সংরক্ষিত রয়েছে তাই অভিযুক্তদের ধরতে এদের খুব একটা বেগ পেতে হয় না।

এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে রয়েছে অসংখ্য ট্রেনিং ইন্সটিটিউট এবং সফলভাবে কার্য পরিচালনার জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা। আলাদাভাবে মেধা অনুযায়ী ইউনিটে ভাগ করে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। যেমন : পুলিশ ট্রেনিং ইউনিট, গোলাবারুদ ট্রেনিং ইউনিট, ফরেনসিক ট্রেনিং ইউনিট, ইনভেস্টিগেটিভ ট্রেনিং ইউনিট, আইন সংক্রান্ত ট্রেনিং ইউনিট, ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইউনিট, নতুন এজেন্ট ট্রেনিং ইউনিট, সাইবার ট্রেনিং ইউনিট ইত্যাদি। প্রতিটি আমেরিকান নাগরিকদের ব্যক্তিগত ক্রাইম রিপোর্ট এবং তাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট তাদের ফাইলে সংরক্ষিত রয়েছে। আমেরিকায় প্রবেশকারীদের আঙ্গুলের ছাপ বিমানবন্দরে সংরক্ষণ করা হয় যাতে প্রবেশকারী কোনো অপরাধমূলক কার্যে জড়িয়ে পড়লে এফবিআই সহজে ধরতে পারে।

'ডিজিটাল কানেকশন সিস্টেম' নামে ইলেকট্রনিক সফটওয়্যার সিস্টেম এফবিআই-এর কাছে রয়েছে যার মাধ্যমে আগত ই-মেইল এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন এফবিআই-এর নজরদারীতে ধরা পড়ে। তাদের রয়েছে ভাষাবিশারদ ইউনিট, বৈজ্ঞানিক, ইনফরমেশন টেকনোলজি স্পেশালিস্ট, গোলাবারুদ স্পেশালিস্ট ইত্যাদি পেশাদার ব্যক্তিবর্গ। আমেরিকাতে কে 'সিআইএ' এজেন্ট কিংবা কে 'এফবিআই' এজেন্ট তা বলা বড়ই কঠিন। সমাজে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এমনভাবে নিজেদের জাল বিস্তার করে আছে যাতে করে আমেরিকার বিরুদ্ধে কেউ কোনো নাশকতামূলক কার্যে জড়িয়ে পড়তে না পারে। তাছাড়া আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইসরাইল, ব্রিটেন এবং নিউজিল্যান্ড নিজেদের মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় চুক্তিতে আবদ্ধ।

এতকিছুর পরও খুন, ব্যাংক ডাকাতি, ধর্ষণ, জালিয়াতি, চোরাগুপ্তা হামলা সংক্রান্ত অপরাধমূলক কার্যে আমেরিকার নাম পৃথিবীর শীর্ষে অবস্থান করছে। জাতিসংঘের ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর উন্নত ও সভ্যতম দেশ হিসেবে পরিচিত নিম্নলিখিত প্রথম ১০টি দেশ অপরাধমূলক কার্যকলাপের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে।

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সর্বনিম্ন তালিকায় অবস্থান করছে যদিও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বেশিরভাগ অপরাধীরা অপরাধ করেও পার পেয়ে যায়। পুলিশ রিপোর্টে অথবা আইনের ফাঁকফোঁকরে অধিকাংশই ঘুষ, দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদেরকে আড়াল করার প্রয়াস পায় যা হয়তো শীর্ষে অবস্থানকারী নিম্নলিখিত দেশগুলোতে সম্ভব নয়।

২০১১ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী সংগঠিত সর্বপ্রকার অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য প্রথম যে দশটি দেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তা নিম্নে উদ্বৃত হল :

দেশ	অপরাধ	লোকসংখ্যা
যুক্তরাষ্ট্র	১,২৪,০৮,৮৯৯	৩১,৭৯,৫১,০০০
জার্মানি	২১,১২,৮৪৩	৮,০৭,১৬,০০০
ফ্রান্স	১১,৭২,৫৪৭	৬,৫৮,৮৫,০০০
রাশিয়া	১০,৪১,৩৪০	১৪,৩৭,০০,০০০
ইতালি	৯,০০,৮৭০	৬,০০,২১,৯৫৫
কানাডা	৬,২৮,৯২০	৩,৫৩,৪৩,৯৬২
চিলি	৬,১১,৩২২	১,৭৬,২০,০০০
পোলান্ড	৫,২১,৯৪২	৩,৮৫,০০,০০০
স্পেন	৩,৭৭,৯৮৫	৪,৬৬,০৯,৭০০
নেদারল্যান্ড	৩,৭২,৩০৫	১,৬৮,৪৮,৩০০

আমেরিকার নিউইয়র্ক, কালিফোর্নিয়া, ডেট্রোয়েট, ভার্জিনিয়া, লস এঞ্জেলস্, ওয়াশিংটন এবং ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যসমূহে অপরাধের মাত্রা বেশি। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি, জালিয়াতি, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ, মাদক ব্যবসা, চোরাচালান ইত্যাদি বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য এসমস্ত অঙ্গরাজ্যসমূহ প্রসিদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী দেশসমূহের তালিকা প্রস্তুত করে এবং সে সমস্ত দেশসমূহের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় অবরোধ অরোপ করে

থাকে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য অবরোধ অরোপকারী কোন দেশ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নেই।

আমেরিকার ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৪৪ জন প্রেসিডেন্টের মধ্যে চারজন প্রেসিডেন্ট আততায়ীর গুলিতে নিহত হন তারা হলেন,

- জেমস্ গ্যারিফিল্ড (১২তম প্রেসিডেন্ট)
- আব্রাহাম লিংকলিন (১৬ তম প্রেসিডেন্ট)
- উইলিয়ম ম্যাকিনলে (২৫ তম প্রেসিডেন্ট)
- জন এফ কেনেডী (৩৫ তম প্রেসিডেন্ট)

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন যারা গুপ্তহত্যা থেকে প্রাণে বেঁচে যান তারা হলেন,

- আন্দ্রিউ জ্যাকসন (৭ম প্রেসিডেন্ট)
- থিডোর রুজভেল্ট (২৬তম প্রেসিডেন্ট)
- ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট (৩২তম প্রেসিডেন্ট)
- হ্যারি ট্রুম্যান (৩৩তম প্রেসিডেন্ট)
- গেরাল্ড ফোর্ড (৩৮তম প্রেসিডেন্ট)
- রোনাল্ড রিগ্যান (৪০তম প্রেসিডেন্ট)

আমেরিকার অঘোষিত যুদ্ধ, ফনিক্সস্ প্রোগ্রাম

বিশ্বব্যাপী আমেরিকার ফনিক্স অপারেশন (ড্রোন হামলা) পরিচালিত হয়ে আসছে ৯/১১ টুইন টাওয়ার হামলার পরপরই। ইতিপূর্বে এ হামলা পরিচালিত হতো সিআইএ-র গোপন ষড়যন্ত্রে সরাসরি অথবা রিক্রুটিং এজেন্টদের সহায়তায়। ১৯৯৩ সালে সোমালিয়ার মোগাদিসুতে বাদুরের ন্যায় দেখতে আমেরিকার 'ব্ল্যাক হক' হেলিকপ্টার ভূপাতিত হওয়ার পর দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়। রাডারে ধরা পড়ে না এ হেলিকপ্টারটি গোপনে আকাশের অত্যন্ত নিচুস্তরে চালিয়ে শত্রু অভ্যন্তরে পৌঁছে তছনছ করে দিতে পারে এমন একটি অত্যাধুনিক বিমান মোগাদিসুতে ভূপাতিত হওয়ার পর আমেরিকান প্রশাসন নড়েচড়ে বসে।

২০০১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বুশ প্রশাসন পুরো পৃথিবী জুড়ে সিআইএ কর্তৃক নির্ধারিত সন্ত্রাসী, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খী নেতা যারা আমেরিকার ক্ষতি করতে পারে এবং কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদেরকে হত্যার জন্য মনুষ্যবিহীন রিমোট কন্ট্রোল 'ড্রোন হামলা' পরিচালনার অনুমোদন দেয়। তখন থেকেই শুরু হয় ফিলিপাইন, ইরাক, ইয়েমেন, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান জুড়ে তথাকথিত মুসলিম সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টিকারী ড্রোন হামলা। হতাহত হয় অনেক নিরাপরাধ মানুষ। টার্গেট ব্যক্তিকে হত্যা করতে গিয়ে পাশাপাশি নিহত হয় অসংখ্য নিরাপরাধ নারী ও শিশু।

২০০৩ সালের ২১শে মার্চে 'দ্য গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত সার্চ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সিআইএ'র গুপ্তহত্যা সম্বলিত একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর যেকোনো দেশের রাজনৈতিক নেতা, যারা আমেরিকার স্বার্থবিরোধী কাজে সোচ্চার তাদেরকে সিআইএ আমেরিকার শত্রু মনে করে এবং তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত কিংবা হত্যা করার প্রয়াস চালায়। নিম্নবর্ণিত কয়েকটি উদাহরণ পাঠক সমীপে উপস্থাপন করা হলো,

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমদ সুকর্ণকে সিআইএ হত্যার চেষ্টা করে কারণ আহমদ সুকর্ণ জোটমুক্ত দেশগুলোর প্রবক্তা ছিলেন যা আমেরিকা পছন্দ করেনা। আমেরিকা চায় সকল দেশই তাদের আজ্ঞাবহ থাকবে এবং তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সমর্থন করবে। ১৯৬৫ সালে সুকর্ণ

সিআইএ'র হস্তক্ষেপে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং পরবর্তী পাঁচ বছর নজরবন্দী থাকা আবস্থায় মারা যান।

কিউবার অপ্রতিদ্বন্ধী নেতা ফিদেল কাস্ট্রোকে হত্যার উদ্দেশ্যে 'সিআইএ' ১৯৬০ সাল হতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬৩৮ বার চেষ্টা চালায়। বিষাক্ত পিল, বিষাক্ত কলম, শক্তিশালী রাইফেল, খাদ্যে মিশ্রণের জন্য জীবাণুমিশ্রিত পাউডার ইত্যাদি সরবরাহ করে। প্রেসিডেন্ট গার্ডদের সতর্কতার জন্য এ সকল ষড়যন্ত্র বিফলে পর্যবেসিত হয়।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার কঙ্গোর প্রথম প্রধানমন্ত্রী প্রেট্রিস লুমুমবাকে হত্যার অনুমোদন দিলে তৎকালীন সিআইএ প্রধান এলেন ডালেস একজন সিআইএ বৈজ্ঞানিককে লুমুমবার দেহে লেথেল ভাইরাস প্রয়োগের জন্য কঙ্গোতে পাঠান। এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের পূর্বেই অন্য একটি সিআইএ ষড়যন্ত্রে লুমুমবাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং সিআইএ সমর্থিত বিদ্রোহীদের দ্বারা লুমুমবাকে হত্যা করা হয়।

আইসেনহাওয়ার ও কেনেডী প্রশাসন ডমিনিকান রিপাবলিকের স্বৈরশাসক রাফায়েল ট্রোজিলোকে হত্যার অনুমোদন দিলে সিআইএ এজেন্টদের মাধ্যমে ১৯৬১ সালে তাকে হত্যা করা হয়।

১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সন পরিষ্কার ভাষায় বলেন চিলির বামপন্থী প্রেসিডেন্ট 'এ্যালেনডিকে' যদি সিআইএ হত্যা করতে পারে তাহলে তিনি পরিতাপ করবেন না। ১৯৭৩ সালে সেলভেডরে সিআইএ সমর্থিত একটি সামরিক ক্যু-তে এ্যালেনডি প্রাণ হারান। ১৯৭০-৭৩ সালে চিলিতে সিআইএ এজেন্ট কর্তৃক প্রেসিডেন্ট এলেনডিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং পরে হত্যা করা হয়। 'পিনোচেট সামরিক ক্যু' বলে খ্যাত এ বিদ্রোহের পরপরই প্রায় ২০,০০০ লোককে গোপনে সিআইএ-র নির্দেশে হত্যা করা হয়।

কম্বোডিয়ার প্রিন্স নরোডম সিংহানুককে হত্যার জন্য সিআইএ অনেক পরিকল্পনা করেছে বলে ১৯৬০ সালে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ সালে সিআইএ-র সহযোগিতায় তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

১৯৯৯ সালে সার্বিয়ায় ন্যাটোর বিমান আক্রমণের সময় সিআইএ শ্লোবডান মিলোসভিককে হত্যার উদ্দেশ্যে মিলোসভিকের বাসস্থানের উপর তিনটি লেজার গাইডেড মিসাইল নিক্ষেপ করে। এর পূর্বমূহুর্তে মিলোসভিক তার বাসস্থান ত্যাগ করলে ভিলাটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। মিলোসভিক

প্রাণে বেঁচে গেলেও পরে সিআইয়ের হাতে ধরা পড়ে এবং সার্বিয়ায় গণহত্যার বিচারের জন্য তাকে আন্তর্জাতিক আদালতে সোপর্দ করা হয়।

৯/১১ তে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পরে বুশ প্রশাসন ওসামা বিনলাদেনসহ তার ২৪জন ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধাকে হত্যার আদেশ দিলে ২০০১ সালের নভেম্বরে ইয়েমেনে ড্রোন হামলার মাধ্যমে ওসামার প্রধান সহযোগী সালিম সিনান আল-হারিথীসহ ছয়জনকে তাদের গাড়ির মধ্যে হত্যা করা হয় এবং পরবর্তীতে ওসামাকে পাকিস্তানের এ্যাবোটাবাদে ও তার অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সহচরদের অনেককেই পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে ড্রোন হামলার মাধ্যমে সিআইএ হত্যা করে।

১৯৮০-৯৩ সাল পর্যন্ত আল-সেলভেডরে সিআইএ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রিক্রোটিং এজেন্টদের সহায়তায় প্রায় ৬৩,০০০ লোকজনকে হত্যা করে। সিআইএ ডেথ স্কোয়াড বিদেশে পালিয়ে থাকা বিভিন্ন সেলভেডরিয়ান রাজনৈতিক নেতাদেরকে বিদেশে পালিয়ে থাকা অবস্থায়ও হত্যা করে।

১৯৮০ সালে হণ্ডুরাসে সিআইএ এজেন্ট শত শত রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক এবং বুদ্ধিজীবিকে হত্যা করে।

১৯৬৬-৬৮ সালে সিআইএ বলিভিয়াতে প্রায় ৮,০০০ বিদেশী মিশনারী ও ধর্মযাজককে হত্যা করে।

অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রদত্ত রিপোর্টে প্রকাশিত হয় যে, কলম্বিয়াতে ১৯৮৬ সালের পর হতে সিআইএ লিস্ট অনুযায়ী প্রায় ২০,০০০ লোককে হত্যা করা হয় এর মধ্যে অনেক মাদক চোরাচালানকারীদের নামও ছিল।

১৯৭০-৭২ সালের মধ্যে ইকুয়েডর, উরুগুয়ে এবং ব্রাজিলে সিআইএ বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের একটি লিস্ট তৈরি করে এবং এদেরকে হত্যার জন্য একটি ডেথ স্কোয়াড গঠন করে এবং এ ডেথ স্কোয়াডের মাধ্যমে অনেক রাজনৈতিক নেতা ও উগ্রপন্থীদেরকে হত্যা করা হয়।

১৯৫৪ সালে গুয়েতিমালায় প্রেসিডেন্ট আরবেঞ্জকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সিআইএ বিদ্রোহদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করে এবং ৩৬ বছরব্যাপী এ গৃহযুদ্ধে প্রায় দুই লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়।

হাইতিতে সিআইএ-র সহায়তায় বিদ্রোহীরা প্রায় ৩,০০০ লোককে হত্যা করে।

১৯৬৫-৬৬ সালে সিআইএ ইন্দোনেশিয়ান বিদ্রোহী মিলিটারি জান্তাদেরকে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যার জন্য উসকে দেয়।

এ গৃহযুদ্ধে সুকর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং অন্তরীণ অবস্থায় মারা যান। আমেরিকার পছন্দনীয় ব্যক্তি সুহার্তো ক্ষমতায় আসেন এবং প্রায় দশলক্ষ মানুষ এ গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারায়।

১৯৮৩ সালে ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই সিআইএ ইরানী মিলিটারি সামরিক অফিসারদের মধ্যে সন্দেহাতীত রাশিয়ার কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী কেজিবি সমর্থকদের ২০০ জনের একটি তালিকা হস্তান্তর করে। খোমেনী এ লিস্ট অনুযায়ী অনেক মিলিটারি জেনারেল ও অফিসারদেরকে ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যার নির্দেশ দেন।

২০০২ সালের জুলাই মাসে ইউ এস ডিফেন্স সেক্রেটারি ডোনাল্ড রাম্‌সফিল্ড প্রেসিডেন্ট বুশকে সিআইএর মধ্য হতে স্পেশাল অপারেশন ফোর্স (কিলার ফোর্স) গঠনের দাবি জানালে বুশ তাতে সম্মতি জানান। ক্ষমতাশালী এই ফোর্সকে অনুমোদন দেওয়া হয় এই মর্মে যে, আমেরিকার বিরুদ্ধাচরণকারী পৃথিবীব্যাপী যে কোন সন্ত্রাসী সংগঠন কিংবা ব্যক্তিকে কালক্ষেপণ না করে হত্যা করার জন্য এবং পলায়নকারী ব্যক্তি বা সংগঠনের নেতাদের পিছে লেগে থাকার জন্য যাতে তারা কোথাও আশ্রয় না পায়।

নিকারাগুয়াতে সিআইএ একটি বিরোধী দলকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সংগঠিত করে এবং তাদেরকে পার্শবর্তী দেশের শরণার্থী শিবির হতে দেশে ফিরে আসার পথ উন্মোক্ত করে দেয়। এ দলের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা তাদের ভাষায় অনেক সন্ত্রাসীকে দেশে ফেরার পর হত্যা করা হয়। মূলতঃ হত্যাকে সহজ করার জন্য সিআইএ এ পথ বেছে নেয়।

১৯৭৬ সালে থাইল্যান্ডে সিআইএ সমর্থিত মিলিটারি জান্তার বিরুদ্ধে যখন ছাত্র সংগঠন ফুঁসে উঠে তখন সিআইএ-এর সহায়তায় মিলিটারি জান্তার দুটো সন্ত্রাসী দল (ছাত্র সংগঠনগুলোকে) তছনছ করে দেয় এবং এতে অনেক ছাত্র হতাহত হয়।

১৯৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান প্রশাসন ফিলিপিনো সরকারকে মিন্দানাওয়ের মুসলিম বিদ্রোহী দমনে সহায়তা করার জন্য সিআইএ-কে নির্দেশ দেয়। এ নির্দেশের প্রেক্ষিতে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মিন্দানাওয়ের পার্বত্য এলাকায় সিআইএ আবু সাইফ গ্রুপের উপর ড্রোন হামলা চালিয়ে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে। দক্ষিণ এশিয়াতে ড্রোন হামলা প্রথমবারের মত ফিলিপাইন থেকে শুরু হয়।

২০০৪ সালে ফনিক্স প্রোগ্রামের অন্যতম পরিকল্পনাকারী 'ডেভিড কিলকোলেন' তার লিখিত জার্নালে বলেন বিশ্বব্যাপী আমেরিকার 'ফনিক্স প্রোগ্রাম' ইরাক ও আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে শুরু এবং এখান থেকেই এর প্রকৃত বাস্তবায়ন শুরু হয়[১২]। গতানুগতিক কনভেনশনাল অর্থাৎ দূরপাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র এবং সম্মুখ যুদ্ধ ব্যতিরেকে আমেরিকা খুঁজে পেয়েছে শত্রু নিধনের ভিন্ন এক অস্ত্র তা হল ড্রোন। মনুষ্যবিহীন বিশ্বস্ত এ ড্রোন বিমান হামলার মাধ্যমে তথাকথিত মৌলবাদীদেরকেও আলাদা করে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব।

ইরাক যুদ্ধে স্পেশাল অপারেশন ফোর্সের কমান্ডার ও যুদ্ধ পরিকল্পনাকারী লেঃ জেনারেল 'উইলিয়ম জেরী বয়কিন' (ডেপুটি আণ্ডার সেক্রেটারি ফর ডিফেন্স অ্যান্ড ইনটেলিজেন্স) বলেছেন- **"আমরা তাদের পেছনে লেগে থাকব যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদেরকে হত্যা কিংবা বন্দী করা না হয়। ফনিক্স প্রোগ্রামের মূল নকশা অনুযায়ী পৃথিবী জুড়ে আমরা আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ চালিয়ে যাব এবং তা গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে।"**

পেন্টাগণের অন্যতম ফনিক্স প্রোগ্রামের পরিকল্পনাকারী সাবেক সিআইএ ডিরেক্টর মাইকেল ভিকার সম্মন্ধে বলতে গিয়ে পেন্টাগনের প্রেস সেক্রেটারি 'গিওফ মোরেল' বলেন ওসামা বিন লাদেনকে পাকিস্তানে খুঁজে পেতে মাইকেল ভিকারের অবদান সবচে বেশি। নিউইয়র্ক টাইমস্ ভিকার-এর কথার উদ্বৃতি এভাবে প্রকাশ করেছে যে, ভিকার বলেছেন **"তুমি শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করবে অন্য শয়তানকে শায়েস্থা করার জন্য, আমি চাই সকল শয়তানকে নিশ্চিহ্ন করি।"** শয়তান বলতে এখানে তিনি আমেরিকার স্বার্থবিরোধী যে কোনো প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, দেশ কিংবা সংস্থাকে বুঝাতে চেয়েছেন। ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে পেতে তিনি সিআইএ-র মাধ্যমে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার অনেককেই অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করতে পেরেছিলেন। ফনিক্স প্রোগ্রাম বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসীদেরকে (আমেরিকান পরিভাষায়) নিশ্চিহ্ন করার প্রোগ্রাম।

এ প্রোগ্রামের অধীনে বিশেষ করে সিভিলিয়ান সন্ত্রাসীদেরকে গোপনে ড্রোন হামলার মাধ্যমে হত্যা করাই উদ্দেশ্য। মিলিটারি যুদ্ধের জন্য নয়। ১৯৬৭ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সিআইএ এ মহাপরিকল্পনা তৈরি করে এবং ১৯৭০ সালের মধ্যভাগে এ প্রোগ্রামকে বাস্তবায়ন করার শেষ ধাপে নিয়ে যায়। ওয়াশিংটন পোস্টের কলামিস্ট 'রবার্ট কেসার' মন্তব্য করেন এ

---

১২. ইনফরমেশন ক্লিয়ারিং হাউস

প্রোগ্রাম সকল রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। রিগ্যান প্রশাসনের আওতায় শুধু সেন্ট্রাল আমেরিকার মেক্সিকো, ব্রাজিল, গুয়েতামালা, ইকোয়েডর জুড়ে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) এর উপরে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট ওবামার কিলিং লিস্ট-এর অন্তর্ভূক্তদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে ওবামা ড্রোনকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত 'দ্য আর্মি স্কুল অব আমেরিকা' ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ যেমন, পেরু, পানামা, আর্জেন্টিনা, ইকোয়েডর, বলিভিয়া, গুয়েতামালা, মেক্সিকো ও এল-সালভাদোর- এর বিদ্রোহীদের মোট ৬১,০০০ যুবককে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে সিআইএ রাজনৈতিক নেতা এবং গণহত্যা চালানোর জন্য ট্রেনিং দেয়। উত্তর ভিয়েতনামে ফনিক্স প্রোগ্রামের অধীনে প্রায় তিনলক্ষ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের এক ভাষণের উদ্বৃতি দিয়ে 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস্' প্রকাশ করে যে, ড্রোন হামলায় এ পর্যন্ত কতজন নিরাপরাধ লোকের প্রাণহানি ঘটেছে তার সত্যিকার হিসাব কেউ জানেনা কারণ প্রত্যেকটি হামলা ওয়াশিংটনের উচ্চমহলের নির্দেশ অনুযায়ী আলাদাভাবে সরাসরি পরিচালিত হয়েছে।

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার সংস্থাগুলোর এক রিপোর্টে প্রকাশ সিআইএ 'গুয়ান্তানামো বে কারাগারে' সন্দেহভাজন আল-কায়েদা বন্দিদের উপর যে জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে তা অমানবিক এবং পাশবিক যা নির্যাতনের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এর সত্যতা স্বীকার করেন এবং সিআইএ সাবেক প্রধান জন ও. বৃনেন তার ভাষ্যে এর সাফাই গেয়ে বলেন, "কিছু কিছু সিআইএ কর্মী নির্যাতনের ব্যাপারে হয়তো নীতিমালা মেনে চলেনি কিন্তু সিআইএ অনেক ক্ষেত্রেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানববিপর্যয় ঠেকাতে পেরেছে।" কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় সিআইএ যেখানে হস্তক্ষেপ করেছে সেখানে মানবাধিকার চরমভাবে লজ্ঘিত হয়েছে।

১৯৯১ সালের গালফ যুদ্ধে আমেরিকার সেনাবাহিনী প্রধান
জেনারেল কলিন পাওয়েল[১৩]-এর মন্তব্য

১৯৯১ সালের গালফ্ যুদ্ধের সময় আমেরিকান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল 'কলিন পাওয়েল' তার এক ভাষ্যে বলেছিলেন যে, "আমেরিকান স্বার্থ যখন জড়িত তখনই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য আমেরিকা মরিয়া হয়ে উঠে কিন্তু যখন ইসরাইলের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে প্রস্তাব গৃহীত হয় তখনই আমেরিকা চুপ থাকে এবং প্রয়োজনে ইসরাইলি স্বার্থে ভেটো প্রয়োগ করে। তাছাড়া আমেরিকার কথা যখন জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত দেশগুলো শুনতে চায় না তখনই আমেরিকা জাতিসংঘে অর্থ সাহায্য কমিয়ে দেবে বলে হুমকি দেয়। অধিকন্তু যখনই কোন দেশের প্রধান আমেরিকার পক্ষ নেয় তখনই উক্ত দেশকে আমেরিকা বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করে। আবার যখন কোন দেশ আমেরিকার বিপক্ষে যায়, আমেরিকা ঐ দেশের বিরুদ্ধে বদলা নেয়।" প্রসঙ্গতঃ তিনি ইরাকের সাদ্দামের কথা তুলে ধরেন। "সাদ্দাম আমেরিকার কথা এক পর্যায়ে শোনেনি বলে ইরাকের ১৫ লক্ষ লোককে গালফ্ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, সংখ্যার দিক থেকে যাদের বেশিরভাগই ছিল শিশু ও নারী। এতসব অন্যায়ের পরও আমেরিকা মানবাধিকার সংরক্ষণের কথা বলে এবং ইরাকের স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে বলে শুধুমাত্র সাদ্দামের গোয়ার্তুমির জন্য এতসব প্রাণহানি ঘটল। যদিও আমেরিকা নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী অন্য দেশকে দূর্বৃত্ত দেশ হিসেবে আখ্যা দেয় এবং নিজেদের পক্ষে সাফাই গায়, আসলে আমেরিকাই সবচেয়ে বেশি দুর্বৃত্ত। আমরা আন্তর্জাতিক আদালতকে অবজ্ঞা করি এবং যেখানে আমাদের পছন্দ সেখানেই আমরা এককভাবে আঘাত করি। আমরা জাতিসংঘকে আদেশ করি অথচ সময়মত জাতিসংঘের অর্থ তহবিলে অর্থ প্রদানে বিরত থাকি। আমরা অন্যকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করি অথচ আমরাই আসল সন্ত্রাসী"।

---

১৩. Gore Vidal, famous critic from the US establishment, in his book "Perpetual War for Perpetual Peace - How We Got To Be So Hated"

সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্য নিয়েই আমেরিকা নিজের হাতকে রক্তে রঞ্জিত করে

১৯৯৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ইরাক যুদ্ধ ফেরত আমেরিকার প্রাক্তন মেজর জেনারেল Wade Frazier তাঁর ডায়েরীতে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিণাম নিয়ে লিখেন-

"এক বিকেলে আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম ইরাকে আমেরিকান বোমা বর্ষনের প্রতিক্রিয়া ইরাকিদের মনে কতটুকু রেখাপাত করেছে? মদের দোকান কিংবা উন্মোক্ত মাঠে মানুষের প্রতিক্রিয়া জেনে বুঝতে পারলাম তারা আমেরিকান সেনাদের বীরত্বপূর্ণ অভিযানে আনন্দিত হয়েছে, গর্ববোধে করে বলছে সাদ্দাম হোসেনকে বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করাটা অনেক আগেই উচিত ছিল। বুঝতে পারলাম তারা ইরাকের উপর ততটা বিক্ষুব্ধ নয় যতটা সাদ্দামের উপরে। এমনকি বিল ক্লিনটনের বক্তব্যে ইরাকের চেয়ে বহুগুণ বেশি ছিল সাদ্দামকে ঘিরে। ইরাকে মিলিয়নের উপরে মানুষ মরেছে শুধুমাত্র আমেরিকান বোমার আঘাতে। আমাদের হাত রক্তে রঞ্জিত করেছি কিন্তু যদি আমরা বোমাবাজি না করতাম তাহলে এত মানুষের মৃত্যু হতো না।

আমাদের গণমাধ্যম এবং সরকারের অপপ্রচার এমনই ছিল যে, ইরাকে আমেরিকান সৈন্যদের আঘাত হানা আমাদের কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ইরাকের উপর বোমার আঘাত হানা আমাদের কতটুকু অধিকারের আওতাভূক্ত তা ভাবার মত লোক খুব কমই ছিল। চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রশ্ন তুলেছিল এই বলে যে, এ ধরণের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের পেছেনে শুধুমাত্র ব্রিটেন এবং আমেরিকার একচ্ছত্র সায় ছিল বলেই সেখানে এমন অমানবিক বিপর্যয় ঘটেছে।

গত আটবছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমেরিকা ইচ্ছা করলেই অন্য জাতি বা দেশের উপর নির্বিবাদে বোমা বর্ষণ করতে পারে কিংবা সে দেশ জবরদখল করতে পারে। আমারা আফগানিস্তানে এবং সুদানে বোমা বর্ষণ করেছি, ১৯৮৯ সালে পানামায় আমেরিকান সেনাবাহিনী অনুপ্রবেশ করেছে যদিও এর স্বপক্ষে কোন যুক্তি আমাদের নেই। আমরা শুধুমাত্র আমেরিকার স্বার্থ ছাড়া অন্য দেশের স্বার্বভৌমত্ব কিংবা স্বার্থের কথা

ভাবি না। নিকারাগুয়া এবং এল-সালভাদরে অসংখ্য লোককে প্রচণ্ড আক্রমণে আমরা হত্যা করেছি, এ সমস্ত দেশের অভ্যন্তরে অনধিকার প্রবেশকে আমরা আমাদের নিজস্ব যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছি, আমেরিকা যা চায় তা পারে এবং কেউই আমাদের শক্তির সামনে দাঁড়াবার সাহস নেই।

গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এমনটি নেই যে, আমেরিকা কোনো মহৎ কাজে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কমপক্ষে ৫০টি দেশের আভ্যন্তরিণ সমস্যায় আমরা নাক গলিয়েছি, দখল করেছি অথবা আমাদের পছন্দনীয় সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়ে বিরোধীদলকে উৎখাত করেছি। কেবলমাত্র লোভ এবং সাম্রাজ্যবিস্তারে আমরা এ কাজগুলো করেছি।

লোভী এবং খুনী লোককে আমরা জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে সম্মান করি। জর্জ ওয়শিংটন যখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে কার্যভার পান তখন তিনি ছিলেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ধনী। ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে আমাদের প্রতিবেশী রেড-ইন্ডিয়ানদের সাথে জর্জ ওয়াশিংটন শান্তিচুক্তি করেও সে চুক্তির শর্ত রক্ষা করেননি। পরিবর্তে আমরা রেড-ইন্ডিয়ান অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন ছলনার মাধ্যমে নিজেদের অধিকারে এনেছি। আমাদের সৃষ্ট অতর্কিত যুদ্ধে তাদের হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন, টেইলর কিংবা উইলিয়ম হ্যারিসনের আমলেও জর্জ ওয়াশিংটনের পথ ধরে যুদ্ধ এবং বিভিন্ন শর্তভঙ্গ করে আমরা ইন্ডিয়ানদের ১৩টি কলোনি দখলে এনেছি। লুসিয়ানার মত স্টেট আমরা নেপোলিয়নের কাছ থেকে ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছি। ১৮৩৬ সালে আমরা মেক্সিকোর কাছ হতে টেক্সাস দখলে নিয়েছি। অনুরূপ আরও কত অংগরাজ্য একে একে ছলনা, যুদ্ধ এবং চুক্তিভঙ্গের মাধ্যমে অধিকারে নিয়ে আমাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছি অর্থাৎ যেখনে আমেরিকা লাভের গন্ধ পেয়েছে সেখানেই ঝাপ দিয়েছে।

আমেরিকার জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতিমালা (NSC-68) লিখা হয় Paul Nitze কর্তৃক ১৯৫০ সালে। বিখ্যাত কূটনীতিবিদ জর্জ কেনান পররাষ্ট্র নীতি লেখেন ১৯৪৮ সালে। যেহেতু বিশ্বের পরাশক্তিধর দেশ হিসেবে আমেরিকার গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং পররাষ্ট্রনীতি অবৈষম্যমূলক আদর্শে প্রণীত হয়। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে আমি দেখেছি পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে আমেরিকা নিজেদের অবস্থান সময় সময় পরিবর্তন করেছে অথবা নিজেদের স্বার্থে মেনে চলেনি।

আমেরিকার সম্মানিত মিলিটারি লিডার মেজর জেনারেল Smedley Butler যিনি দীর্ঘ সময় ইউএস মেরিনকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং আমি মেজর জেনারেল Wade Frazier প্রায় ৩৫ বছর সেকেন্ড লেফটেনেন্ট থেকে শুরু করে মেজর জেনারেল হিসেবে দায়িত্বপালন করেছি সে সময় শুধুমাত্র আমেরিকার স্বার্থ ও পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আমেরিকার নীতিকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়েছি। উপরের চাপে আমেরিকার বৈদেশিক শত্রু চিহ্নিত করে তাদের ধ্বংস করার পরিকল্পনা করতে হয়েছে যদিও সর্বক্ষেত্রে আমার মানবিক নীতি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ছিল।

১৯১৪ সালে মেক্সিকোর তেলক্ষেত্র টেম্পিকো দখল, হাইতি এবং কিউবার অর্থনৈতিক উৎসক্ষেত্র, নিকারাগুয়ায় ১৯০৯-১২ সালে আমেরিকার ব্রাউন ব্রাদার্স-এর জন্য ব্যাংকখাত প্রশস্ত করা, ১৯১৬ সালে ডমিনিকান রিপাবলিক-এ আমেরিকার জন্য চিনির ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, ১৯২৭ সালে চীনে আমেরিকার তেল কোম্পানিকে সুবিধা করে দেওয়া, আমেরিকার স্বার্থে বিশ্বের তিন মহাদেশ জুড়ে ছিল আমাদের বিভিন্ন প্রকল্প।

২য় বিশ্বযুদ্ধের পরপর আমেরিকার সিআইএ-র কর্মকাণ্ড বিস্তৃত ছিল সারা বিশ্বে। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়ার পতনের পর আমরা আরও বেপোরোয়া হয়ে উঠি। আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী যেকোনো সরকারকে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র সাহায্যে উৎখাত করি তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা সৃষ্টি করে। ১৯৪৫ সালের পর ইতালি এবং গ্রিসের গণতান্ত্রিক সরকারের পতন, চীনের কমিউনিষ্ট বিপ্লবের বিপরীতে জাপানের সেনাসদস্যদেরক ব্যবহার, ১৯৫৩ সালে ইরানে, ১৯৫৪ সালে গুয়েতিমালায়, ১৯৬৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায়, ১৯৫০-৬০ সালে ভিয়েতনামে, ১৯৬৪ সালে ব্রাজিলে, ১৯৬৬ সালে ঘানায়, ১৯৭৩ সালে চিলিতে, ১৯৮৪ সালে গ্রানাডায়, ১৯৮৯ সালে পানামায় এবং ১৯৯১ সালে ইরাকে মানববিপর্যয়ের নেপথ্যের ইন্ধনদাতা ছিল আমেরিকার পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী নীতি।

ব্রিটেনের উপনিবেশবাদী নীতি আজ বিশ্বে অনেকটা স্থবির যা এককালে ব্রিটেনকে উপরের স্তরে নিয়ে গিয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদন সামগ্রীর মধ্যে খাদ্য, তেল, পোষাকসহ ছত্রিশ ধরণের দ্রব্যাদি আমেরিকাসহ উন্নতবিশ্বের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। পৃথিবীর গরীব ৪০টি দেশ তাদের কষ্টার্জিত উৎপাদিত পণ্য আমাদের হাতে তুলে দেয়। তারা উৎপাদন করে

কিন্তু তারা ভূখানাঙ্গা থাকে। আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের মধ্যে NAFTA/GATT ইত্যাদি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে করে আমেরিকান সেনাদের জুতো, খাদ্যদ্রব্য, দক্ষিণ-এশিয়ায় প্রস্তুতকৃত খেলনা, পোষাক ইত্যাদির সরবরাহ আমেরিকার ভাণ্ডারে আসে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-জাতীয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ঋণদাতা সংস্থাসমূহ পরোক্ষভাবে আমেরিকার স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

রাশিয়ার পতনের পর মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নেই বলে মধ্যপ্রাচ্যে আমরা একচেটিয়াভাবে সেনা মোতায়েন করে আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করেছি। সাম্প্রতিক আবিস্কৃত বিভিন্ন ধরনের বোমার আঘাত কতটুকু কার্যকর তা ইরাকযুদ্ধে পরীক্ষা করা হয়েছে। ইরাকের শিল্পকারখানা আমাদের অবিরাম বোমার আঘাতে তছনছ হয়েছে। তুর্কি বিমানঘাটি হতে মানুষের উপর আমাদের জীবাণূমিশ্রিত অস্ত্র পরীক্ষাও করা হয়েছে। ইরাকে পাঁচবছরের নিচে হাজার হাজার শিশুদের মৃত্যুর কারণ ছিল বেপরোয়া বোমাবর্ষণ এবং পরিশেষে অবরোধ।

জেনেভা কনভেনশন অনুসারে নিরস্ত্র জনসাধারণ এবং সেনাদের উপর আক্রমণ না করার সাক্ষর থাকা সত্ত্বেও বুশ প্রশাসন এবং ব্রিটিশরা তা রক্ষা করে নি। ইরাকের মানববিপর্যয় বুশ প্রশাসন এবং ব্রিটেনের ইচ্ছায় সংগঠিত হয়েছে। তাই বুশ ও তার সামরিক পরামর্শদাতাদেরকে আন্তর্জাতিক আদালতের কাঠগড়ায় বিচার করা উচিত কিন্তু সত্য এই যে, প্রকৃত অপরাধীরা কখনো বিচারের সম্মুখীন হয় না, দুর্বলরাই হয়ে থাকে। ১৯৪৫ সালে গঠিত নিউরেনবার্গ আন্তর্জাতিক আদালতে দুর্বলদেরই শাস্তি হয়েছে।

আমেরিকার স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটলেই আমরা সে দেশের উপর অবরোধ অরোপ করি যেমন করে করা হয়েছে ইরাক, কিউবা বা ভিয়েতনামের উপর। অবরোধের পর সমস্ত আন্তর্জাতিক ঋণদানকারী সংস্থাগুলোর তৎপরতাও সে দেশে তাদের কর্মকাণ্ড গুটিয়ে নেয়। আমেরিকার প্রচারণা ইরাকের বিরুদ্ধে এমনভাবে করা হয়েছে যার কারণে সাদ্দামকেই দোষারূপ করা হয়ে থাকে কিন্তু এই সাদ্দাম হোসেন ১৯৯০ সালে আমেরিকার বিপুল অস্ত্রসম্ভার আমদানীর ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু আমেরিকা প্রয়োজনে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ইরাককে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চায় বলে জানানোর পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাদ্দাম প্রচুর অস্ত্র আমদানীতে একরকম বাধ্য হয়েছিলেন।

আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানির হাতে প্রচুর কেমিক্যাল ও জীবাণুমিশ্রিত অস্ত্র রয়েছে যা পৃথিবীর সকল দেশের অস্ত্রসম্ভার এক করলেও এর সমপর্যায় হবে না, সেখানে ব্রিটেন ও আমেরিকা ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের কাছে কেমিক্যাল ও জীবাণুমিশ্রিত অস্ত্রসামগ্রী ব্যবহারের অজুহাতে অভিযুক্ত করা হাস্যস্পদ নয় কি? ইসরাইলের অস্ত্রভাণ্ডারে পরমাণু, জীবানুমিশ্রিত কিংবা কেমিক্যাল অস্ত্রসামগ্রী প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে সে ব্যাপারে আমেরিকাসহ বিশ্ব নীরব ভূমিকা পালন করছে।

আমেরিকা বিভিন্ন দেশে নিজেদের স্বার্থে স্বৈরশাসকদের উত্থান ঘটায় এবং প্রয়োজন শেষ হলে তাদের পরিণতি হয় ভয়াবহ যেমন করে সাদ্দাম, সুহার্তো, ফার্দিনেন্দ মার্কোস কিংবা নরিয়েগার ভাগ্যে ঘটেছিল।

আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নীতির কারণে বিশ্বে অশান্তি লেগেই আছে। পৃথিবীকে এক শান্তিময় জনপদে পরিণত করতে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন করতে হবে। হিংস্র নীতি হিংস্রতা বাড়ায়। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে হলে আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে হবে। আমি প্রার্থনা করি আমাদের নিজেদের ধ্বংস এড়াতে সকলের বোধোদয় হবে।"

আমেরিকা : কলোনি হতে একটি জাতি, ক্রমান্বয়ে ক্রীতদাস

মাইকেল স্চেউর (Michael Scheuer) আমেরিকান ইনটেলিজেন্স সংস্থা সিআইএ'র ওসামা বিন লাদেন ইস্যু সম্পর্কিত ডেস্ক-এর প্রাক্তন প্রধান কর্মকর্তা। তার লিখিত Imperial Hubris গ্রন্থটি পাঠক সমীপে সমাদৃত ও বহুল আলোচিত।

২০১২ সালের ১৯শে অক্টোবর 'ইনফরমেশন ক্লিয়ারিং হাউস' কর্তৃক প্রকাশিত মাইকেল স্চেউরের "আমেরিকা : কলোনি হতে একটি জাতি, ক্রমান্বয়ে ক্রীতদাস" শিরোনামে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয় যা নিম্নরূপ,

'আমেরিকার গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযানের দিকে মনোনিবেশ করলে দেখা যায়, প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং গভর্নর রমনি দুজনই প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে তারা তাদের পূর্বসূরী কংগ্রেসম্যানদের মতো ইচ্ছাপূর্বক আমেরিকার অস্তিত্ব এবং সার্বভৌমত্ব ইসরাইলের কাছে সমর্পণ করেছিলেন যা কিছুসংখ্যক আমেরিকার ইহুদি ও তাদের খ্রিস্টান বন্ধুভাবাপন্ন সঙ্গি এবং ইহুদি নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম যেগুলো এ দুজন পদপ্রার্থীর পক্ষ নিয়ে ফলাও করে প্রচার করে। একথা সুনিশ্চিতভাবে ধরা যায় যে, ওবামা এবং রমনি নির্বাচনী খরচ যোগানোর জন্য আমেরিকার ধনী ইহুদি, বন্ধুভাবাপন্ন খ্রিস্টান সঙ্গী এবং ইসরাইলের প্রধান মন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর দ্বারস্থ হয়েছিলেন নিজেদের আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে। স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রক্ষায় জাতীয় সরকারের যেকোনো উদ্যোগ হবে জনগণের মঙ্গলের জন্য কিন্তু তারা মনে করেন সরকার যাদের উপর ন্যস্ত শুধু তারাই এককভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন কি না ? অথচ আমেরিকার সংবিধান মতে কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আগে জনগণের রায় নিতে হয়।

সরকারী এবং বিরোধী পার্টির কাপুরুষ সংখ্যাগরিস্ট কংগ্রেস সদস্যরা যখনই প্রেসিডেন্টের পক্ষ নিয়ে তাদের সিদ্ধান্ত জানান তখন প্রেসিডেন্ট প্রথমে জাতিসংঘকে প্রভাবিত করেন যাতে লিবিয়া কিংবা অন্যত্র (ইরাকে) নারকীয়ভাবে বোমা বর্ষণ করতে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। যুদ্ধ ইস্যুকে কেন্দ্র করে তখন ইসরাইল আমেরিকান প্রশাসনের হুকুমদাতা হয়ে যায় এবং এটা হওয়ার পেছনে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর কাছে ওবামার কাপুরুষিত নতজানু নীতিই কাজ করে এবং জাতিসংঘ তখন উপ-দর্শকের ভূমিকা পালন করে। কংগ্রেস সিনেটররা দিনের শেষে কোনো প্রশ্ন

ব্যতিরেকে আমেরিকার প্রেরিত সেনাসদস্য যাদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে পাঠানো হয় তাদের খরচ মেটায় যা প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার জাতীয় স্বার্থরক্ষায় তা কোনো কাজে আসেনা কিন্তু ইসরাইল, জাতিসংঘ এবং মিসেস ক্লিনটন, মিস রাইস জাতীয় কিছুসংখ্যক রণচন্ডী মহিলাদের ও যুদ্ধবাজ ম্যাককেইন এবং গ্রাহামকে খুশি করে।

সুতরাং আমরা প্রত্যেকে ২০১৪ সালের নভেম্বরে ভোট প্রদান করব কিন্তু আমাদের স্বীকার করা উচিত ওবামা কিংবা রমনি কেউই আমেরিকার স্বার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না। প্রেসিডেন্ট হিসেবে উক্ত দুজনের মধ্যে একজন আমেরিকাকে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঠেলে দেবেন। ওবামা চান এটা ৬ই নভেম্বরের নির্বাচনের পরে হউক কারণ এটা ইসরাইল এবং তাদের সঙ্গিরা চায়। ইরান, অবশ্যই আমেরিকার শক্তিশালী প্রতিপক্ষ নয় কিন্তু ইরান এ অযাচিত যুদ্ধের হিংস্র প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে পারস্য উপসাগরে আমেরিকান তেলবাহী জাহাজ চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা অরোপ করে যা আমেরিকার অর্থনীতির উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করবে।

এতসব ত্যাগ স্বীকার কিসের জন্য? এ অবস্থা হতে লাঘব পেতে আমেরিকা ইরানের উপর অন্যায়ভাবে বিমান আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ছাড়া এ যুদ্ধ জয় অমীমাংসিত থেকে যাবে। আমেরিকার উভয় দলের রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত ইসলামিক বিশ্বের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে।

যখন আমেরিকা ব্রিটিশ রাজত্বের অংশ ছিল, আমেরিকানরা ব্রিটেনের হয়ে যুদ্ধে অংশ নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা ছিলনা। বিগত দুইশত বছরের অধিক সময়ের মধ্যে যখন আমরা ব্রিটেন হতে স্বাধীনতা লাভ করি এরপর হতে আমাদের মানবীয় গুণাবলী, সাধারণজ্ঞান, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব হতে দুরে সরে আসি এবং বিভিন্ন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি বিদেশি কারোর নির্দেশে যা আমেরিকানদের স্বার্থ পরিপন্থী। এছাড়া আমাদের কেবল নেটওয়ার্ক সিস্টেম ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বিপক্ষে যখন নিয়মিত প্রচারাভিযান চালায় তখন ইসরাইলের স্বার্থই সংরক্ষিত হয়। খ্রিস্টান ধর্মের নামে এবং আদর্শ জাতি হিসেবে যখন আমরা শান্তিময় এক পৃথিবীর কথা বলি, কে জানে, সম্ভবত আমরা একদিন ব্রিটিশ রাজ হতে কেটে পড়তে পারি। ব্রিটিশরা প্রায়ই যুদ্ধ করে কিন্তু শুধুমাত্র ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য।"

পুতুল রাষ্ট্র আমেরিকা

আমেরিকান পরাশক্তি ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর পায়ের কাছে নতজানু

-পল ক্রেগ রবার্টস[১৪]

আমেরিকান সরকারের প্রাক্তন সহকারী ট্রেজারী সেক্রেটারি পল ক্রেইগ রবার্টস (খ্রিস্টান) দুঃখ করে বলেছিলেন, "আমেরিকার অবস্থান এখন টয়েলেটে এবং এটা পৃথিবীর সবারই জানা।"

যুক্তরাষ্ট সরকার এবং সংশ্লিষ্টরা মনে করে যে, আমেরিকা পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি কিন্তু কেমন করে এ দেশ নিজেকে পরাশক্তি বলে আখ্যায়িত করবে যখন সরকার এবং সংশ্লিষ্টরা ও চার্চের আধ্যাত্মিক গুরুরা ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর পায়ে নতজানু? মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে এ দেশটির পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় তাতে আমেরিকাকে কীভাবে পরাশক্তিধর হিসেবে বিবেচনা করা যায়? এটা একটি পুতুল সরকার এবং আবারও বলি সাম্প্রতিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় "পরাশক্তিধর আমেরিকা নেতানিয়াহুর পায়ের কাছে নতজানু।"

নেতানিয়াহু যখন পুনরায় ব্যক্ত করেন গাজার অবশিষ্ট ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুকে বধ করবেন এবং ইসরাইলিদের আত্মরক্ষার নামে গাজার অবশিষ্ট ফিলিস্তিনিদের দালানকোঠা সমূলে ধ্বংস করে দিবেন তখন আমেরিকান সিনেট, হোয়াইট হাউস এবং গণমাধ্যম সাথে সাথে নেতানিয়াহুর এ ধরণের অপরাধমূলক অভিপ্রায়কে সম্মতি জানায়।

২০১৫ সালের ১৬ই নভেম্বর আমেরিকান কংগ্রেস, সিনেট এবং আমেরিকা-ইসরাইল পাবলিক এফেয়ার্স কমিটি (আইপেক- ইসরাইলি লবি) কর্তৃক লিখিত প্রস্তাব একবাক্যে সমর্থন করে। আইপেক গর্বের সাথে আমেরিকান প্রশাসনের উপর ইহুদিদের প্রভাবের কথা বলে থাকে। বেন রডস্, হোয়াইট হাউসের ডেপুটি নিরাপত্তা উপদেষ্টা পরদিন ১৭ই নভেম্বর গণমাধ্যমকে বলেন- "ইসরাইল সরকার যা চায় তাতে আমাদের পূর্ণ সম্মতি রয়েছে।"

গাজায় বসবাসরত ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের বসতভিটা হতে উৎখাত করে ইসরাইলে আগত ভিনদেশী শরণার্থীদের স্থায়ী বাসস্থান নির্মানের

---

১৪. former Assistant Secretary of the US Treasury and former associate editor of the Wall Street Journal.

দাবির প্রেক্ষিতে নেতানিয়াহু তাদের সমর্থন করে গাজায় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

হোয়াইট হাউস ইসরাইলি লবির সিদ্ধান্তে সত্ত্বর সাড়া দেয় এবং গাজায় ইসরাইলি সামরিক কর্মকাণ্ডকে স্বীকৃতি দেয়। যখনই বিশ্ববিবেক ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার এবং ন্যায্য বিচার নিয়ে জাতিসংঘে ইসরাইল সরকারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে তখনই আমেরিকা সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইসরাইলের পক্ষ নিয়ে ভেটো প্রয়োগ করে।

১৫০ বছর পূর্বে আমেরিকান লিংকলিন রিপাবলিকানরা রেড-ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যা করেছিল নেতানিয়াহুর ইসরাইলও ঠিক এভাবেই করছে যদিও আন্তর্জাতিকভাবে পশ্চিম তীর ও গাজা ভূ-খণ্ডতে ফিলিস্তিনিদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমেরিকান সরকার ইসরাইলিদের পুতুল হিসেবে জাতিসংঘে বার বার তাদের পক্ষে ভেটো প্রয়োগ করছে।

ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলের নিরাপত্তার হুমকিস্বরূপ এটা ভাবা যেমন অসম্ভব তেমনি আমেরিকার বিরুদ্ধে হুমকি হিসেবে আফগানিস্তান, ইরাক, লিবিয়া, সোমালিয়া, পাকিস্তান এবং ইরানকেও ভাবা যায়না।

১৯শে নভেম্বও ২০১৫ সালে গাজায় ইসরাইলি যুদ্ধাপরাধীদেরকে দোষমুক্ত করতে ওবামা বললেন- "পৃথিবীর কোনো দেশই সহ্য করবেনা যখন সে দেশের মানুষের উপর সীমান্ত হতে শত্রুরা মিসাইল আক্রমণ করে।" কিন্তু একথা সত্য যে যুদ্ধাপরাধী ওবামার আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তান, ইয়েমেন, লিবিয়া, সোমালিয়া এবং সিরিয়াসহ অসংখ্য দেশ অন্যায়ভাবে আমেরিকার মিসাইল বর্ষণ সহ্য করেছে। সম্ভবতঃ ইরান ওবামার পরবর্তী লক্ষ্য (ব্যক্ত থাকে যে, ইরান আক্রমণ করার ব্যাপারে ইসরাইল আমেরিকাকে উদ্বোদ্ধ করে আসছে)।

ওয়ারশোতে জার্মানির ইহুদি নিধনের নৃশংসতার কথা ইতিহাসস্বীকৃত। ঐ ধরনের ঘটনায় এবারে প্রধমবারের মত ইহুদিরা সম্ভবত হত্যাযজ্ঞের শিকার না হয়ে শিকারী হবে। ইসরাইলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইলি ইসায়ী উচ্চারণ করেছেন- "গাজা ভূখণ্ডকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিতে যেতে হবে।"

মিঃ প্রেসিডেন্ট, প্লিজ টেল আস দ্য হোল ট্রুথ

-আরনেষ্ট ডিউক[১৫]

আমেরিকার নের্তৃত্বকে আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও সমাজ সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের চোখে দেখে এবং আমেরিকাকে হেয় প্রতিপন্ন করে এর কারণ আমাদের নের্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিথ্যে বলেন এবং অন্যের কথায় চলেন যার সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন অনেক সাক্ষাৎকারে বলেছেন- "আমেরিকাকে তিনি ও তার দল ঘৃণা করেন এজন্যে যে, আমেরিকা ইসরাইলের সকল ঘৃণ্য ও অমানবিক কাজকে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে।"

একথা সত্য যে, প্রায় সাত লক্ষ ফিলিস্তিনি জনগণকে ইসরাইল তাদের ভিটেমাটি হতে উৎখাত করেছে, ইসরাইলি জেলে ৫০০-৬০০ ফিলিস্তিনি বন্দীদেরকে তারা প্রতিনিয়ত অমানবিক নির্যাতন করে থাকে, লেবাননে এ পর্যন্ত শিশু ও নারীসহ প্রায় চল্লিশহাজার নাগরিককে ইসরাইলি সেনাবাহিনী হত্যা করেছে, এরিয়েল শ্যারনের নের্তৃত্বে লেবাননের শাবরা ও শাতিলা ফিলিস্তিনি ক্যাম্পে ইসরাইলি ও তাদের দোসর ফ্যালানঞ্জিস্ট মিলিশিয়ারা দুই হাজারের উপরে নিরস্ত্র শিশু ও নারীসহ ফিলিস্তিনি জনতাকে হত্যা করেছে, ইসরাইলের কথায় ইরাককে আমেরিকা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যা দেয় এবং ইরাক যুদ্ধে প্রায় পাঁচ লক্ষ শিশু ও নারীদেরকে হত্যা করা হয়।

৯/১১ তে টুইন টাওয়ার আক্রমণের পেছনে ওসামা বিন লাদেনের হাত রয়েছে এমন অজুহাতে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই আমেরিকা আফগানিস্তানে আক্রমণ চালিয়ে যে মানবিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এ সমস্ত কারণে আজ আমেরিকা বিশ্বসভায় অনেকটা শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস হারিয়েছে।

মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনাকে তা পর্যালোচনা করতে হবে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমেরিকার জনগনের স্বার্থকে আপনাকে বিবেচনায় আনতে হবে, ইসরাইলের স্বার্থকে নয়। আমেরিকা পৃথিবীর বৃহত্তর শক্তিধর দেশ এবং আমাদেরকে অন্যান্য দেশের কাছে আস্থাভাজন হতে হবে, আমেরিকা এবং এর জনগনকে কেউ হিংসা বা ঘৃণা করুক এটা অবশ্যই

---

১৫. আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্সিয়েল পদপ্রার্থী ও লুসিয়ানা অংগরাজ্যের গভর্ণর ডেভিড আরনেষ্ট ডিউক প্রেসিডেন্ট বুশকে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে একটি চিঠি লিখেছিলেন, Please: Tell Us the Whole Truth! শিরোনামে।

আমাদের কাম্য নয়। তাই আমি আশা করি আপনি ইহুদি স্বার্থরক্ষায় কাজ করবেন না। আমেরিকা আপনার নের্তৃত্বে নিজের গৌরব ফিরে পাক।"

ইহুদি লেখক জনাথন সিলভারম্যান-এর ২০১১ সালের ৪ঠা এপ্রিল Rense.com-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে আমেরিকায় বসবাসরত ইহুদি সম্প্রদায় কীভাবে আমেরিকাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এ ব্যাপারে লিখেছেন, "১৯২৯ সালে জার্মানির রাষ্ট্রব্যবস্থা যেভাবে ইহুদিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ২০১১-১২ সালের আমেরিকা ঠিক সেভাবেই ইহুদি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।"

১৯২০ সালের জার্মান খ্যাতিমান ঐতিহাসিক স্যার আর্থার ব্রায়েন্ট তাঁর প্রকাশিত এক নিবন্ধে লিখেছিলেন জার্মানির মোট জনসংখ্যার মাত্র ১% ইহুদি থাকা সত্ত্বেও জার্মান সরকারের ২৫% সরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ ইহুদিদের দখলে ছিল। লৌহ ও অন্যান্য ধাতব শিল্পে শতকরা ৫০%, কৃষিভিত্তিক শিল্পে ২২%, বস্ত্রশিল্পে ৩৯% এবং বার্লিন ষ্টক-একচেঞ্জে ৫০% এর অধিক সংখ্যক ইহুদি মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হত। বার্লিনের ২৯টি থিয়েটার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৩টির পরিচালক ছিল ইহুদি। পত্রিকা ও বই প্রকাশনা এবং চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় ৯০% ইহুদি মালিকাধীন ছিল। ইহুদি প্রচারণা সংস্থা এডলফ হিটলার এবং তার সহযোগী নাজি সদস্যদেরকে ইতিহাসের জঘন্যতম মানুষ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এবং পৃথিবীর সভ্যসমাজ ইহুদিদের এ প্রচারণা মেনে নিয়েছে।

হিটলার তার লেখনীতে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন যে, "জার্মানিতে বসবাসরত ইহুদিরা জার্মানির সাধারণ নাগরিকদেরকে নিজেদের দাস হিসেবে গণ্য করে আসছিল, জার্মান নারীদেরকে ইহুদিরা ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করত- যা জার্মান জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক।"

এ সমস্ত সামাজিক নিষ্পেষণ হতে জার্মানবাসীদেরকে মুক্ত করার লক্ষ্যে হিটলারবাহিনী সরাসরি ইহুদিবিদ্ধেষী হয়ে উঠেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে হিটলারবাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদি বন্দী সেনাসদস্য ও সাধারণ জনতাকে নির্বিবাদে হত্যা করেছিল। তবে ষাট লক্ষ ইহুদি নিধন সম্মন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ষাট লক্ষ ইহুদি নিধনের প্রচারণা চালিয়ে ইহুদি রাজনীতিবিদরা বিশ্ববাসীর সহমর্মিতাবোধকে নিজেদের পক্ষে নিতে চেষ্টা করেছে বলে অনেক ঐতিহাসিকদের মতামত।

যেকোনো মানবতাবিরোধী অপরাধকে বিশ্ববিবেক মেনে নেয় না বলে হিটলারকে ইতিহাসের এক জঘন্যতম রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে তবে অনেক ঐতিহাসিকরা মনে করেন হিটলারকে ইহুদি গণমাধ্যম এবং প্রোপাগান্ডা মেশিন বিশ্বদরবারে এক জঘন্যতম স্বৈরশাসক হিসেবে পরিগণিত করেছে কিন্তু হিটলার ততটুকু খারাপ ছিলেন না এবং জার্মানিদের হৃদয়ে তিনি এক বিশেষ আসনে আসীন রয়েছেন।

জার্মান ঐতিহাসিক অর্থার ব্রাইন্ট তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন- ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির ইহুদি প্রচারণা প্রতিষ্ঠানগুলো জার্মানির আদর্শ ও কৃষ্টিকে পৃথিবীর কাছে হেয়ভাবে প্রতিপন্ন করেছে। যখন সাধারণ জার্মানবাসীরা ১ম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে অভূক্ত, অর্ধাহার এবং অনাহারে দিন কাটিয়েছে ঠিক তখন জার্মানিতে বসবাসরত ইহুদি ধনী ব্যবসায়ীরা নিজেদের আরাম আয়েশে অধিকতর সক্রিয় ছিল।

বর্তমান আমেরিকায় বসবাসরত ২% ইহুদি জনগোষ্ঠি আমেরিকার মোট সম্পদের ৬০%-এর মালিক। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর হতে আমেরিকার সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছে ইহুদিরা যারা বিশ্বজুড়ে ইহুদি স্বার্থে আমেরিকান প্রশাসনকে দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

আমেরিকার 'জিএসপি' সুবিধার সুফল ও কুফলসমূহ

তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে আমেরিকা ১৯৭৬ সালের ১লা জানুয়ারিতে (১৯৭৪ সালে গঠিত ট্রেড অ্যাক্ট অনুযায়ী) তৃতীয় বিশ্বের ১২৩ টি দেশের জন্য এ GSP (The U.S. Generalized System of Preferences) সুবিধা অরোপ করে। এতে তৃতীয় বিশ্ব হতে আমদানীকৃত প্রায় ৫,০০০ পণ্যের উপর আমদানী শুল্ক রহিত করার অনুমোদন দেওয়া হয়। জিএসপি সুবিধা দেওয়ার পেছনে আমেরিকার রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত। জিএসপি সুবিধার নেপথ্যে তৃতীয় বিশ্বের লাগাম টেনে ধরাও এর অন্যতম লক্ষ। "কথা না শুনলে জিএসপি সুবিধা বাতিল করে দেওয়া হবে"- বড় বড় চোখের নীরব শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করতে তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ সাহস পান না। জাতিসংঘে গৃহীত আমেরিকার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে যাওয়ার পেছনের রহস্য এটাই। তাছাড়া ক্ষমতার লড়াইয়ে আমেরিকার সমর্থন পাওয়া তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক নেতাদের রক্তমাংসে একধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করে।

আমেরিকার অভিবাসন নীতি কীভাবে বিশ্বনেতাদেরকে প্রভাবিত করছে

আমেরিকার অভিবাসন নীতিমালা সূদুরপ্রসারী। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এ নীতিমালা বিভিন্ন চিন্তাবিদ এবং রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে প্রবর্তন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই গ্রেট ব্রিটেন হতে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ব্রিটেন ১৭৮৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর এর স্বীকৃতি প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন মোট ৯৮ লক্ষ ৩ হাজার বর্গ কিলোমিটার। ১৭৮৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর এর শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকসংখ্যা ৩২৮,২৩৯,৫২৩ (বত্রিশ কোটি বিরাশি লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত তেইশ)

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কানাডার ভূ-খণ্ডের পরই আমেরিকার স্থান। ২০১৪ সালের জরিপে এ দেশের সম্পদের পরিমাণ ২১.৪৩৯ ট্রিলিয়ন আমেরিকান ডলার। গড়ে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৬৫,১১২ আমেরিকান ডলার। ছোটবড় ৫০টি অঙ্গরাজ্য মিলে ইউনাইটেড স্টেট অব আমেরিকা গঠিত।

বিশ্বের প্রথম পরমাণু ক্ষমতাধর শক্তি হিসেবে আমেরিকা আজ বিশ্বের প্রধান পরাশক্তি হিসেবে পরিচিত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ক্ষমতাধর আমেরিকার কাছে বিশ্ব নতজানু। ১৭৭৬ সালের ২রা জানুয়ারি জর্জ ওয়াশিংটনের শাসনামলে তারই সহকর্মী 'স্টিফেন ময়টান' তার এক চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নামকরণ 'ইউনাইটেড স্টেটস্ অব আমেরিকা' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন সেই হতে এ নামে বিশ্বের কাছে আমেরিকা পরিচিত হতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৭৭৬ সালের ৬ এপ্রিল 'দ্য ভার্জিনিয়া গেজেট' পত্রিকায় একজন লেখক আমেরিকার নাম 'ইউনাইটেড স্টেটস্ অব আমেরিকা' হিসেবে উল্লেখ করেন।

ইতিপূর্বে ১৫০৭ সালে জার্মান মানচিত্রকর 'মার্টিন ওয়াল্ডসিমুলার' পৃথিবীর একটি মানচিত্র অংকন করেন সেখানে তিনি পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধের নামকরণ করেন 'আমেরিকা'। এভাবেই একসময় 'আমেরিকা' সংক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্র (ইউ এস) কিংবা বৃহত্তর আকারে 'ইউনাইটেড স্টেটস্ অব আমেরিকা' হিসেবে একসময় পৃথিবীতে পরিচিতি পায়।

আমেরিকায় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যসমূহ স্থানীয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির দ্বারা শাসিত হয়ে আসছিল হাজার হাজার বছর। যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি, বিবাদ

সবসময় এ সমস্ত জাতিগোষ্ঠির ছিল নিত্যসঙ্গী। অসভ্য, বর্বরোচিত ছিল এদের সমাজব্যবস্থা। ব্রিটিশ, ফরাসী ও স্প্যানিশরা বিভিন্ন সময় আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যসমূহ দখলে নিয়ে শাসন করে। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের সূত্র ধরে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরাই আমেরিকার সিংহভাগ দখলে রাখতে সমর্থ হয় কিন্তু ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে এক নতুন আমেরিকার জন্ম হয়।

উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠির মধ্যে দাসপ্রথা চালু ছিল। সমাজব্যবস্থায় সাদা-কালো জাতিগোষ্ঠির মধ্যে বৈষম্য একসময় চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়। ফলশ্রুতিতে গৃহযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আমেরিকার ছয় লক্ষ আঠারো হাজার সেনাসদস্য ও সাধারণ জনগণ নিহত হয়। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং বৈষম্য নিরসনে আব্রাহাম লিংকলিন, জর্জ ওয়াশিংটন এবং অন্যান্য বিজ্ঞ রাজনীতিবিদরা একটি অবৈষম্যমূলক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন যার মাধ্যমে আমেরিকার মতো বিশাল একটি দেশের ৫০টি অঙ্গরাজ্যসমূহ একই সূতায় গ্রন্থিত হয়ে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে অদ্যবধি দাঁড়িয়ে আছে।

আমেরিকার অভিভাসন প্রকল্পে প্রতিবছর লটারির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদেরকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতারা নিজেদের ছেলেমেয়ে এবং আত্মীয়স্বজনদের প্রেরণ করে থাকেন। তাছাড়া আমেরিকার বিভিন্ন ব্যাংকে নিরাপত্তাজনিত কারণে রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই নিজেদের অসদোপায়ে অর্জিত সম্পদ স্থানান্তরিত করে থাকেন।

এ সমস্ত বিভিন্ন দুর্বলতার কারণে রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের দেশে আমেরিকার রাজনৈতিক প্রভাব এবং জাতিসংঘে আমেরিকার মোড়লিপনাকে এড়িয়ে চলতে পারেন না। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশের লোকজন আমেরিকাতে অভিভাসনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব নিয়ে বসবাস করছে। এদের মধ্যে উচ্চবিত্ত, আশ্রয়গ্রহণকারী রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষিতরা নাগরিকত্ব অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ কোন না কোনভাবে আমেরিকান টেকনোলজি, যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধবিমান এবং অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রসামগ্রী ব্যবহার করছে যে কারণে পৃথিবীর ছোটবড় সকল দেশই আমেরিকার রক্ষচক্ষুকে উপেক্ষা করতে পারে না।

বিশ্বজুড়ে রাশিয়ার KGB/FSD এর ভূমিকা

১ম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই জার্মানি, হাঙ্গেরি, ইউক্রেন, আমেরিকা, ক্রিমিয়া, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড ইত্যাদি দেশসমূহ হতে প্রভাবশালী ইহুদিরা রাশিয়ার মস্কোসহ বিভিন্ন অঞ্চলে জড়ো হতে থাকে। রাশিয়ান সাম্রাজ্য তখন প্রতিষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হয়ে আসছিল ক্রিস্টান অর্থোডক্স শেষ সম্রাট নিকোলাস-২ (আলেক্সজানড্রভিচ রোমানভ) এর অধীনে। ১লা নভেম্বর, ১৮৯৪ থেকে শুরু করে ১ মার্চ, ১৯১৭ ইং পর্যন্ত যিনি রাশিয়া শাসন করেছেন। রুশ সম্রাটদেরকে 'জার' নামে অভিহিত করা হত। নিকোলাস-২ বলশেভিক বিপ্লবের পর বলশেভিক কমিউনিস্ট পার্টি শাসনভার গ্রহণ করলে ১৯১৮ সালে হত্যা করা হয়।

ঐতিহাসিকদের মতে গ্রোচি ইভান হতে শুরু করে বরিশ গোড়ুনভ, মাইকেল-১, পিটার দি গ্রেট, এলিজাবেথ অব রাশিয়া, ক্যাথেরিন দি গ্রেট এবং নিকোলাস-২ পর্যন্ত প্রভাবশালী দশজন ক্যাথলিক খ্রিস্টান জার সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী রুশ সম্রাজ্য শাসন করেছেন। ৮৬২ সালে কিং রুরিকের মাধ্যমে আধুনিক রুশ সম্রাজ্যের বিস্তারলাভ ঘটে। রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার বেশিরভাগ ক্যাথলিক খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসী। ক্রমানুসারে মুসলিম, বৌদ্ধ, ইহুদি এবং অন্যান্য ধর্মের মুষ্টিমেয় অনুসারী নিয়ে বিরাট এই রাশিয়া ভূখণ্ড পৃথিবীর অন্যতম পরাশক্তি।

ক্যাথলিক খ্রিস্টান জারদের শাসনামলে ইহুদি জনবসতি গড়ে উঠার ব্যাপারে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ছিল। এজন্য ইহুদিরা জারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী বলশেভিক পার্টিতে ১৯,৫৬৪ জন প্রভাবশালী ইহুদির মধ্যে ১৯২০ সালে সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটিতে ৪১৭ জন প্রভাবশালী মেম্বার ছিল কিন্তু জোসেফ স্টালিন ১৯৩৫-৪০ সালের মধ্যে প্রভাবশালী ইহুদি সদস্যদের মধ্য হতে সরকার, রাজনীতি, নিরাপত্তা এবং সামরিক বাহিনী হতে ইহুদিদের বাদ দিয়ে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন।

১৯২০ সালে জার্মানির শাসক এডলফ হিটলার ঘোষণা করেন বলশেভিক সংগঠন ইহুদি নেতা ভ্লাদিমির লেলিন, কার্ল রাদেক, জুলিয়াস মারটভ, ইমা গোল্ডম্যান, ট্রটোস্কি ও তাদের সহযোগী ইহুদি নের্তৃবৃন্দ পরিচালিত কমিউনিস্ট কট্টরপন্থীরা জার্মানভিত্তিক নাজি মতবাদকে ঘৃণা করে

এবং নাজিদের বিরুদ্ধে ইহুদিরা নানারকম ষড়যন্ত্র করে আসছে। জার্মান নাগরিক সমাজে বলশেভিক সংগঠন মানে ইহুদি পরিচালিত সংগঠন মনে করা হতো তাই এ সংগঠনের বিরুদ্ধে ক্রমেই হিংসার জন্ম দেয়। ইহুদি ষড়যন্ত্রের প্রতি প্রবল হিংসা হিটলারকে ইহুদি নিধনে শক্তি যোগায় এবং অবশেষে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে।

১৯৫৪ সালের ১৩ই মার্চ রাশিয়ান ফেডারেশন কর্তৃক 'কমিটি ফর স্টেট সিকিউরিটি' বা কেজিবি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯১ সালের ৬ নভেম্বর রাশিয়ান ফেডারেশন ভেঙ্গে যাওয়ার পর এফএসডি নামকরণে রুশ সরকার এ প্রতিষ্ঠানকে ঢেলে সাজায়। মস্কোতে এর হেডকোয়ার্টার অবস্থিত। ষোলটি ডিরেক্টোরেট এর সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ভাগাভাগি করে নিয়েছে। প্রায় ৪০ হাজার ইউনিফর্মধারী সিকিউরিটি গার্ড রাশিয়ার অর্থনৈতিক এবং সামরিক স্থাপনাসমূহ বহিশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষার নিমিত্তে নিয়োজিত রয়েছে। আমিরিকার সিআইএ এবং রাশিয়ার কেজিবি/এফএসডি প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমানে সমান অবস্থানে রয়েছে। সিআইএ-র মতো কেজিবি/এফএসডি সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং তাদের স্বার্থের পরিপন্থী এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পৃথিবী হতে সরিয়ে দিচ্ছে। মহাকাশ বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় কিংবা পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে রাশিয়া আমেরিকা হতে অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে, আবার অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়েও আছে। আমেরিকার তুলনায় বহির্বিশ্বে রাশিয়া ততটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কারণ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশসমূহ সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশ্বাস করে না।

কমিউনিষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রকে কায়েম করতে অসংখ্য হত্যাকাণ্ড ও গুমের ঘটনা ঘটেছে। সরকারী বাহিনী হিসেবে কেজিবি এ সমস্ত হত্যাকাণ্ড ও গুমের ঘটনার সাথে জড়িত। কমিউনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে রাশিয়া অভ্যন্তরে যারাই মুখ খুলেছে তাদেরকেই এ পৃথিবী হতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা কারাগারের অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কেজিবি তাদের স্বার্থে ব্যঘাত সৃষ্টিকারীদেরকে নির্বিবাদে হত্যা করেছে। এ সমস্ত হত্যাকাণ্ড চকোলেট বোমা, বিষাক্ত সায়ানাইড গ্যাস, বিষাক্ত কফি, সিগারেট, লেসার গান, কার বোমা, রেডিয়েশন, বিষাক্ত লেথেল ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে ঘটানো হয়েছে। এমনই একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আলেকজান্ডার লিটভিনেনকো যিনি রাশিয়ার আভ্যন্তরিণ সিকিউরিটি ফোর্স এফএসডি-র একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা। ২০০৬ সালের নভেম্বরে কর্তব্যরত দুইজন রাশিয়ান কেজিবি অফিসারদের সাথে লন্ডনের একটি হোটেলের কফি শপে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সম্মন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেন। এর ফলসরূপ একঘন্টার মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত তার বমি, ডায়ারিয়া এবং চুল খসে পড়তে থাকে এবং তিনি হাসপাতালেই মৃত্যুবরণ করেন।

পোস্টমর্টেম রিপোর্টে তার শরীরে নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন (পলোনিয়াম-২১০) ধরা পড়ে যার কারণে তার মৃত্যু ঘটে। এ ধরনের রেডিয়েশনজনিত অসুস্থতায় কোনো ঔষধই কার্যকর নয়। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, তার কফির সাথে পলোনিয়াম-২১০ মেশানো হয়েছিল। রাশিয়ার সরকার নিয়ে রাশিয়ান নাগরিকের কটূ মন্তব্য করা নিষেধ। একজন প্রাক্তন গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে আলেকজান্ডার রাশিয়ান সরকারের আভ্যন্তরিণ নিরাপত্তা বিভাগের তথ্য পাচারের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করার জন্য হয়তো এ ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সরকারের বিরুদ্ধে যে যখনই মুখ খুলেছে তার পরিণতি হয়েছে মৃত্যু কিংবা জেল-হাজতের অন্ধকার সেল।

কেজিবি এবং সিআইএ একে অপরের শত্রু। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজ দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনেক সময় একে অপরের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় কেজিবি জার্মান গোয়েন্দা সংস্থার অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে অনেক অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। আমেরিকার সাথে ঠান্ডা যুদ্ধ চলাকালীন এ সংস্থা অসংখ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।

রাশিয়ার বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যম ইহুদি পরিচালিত

রাশিয়ার নামকরা ইহুদি মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো মোস্ট ব্যাংক, আলফা ব্যাংক, রসিস্কি ক্রেডিট ব্যাংক, স্টলিন্সি ব্যাংক, ইনকম ব্যাংক, ব্যাংক ম্যানাটেপ। মোস্ট ব্যাংকের মালিক ভ্লাদিমির গোসিনিস্কি রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিশ ইয়ালসিনকে প্রেসিডেন্টশিয়াল নির্বাচনে গোসিনিস্কি এবং বরিশ বেরিজোভিস্কি অর্থের যোগান দেন। উভয়েই ইহুদি ধর্মাবলম্বী। গোসিনিস্কি রাশিয়ার ইহুদি কংগ্রেসের সভাপতি এবং বিশ্ব ইহুদি কংগ্রেসের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

রাশিয়ার মিডিয়া জগতে ইহুদিদের ভূমিকা

ভ্লাদিমির গোসিনিস্কি : NTV, Echo Radio ষ্টেশন, সাপ্তাহিক বহুল প্রকাশিত ম্যাগাজিন Itogi, St. Petersburg Company, Russian Video এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক।

আলেকজান্ডার পলোভেটস্ : রাশিয়ান ভাষায় নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত Panorama পত্রিকার মালিক।

আলেক্সি-২ : Segodnya (Newspaper) and NTV-Plus এর মালিক।

রাশিয়াকে যে ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ করছে

Gusinsky, Berezovsky, Boris Hait, Mikhail Friedman, Vladimir Vinogradov, Vladimir Potanin, Mikhail Khodorkovsky, Alexander Smolensky, Michail Khodorovsky and Pyotr Aven.

বরিশ বেরিজোভাস্কি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসার সাথে জড়িত। প্রাকৃতিক গ্যাস ও তৈল অনুসন্ধান, উত্তোলন ও বিক্রয় করে বেরিজোভাস্কি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অর্থ সম্পদের মালিক। অন্যদিকে ব্যাংক, মিডিয়া, মস্কো অটোমোবাইলস্ এবং রাশিয়ান জাতীয় বিমান কেরিয়ার 'এরোফ্লটের' শেয়ার কিনে অগুণতি সম্পদের মালিক হয়েছেন।তিনি বর্তমানে ক্রেমলিন সিকিউরিটি কাউন্সিলের একজন গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার। তাঁর মালিকানাধীন ORT TV, Nezavisimaya Gazeta (Daily), Ogonyok (Megazine), Transero (Airlines), Yuksi (Oil Co.), TV-6, Kommersant (Daily) উল্লেখযোগ্য।

বেরিজোভাস্কি প্রকাশ্যে বলেছেন যে, তিনি এবং অন্যান্য ধনকুবেরের মধ্যে ভ্লাদিমির গোসিনিস্কি, খদোরোভস্কি, অ্যাভেন, ফ্রেইডম্যান, স্মোলেস্কি ও পোতানিয়ান রাশিয়ার অর্ধেক সম্পদের মালিক।

পূর্বোক্ত দশজন ইহুদি ধনকুবের রাশিয়ার সামরিক সরঞ্জাম, মূল্যবান ধাতুসামগ্রী, গ্যাস তেলসহ অন্যান্য খনিজদ্রব্যের ইন্ডাষ্ট্রি, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, ভিসা ব্যাংক কার্ড নেটওয়ার্ক, পেপার এবং ফুড প্রসেসিং ইন্ডাষ্ট্রি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন যা রাশিয়ার মোট সম্পদের তিনচতুর্থাংশ।

ইয়েভগেনি প্রিমাকভ : ১৯৯৮ সালে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন যিনি একজন ইহুদি। উক্ত সময়ে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন।

সার্জিয়ো ও ক্রিয়েনকো তারা উভয়ে ইহুদি ধর্মাবলম্বী। লন্ডন টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় "Grigori Yavlinsky" (liberal Yabloko Party) Ges Vladimir Zhirnovsky, আলট্রা ন্যাশনালিষ্ট এলডিপিআর (Ultra-nationalist LDPR) এর প্রভাবশালী নেতা দু'জনই ইহুদি বংশোদ্ভূত। তাছাড়া তখনকার রাশিয়ার অর্থমন্ত্রী Alexander Livshitz ও একজন ইহুদি।

ইতিপূর্বে তিনি রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ও কার্যভার পালন করেন। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি ইউনাইটেড রাশিয়া পলিটিক্যাল পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন। দীর্ঘ ষোল বছর তিনি লে. কর্নেল হিসেবে প্রাক্তন সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা KGB-র অধীনে কাজ করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষোক্ত ইহুদি প্রেসিডেন্ট মাইকেল গর্বাচেভ-এর আমলে ১৯৯১ সালে রাশিয়ান ফেডারেশন ভেঙে যায়।কমিউনিজিয়ম হতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত হয়। রাশিয়া, জর্জিয়া, ইউক্রেন, বেলারশ, মলডোভা, ইস্তোনিয়া, লাটাভিয়া, লিথুয়ানিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান- এই পনেরোটি স্টেট মিলে কমিউনিষ্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। এ ফেডারেশন ভেঙ্গে যাওয়ার পেছনে যে কারণটি কাজ করেছিল তা হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পদ কিছু মাফিয়া ইহুদি ধনকুবেরের কাছে চলে যাওয়া।

প্রচুর ধনসম্পদের মালিক ইহুদি মাফিয়ারা নিজেদের বিত্তবৈভব সামলে নেওয়ার তাড়নায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজন মনে করে। কমিউনিস্ট দেশে বুর্জোয়াশ্রেণি আদর্শ বিবর্জিত হওয়ায় এ ধরনের একটি পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। প্রেসিডেন্ট বরিশ ইয়ালসিন, মাইকেল গর্বাচেভ এবং তাদের সহযোগী ধনুকুবের আরও অনেকের বিরুদ্ধে অর্থসম্পদ বে-আইনিভাবে কুক্ষিগত করার অভিযোগ উঠায় নিজেদের অবস্থান মজবুত করার লক্ষে দেশকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উন্নীত করার প্রয়াস চালায়। পরবর্তীতে ইউনিয়নের অন্যান্য দেশসমূহ নিজেদের সংবিধান অনুসারে দেশ পরিচালনা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে এবং মূল রাশিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

১৯৯৫ সালের এক জরিপে দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট সম্পদের তিনচতুর্থাংশের মালিক ছিল ইহুদি সম্প্রদায়ভূক্ত লোকেরা।

তাছাড়া রাজনৈতিক নেতা, মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের মালিক ও সরকারী মহলে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে শতকরা ৮৪ জনই ছিল ইহুদি[১৬]।

ইহুদি প্রেসিডেন্ট বরিশ ইয়ালসিন-এর সময় ইহুদি মাফিয়া ধনকুবের কর্তৃক সম্পদ কুক্ষিগত করার অসম প্রতিযোগিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং আহরিত সম্পদ সরানোর জন্য একসময়ের বলশেভিক আন্দোলনের পুরোধা ইহুদি কমিউনিস্টবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুঁজিবাদী রূপ দিতে তৎপর হয়ে উঠে।

সম্পদ কুক্ষিগত করার এ অশুভ প্রয়াস সাধারণ মানুষের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠে। ধনুকুবেররা নিজেদের অগণিত সম্পদ লুকিয়ে আমেরিকাসহ বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশসমূহে পাচার করতে থাকে। এমনকি সম্পদ কুক্ষিগত করতে গিয়ে তাদের অসংখ্য প্রতিপক্ষকে নির্দ্বিধায় খুন করার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ মানুষ দিনে দিনে গরীব হতে থাকে।

সামাজিক এ বৈষম্যের কারণে অতিষ্ট হয়ে ৭ই নভেম্বর, ১৯৯০ সালে আলেকজান্ডার সমনভ নামে এক শ্রমিক ক্রেমলিন রেডস্কোয়ারের সামনে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিখায়েল গর্বাচেভকে হত্যার চেষ্টা করে বিফল হয়।

গর্বাচেভ নিজের অবস্থানের উন্নতিকল্পে এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের লক্ষ্যে ১৯৯১ সালের আগস্ট হতে অক্টোবর পর্যন্ত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি-কে সোভিয়েত সম্পদ বহির্বিশ্বে পাচারের দায়ে প্রায় দুইহাজার দূর্নীতিবাজদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের পর পর ১৭৪৬ জন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের রহস্যজনক মৃত্যু হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ মানুষের মাথাপিছু আয় যখন কমে যায় ঠিক তখন ফুলে ফেঁপে উঠে ইহুদি ব্যবসায়ীমহল। মস্কো স্টক একচেঞ্জ, বিভিন্ন তেল কোম্পানি, অস্ত্র কারখানা, জাহাজ শিল্প, ইলেকট্রনিকস্ মিডিয়া, এয়ারলাইনস্, আই টি সেক্টর, ক্যাবল কোম্পানি, টেলিকম, ক্যাবল অপারেটর, টিভি, রেডিও, গণমাধ্যম ইত্যাদি খাত পর্যায়ক্রমে ইহুদি ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যায়।

১৯১৭ সালে রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের পুরোধা ইহুদি ধর্মাবলম্বী লেনিন ও ট্রটোস্কি নের্তৃত্ব দেন। ইহুদি ধনকুবের সুইস ব্যাংকার এসবার্গ 'রেড আমি সংগঠনের জন্য প্রচুর অর্থ দেন এবং ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এ অর্থপ্রবাহ অটুট থাকে। সাথে সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন জুড়ে তার ব্যবসার

১৬. রেডিও ইসলাম, সুইডেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ইতিহাস

প্রসার ঘটান। বলশেভিক কম্যুনিষ্ট সংগঠনকে শক্তিশালী করতে ইহুদি মালিকানাধীন আমেরিকান 'অক্সিডেন্টাল অয়েল কোম্পানি' নিজেদের স্বার্থে অর্থের যোগান দেয় যাতে কোম্পানিটির ১৬০০ মাইলব্যাপী কেমিক্যাল পাইপলাইন স্থাপন করতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। স্টালিনের শাসনামলে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক পরাক্রমশালী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৯০ সালে মিখায়েল গর্বাচেভ নোবেল শান্তিপদক পান। নোবেল পুরস্কার অর্জনের পেছনে আমেরিকা ও ইসরাইলের প্রভাব যথেষ্ট কাজ করেছিল। তাঁর বিরুদ্ধে রাশিয়ার অর্থসম্পদ লুটের এবং আমেরিকার কাছ হতে প্রচুর টাকা ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক কাঠামো পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক কাঠামো দেওয়ার বিপরীতে আমেরিকায় তাকে আশ্রয়দান এবং কালিফর্নিয়ার উত্তম পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ।

গর্বাচেভ রাশিয়ার ধনভান্ডার হতে প্রায় ২০০০ টন স্বর্ণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের প্রচুর টাকা সরিয়ে নিয়ে একটি মাফিয়া গ্যাং তৈরি করার খবরও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটিশ প্রফেসর 'ইগর পানারিন' তার এক নিবন্ধে লিখেন যে, রাশিয়ার সমাজতন্ত্র পতনের পেছনে আমেরিকায় বসবাসরত ব্রিটিশ গোয়েন্দা রাশিয়ান নাগরিক Zbigniew Brzezinski-র অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

বিল ক্লিনটন বলেছিলেন- গর্বাচেভের শাসনকালীন সময়ে বন্ধুত্বের নিদর্শনসরূপ সোভিয়েত রাশিয়া আমাদেরকে দিয়েছে বিশ হাজার টন কপার, পঞ্চাশ হাজার টন এল্যুমিনিয়াম, দুইহাজার টন কেসিয়াম, বেরিলিয়াম, ষ্ট্রনটিয়াম এবং আরও অনেককিছু। কোন গুলি খরচ ও সেনাসদস্য হারানো ব্যতিরেকে গর্বাচেভ এবং তাঁর সহযোগিদের সাহায্যে আমেরিকা তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত রাশিয়া, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ঠান্ডা স্নায়ুযুদ্ধ এড়াতে সক্ষম হয়েছে।

ইহুদি প্রেসিডেন্ট মিখায়েল গর্বাচেভ এবং বরিশ ইয়ালসিন-এর শাসনামলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশে প্রায় এক কোটি লোক অর্ধাহারে, অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ইহুদি সমাজপতি, ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা নিজেদেরকে ইহুদি হিসেবে পরিচয় দিতে অনীহা প্রকাশ করে। এর পেছনের

কারণ হল পৃথিবীতে ইহুদিদের সংখ্যা অতি নগন্য। মানব সভ্যতার শুরু হতে তাদের ষড়যন্ত্র, ধনসম্পদের প্রতি লিপ্সা পৃথিবীতে কলহ এবং বিবদমান সংঘাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

সামাজিক বৈষম্য এবং জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, দ্বন্ধ, বিবাদ-এর পেছনে ইহুদিদের কলকাঠি নাড়ার ইতিহাস সর্বজনবিদিত। ২৫০ খ্রিষ্টাব্দ হতে শুরু করে পরবর্তী দুইহাজার বছরে ইহুদিরা মোট ১১৪ বার বিভিন্ন দেশ হতে বিতাড়িত হয়েছে। প্রথম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদি জাতির জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ছিল অবর্ণনীয় যদিও তারা জ্ঞানবিজ্ঞানে, সম্পদে এবং বুদ্ধিতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়।

তারা ঈশ্বরের পছন্দনীয় জাতি হিসেবে পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের শাসন করবে, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠি তাদের তাবেদারী করবে। এ পৃথিবীর সম্পদের প্রকৃত মালিক তারাই- ইহুদি জাতির ধ্যানে এবং মননে এ ধারণাই পরিস্ফুটিত।

ব্রিটেনের সিক্রেট ইনটেলিজেন্স সার্ভিসেস
সিস/এমআইসিক্স (SIS/MI6)

১৯০৯ সালে সিক্রেট ইনটেলিজেন্স সার্ভিসেস (SIS) অথবা মিলিটারি ইনটেলিজেন্স সেকশন এমআইসিক্স (MI6) গঠিত হয়। ১৯৯৫ সাল হতে এর নবনির্মিত হেডকোয়ার্টার লন্ডনের টেমস্ নদীর দক্ষিণ পাড়ে ভেক্সোল ক্রস নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে প্রায় ৩,২০০ কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর সফলতা এ স্পাই প্রতিষ্ঠানকে ২০১৪ সালের জরিপে পৃথিবীর প্রথম দশটি স্পাই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে তিন নম্বরে নিয়ে এসেছে।

মিলিটারি ইনটেলিজেন্স সেকসন ফাইভ (MI5) ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ গুপ্তচরবৃত্তির কাজে নিয়োজিত। এমআইসিক্স এর প্রধান হিসেবে বর্তমানে স্যার জন সোয়ার্স কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান পররাষ্ট্রসচিব উইলিয়াম হেগ-এর কাছে সিস/এমআইসিক্স কর্মকর্তারা দায়বদ্ধ। যদিও এ প্রতিষ্ঠান ১৯০৯ সাল হতে ব্রিটেনের সিক্রেট ইনটেলিজেন্স হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর অস্তিত্ব সরকারীভাবে স্বীকার করা হয় ১৯৯৪ সালে।

১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধে এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে কর্মরত গুপ্তচরেরা অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে খবর আদানপ্রদান করত। বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়ার বলশেভিক সমাজতন্ত্রের কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে আমেরিকার সাথে একাত্ম হয়ে এর গুপ্তচরেরা তথ্য বিনিময় করত। ১৯২৩ সালে অ্যাডমির্যাল স্যার হ্যাগ ব্রিটিশ সিক্রেট ইনটেলিজেন্সের ক্ষমতা গ্রহণের পর এ প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন সেকশনে ভাগ করেন। তন্মধ্যে এমআই সেকশন ফোর, সেকশন ফাইভ, সেকশন সিক্স, সেকশন সেভেন, সেকশন এইট এবং সেকশন নাইন-এ বিভক্ত করে প্রত্যেক সেকশনকে আলাদাভাবে দায়িত্ব অর্পণ করেন। বিদেশে কাউন্টার এসপিওনেজ, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং শিল্প সম্প্রসারণে ব্রিটেনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, বিদেশে অবস্থানরত নিজেদের এজেন্টদের সাথে যোগাযোগকারী সেকশন, নতুন নতুন তথ্য-প্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্য আলাদা সেকশন ইত্যাদি এ প্রতিষ্ঠানের সফলতাকে এগিয়ে নিতে তৎপর রয়েছে।

তাছাড়া আভ্যন্তরীণ নাশকতামূলক কাজের বিরুদ্ধে এমআইফাইভ (MI5) বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স এজেন্সি সিস/এমআইসিক্স রাশিয়া, জার্মানি, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া ইত্যাদি দেশে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে অত্যন্ত সফলতার পরিচয় দেয়। আমেরিকার সিআইএ এবং ব্রিটিশ ইনটেলিজেন্স সিস/এমআইসিক্স যুগপৎভাবে সমগ্র বিশ্বজুড়ে অসংখ্য কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সিআইএ এবং এমআইসিক্স পরস্পরের মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় এবং উভয় দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ। যে কারণে জাতিসংঘে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগে আমেরিকার সাথে ব্রিটেন একাত্ম হয়ে কাজ করে। পৃথিবী জুড়ে আমেরিকা ও ব্রিটিশ স্বার্থে যুগপৎভাবে এ দুই দেশের গোয়েন্দা সংস্থা শক্তি প্রয়োগ করে আসছে। কমিউনিষ্ট রাশিয়ার পতনে এবং ঠান্ডা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ ও আমেরিকান ইনটেলিজেন্স যুক্তভাবে ইরানের শাসক মোহাম্মদ মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করে শাহ রেজা পাহলভীকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে।

২০০৩ সালে ইসরাইল, আমেরিকা ও ব্রিটেনের যুক্ত সিদ্ধান্তে ইরাক আক্রমণের প্রাক্কালে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা সিস, ইসরাইলি মোসাদ এবং আমেরিকান সিআইএ ইরাককে বিষাক্ত গ্যাস এবং আণবিক অস্ত্র সংরক্ষণের অপবাদ দেয় যাতে তাদের অযৌক্তিক আক্রমণ সমগ্র বিশ্ব যৌক্তিক হিসেবে গ্রহণ করে। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক স্কট রিটারকে সিস, মোসাদ ও সিআইএ গোপনে রিক্রুট করে যাতে স্কট রিটার জাতিসংঘের পক্ষ হতে ইরাকের অস্ত্র পরিদর্শনে এসে ইরাকে বিষাক্ত কেমিক্যাল গ্যাসের প্রচুর মওজুদ রয়েছে বলে প্রচার চালান। স্কট রিটার স্বীকার করেছেন ১৯৯৭ সালে ব্রিটেনের গোয়েন্দা সংস্থা সিস/এমআইসিক্স ইরাকের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর জন্য তার উপর চাপ প্রয়োগ করে। ব্রিটেনের 'দ্য সানডে টাইমস্' ২০০৩ সালে এ সত্যটি উদঘাটন করে পত্রিকায় প্রকাশ করে।

২০১১ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সেক্রেটারি উইলিয়াম হ্যাগ তার এক ভাষণে বলেন ইরাকের বসরায় ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা সিস এর গোপন আস্তানা ছিল যা ইরাক যুদ্ধে সফলতার পর পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে কাজ করার জন্য গোয়েন্দা সদস্যদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

তাছাড়া লিবিয়ার স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি যিনি ৪২ বছর একটানা লিবিয়া শাসন করেছেন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা সিস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০১১ সালে ব্রিটেনের 'দ্য ডেইলি স্টার' পত্রিকা প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায় যে, ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা গাদ্দাফি পুত্র সাইফ আল-ইসলাম এবং কর্ণেল গাদ্দাফির গোপন আস্তানা সনাক্ত করার কাজে লিবিয়ার মাটিতে ২৫ মিলিয়ন পাউন্ডের ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে। গাদ্দাফি পুত্র এবং গাদ্দাফির কথোপকথন এ ডিভাইসের মাধ্যমে সনাক্ত করে গাদ্দাফি পুত্রকে বন্দি এবং বিরোধী শক্তির মাধ্যমে গাদ্দাফিকে বিচারবহির্ভূত হত্যা করা হয়। অথচ ২০১৩ সালে ব্রিটেনের চ্যানেল-৪ রেডিওর এক রিপোর্টে প্রকাশ করা হয় যে, ২০০২ সালে কর্নেল গাদ্দাফির নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত গোয়েন্দাদের সাথে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার এক গোপন চুক্তি হয় যাতে লিবিয়া অভ্যন্তরে এবং লিবিয়ার বাইরে গাদ্দাফি বিরোধী শক্তি সম্মন্ধে ব্রিটেন গাদ্দাফির বিশেষ গোয়েন্দা দফতরকে অবহিত করে। এজন্য ব্রিটেন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট কর্নেল গাদ্দাফির কাছ হতে অর্থিকভাবে প্রচুর লাভবান হয়েছিল।

ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্রিটেন অগ্রণী ভূমিকা রাখে। ১৯১৪-১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় একলক্ষ সত্তর হাজার ইহুদি সেনাসদস্য নিহত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান এবং তার মিত্রশক্তির পতনের পর ইহুদি বুদ্ধিজীবিরা এক নতুন ফন্দি আঁটে। ১৯১৯ সালে চেইম উইজম্যান বিশ্ব ইহুদি অর্গানেইজশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন দেশের বিপুল সংখ্যক ইহুদি সেনাসদস্যের আত্মাহুতির পুরষ্কার হিসেবে আমেরিকা, রাশিয়া ও ব্রিটেনের কাছে ইহুদি এ প্রতিষ্ঠান ইহুদিদের জন্য একটি আলাদা ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। বিশ্ব ইহুদি সংগঠনের প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকার প্রথমে আয়ারল্যান্ডে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে কিন্তু চেইম উইজম্যান এ প্রস্তাবে নাকচ করে দিলে ফিলিস্তিনের একাংশ জুড়ে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়ার সমর্থনে ফিলিস্তিনকে দ্বি-খন্ডিত করে ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠিত হয়।

ব্রিটিশ সরকারের অভ্যন্তরে ও পররাষ্ট্র নীতিতে বিশেষ অবদান রাখা ইহুদি ব্যবসায়ীরা[১৭]

রোমান আবরামোভিচ

ব্রিটিশ পত্রিকা 'দ্য সানডে টাইমস্' জানায় 'চেলসা ফুটবল ক্লাব' পরিচালক রোমান আবরামোভিচ যার সম্পদের পরিমাণ ১০.৮ বিলয়ন পাউন্ড এবং তিনি সমগ্র ব্রিটেনের ধনীদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন।

ফিলিপ গ্রিন ও টিনা

বিভিন্ন ফ্যাশন সুপারষ্টোর-এর মালিক ফিলিপ গ্রিন এবং তার স্ত্রী টিনা ৪.৯ বিলিয়ন পাউন্ড সম্পদের মালিক।

ডেভিড এণ্ড সায়মন রবিন

রিয়েল স্টেট প্রোপার্টি ব্যবসায়ী ডেভিড এবং সায়মন ভ্রাতৃদ্বয় প্রায় তিন বিলিয়ন পাউন্ড সম্পদের মালিক।

জো লিউস

ফরেন একচেঞ্জ ডিলার এবং টটেনহাম ও গ্লাসগো রেঞ্জারস্ ফুটবল ক্লাবের মালিক জো লিউস ২.১ বিলিয়ন পাউন্ড সম্পদের মালিক।

রিচার্ড দেসমন্ড

টিভি-এক্স এবং 'দৈনিক এক্সপ্রেস'- এর মালিক রিচার্ড ডেসমন্ড ১.৯ বিলিয়ন পাউন্ড সম্পদের মালিক।

রবার্ট সাইন্সবুরি

বিখ্যাত সেইনস্‌বারী সুপারষ্টোর সমূহের পৃষ্টপোষক হিসেবে সেইনস্‌বারী ১.৬ বিলিয়ন পাউন্ড সম্পদের মালিক।

ক্লাইভ ক্যালডার

দক্ষিণ আফ্রিকার ক্লাইভ লন্ডনের অভিবাসী boyband N Sync ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে ১.৩ বিলিয়ন পাউন্ডের মালিক।

---

১৭. Leslie Bunder

বার্নাড লিউস
ফ্যাশন ব্যবসায়ী 'রিভার আইল্যান্ড' ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এক বিলিয়ন পাউন্ডের অধিক অর্থ সম্পদের মালিক।

আলান সুগার
প্রোপার্টি এবং কম্পিউটার ব্যবসায়ী এলান ৭৯০ মিলিয়ন পাউন্ডের মালিক। বিবিসি-২ রেডিও/টিভি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন।

ইহুদি নিয়ন্ত্রিত ব্রিটিশ মিডিয়াসমূহ

বিবিসি টিভি : আলান ইয়েনটব (Alan Yentob), বর্তমান ডিরেক্টর জেনারেল : গ্রেগ ডিক (Greg Dyke)

বিবিসি রেডিও (১-৫): Jenny Abramsky.

আইটিভি, পে-টিভি এবং আইটিএন: Michael Green & Steve Morrison.

এংলিয়া টিভি: Graham Creelman

বিস্কাইবি (BSkyB): Rupert Murdoch

দ্য ডেইলি এক্সপ্রেস, দ্য সানডে এক্সপ্রেস, দ্য সান, দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ, দ্য ডেইলি মিরর, দ্য ডেইলি মেইল, দ্য ডেইলি স্টারসহ অন্যান্য দৈনিক সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন সাময়িকী Richard Desmond, Rupert Murdoch, Guy Zitter, Conrad Black and Mrs. Barbara Amiel কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

ব্রিটেনসহ সমগ্র ইউরোপের বৃহত্তম প্রোডাকশন ষ্টুডিও-এর মালিক: Michael Grade.

ইউরোপের বৃহত্তম 'এড' কোম্পানি: যুক্তরাজ্য ভিত্তিক Saattchi brothers "Saattchi and Saatchi".

মূলতঃ ইহুদি নিয়ন্ত্রিত Carlton Communications plc, Ges Granada plc সমগ্র ব্রিটেনের মিডিয়া জগত নিয়ন্ত্রন করে আসছে। যুক্তরাজ্যে প্রায় চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ইহুদি ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে বসবাস করে। যুক্তরাজ্য ইউরোপের দ্বিতীয়

বৃহত্তম এবং পৃথিবীর পঞ্চম ইহুদি প্রধান দেশ। সরকারী ব্যবস্থাপনায় ইহুদি ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্মিত স্কুলসমূহে প্রায় ৬০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করে। এরমধ্যে তিনটি স্কুলে ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া ভিন্ন ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তিতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সরকারী ব্যবস্থাপনায় ইহুদিদের জন্য আলাদা বাজার ও উপাসনালয় রয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ইহুদি প্রভাব থাকায় ইহুদিরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় অধিক সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে।

ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। এক বিরাট অংশ সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে চাকরী করে। অবশিষ্ট কিছুসংখ্যক বিভিন্ন খামার ব্যবসার সাথে জড়িত। ইহুদি প্রচার মাধ্যমগুলোর মধ্যে The Jewish Chronicle, Jewish Telegraph, Hamodia and the Jewish Tribune উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বহুল প্রচারিত আরও ২৩টি ম্যাগাজিন ও দৈনিক পত্রিকা ইহুদি নিয়ন্ত্রিত। এককথায় যুক্তরাষ্ট্রের মত যুক্তরাজ্যের সিনেমা, রেডিও, টিভি এবং পত্রপত্রিকার ৯৬% ইহুদি নিয়ন্ত্রিত। ১৮০০ শতাব্দী হতে শুরু করে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন পদে যে সমস্ত ইহুদি রাজনীতিবিদরা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১৮০০-১৮৯৯ সাল : উপরোক্ত সময়ে বিশজনেরও অধিক ইহুদি ব্রিটিশ সরকারের পার্লামেন্টের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তন্মধ্যে ব্রিটেনে প্রথম ইহুদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বেনজামিন ডিইসরাইলি। সাতজন 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন এবং বাকীরা ধনাঢ্য 'বেরন' উপাধিতে ভূষিত পার্লামেন্টারিয়ান ছিলেন।

১৯০০-১৯৩৯ : উপরোক্ত সময়ে পনেরো জনেরও অধিক ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মেম্বার ছিলেন। তন্মধ্যে রুফুস ইসহাক ভারতবর্ষের ১ম ইহুদি ভাইসরয় হিসেবে দায়িত্বভার পালন করেছেন এবং আলফ্রেড হারিস স্যার খেতাবে সম্মানিত হয়েছেন।

১৯৪০-১৯৭৩ : উপরোক্ত সময়ে বত্রিশ জনেরও অধিক ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মেম্বার এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তন্মধ্যে লর্ড জন

ডায়মন্ড হাউস অব লর্ডস্-এর নেতা ছিলেন এবং ছয়জন স্যার খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

১৯৭৪ - ২০১৩ : উপরোক্ত সময়ে ষাটজনেরও অধিক ইহুদি বিভিন্ন পদবী নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এদের বেশিরভাগই ধনী ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি। অনেকে ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন সম্মানিত খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুনও ইহুদি ধর্মাবলম্বী। তিনি ২০১০ সালের নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টি হতে জয়লাভ করেন। কনজারভেটিভ এবং লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'

(Research & Analysis Wing)

১৯৬২ সাল হতে অবিভক্ত পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশ এবং অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ জুড়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা আই. বি (ইনটেলিজেন্স ব্যুরো) বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল। ১৯৬৮ সালে আত্মপ্রকাশ করে RAW (Research & Analysis wing)। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তখন থেকেই 'র'-এর জোরালো উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর সফলতা কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। নয়াদিল্লীর বিকাশ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত অশোকা রায়নার বই Inside RAW: the story of India's Secret Service (ইনসাইড 'র' : দি ষ্টোরী অব ইন্ডিয়াজ সিক্রেট সার্ভিস) এবং নয়াদিল্লীর মানস পাবলিকেশনস্ কর্তৃক প্রকাশিত এম. কে. ধর এর Open secret : Indian intelligence unveiled (ওপেন সিক্রেট ঃ ইন্ডিয়ান ইনটেলিজেন্স আনভিলড্) থেকে RAW-এর বিভিন্ন কার্যকলাপের অনেক তথ্য জানা যায়।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এবং বাংলাদেশে ভারতীয় 'র' এর প্রভাব

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সেনা কমান্ডার লে. জে. জেএফআর জ্যাকব (ইহুদি) বাংলাদেশ অভ্যন্তরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নের্তৃত্ব দিয়েছিলেন। ভারতীয় উদ্দেশ্য একটাই ছিল- যদি পাকিস্তানকে দ্বি-খন্ডিত করে দেওয়া যায় তাহলে পাকিস্তানের শক্তি লোপ পাবে এবং বাংলাদেশ পরিবেষ্টিত ভারতের সিভেনসিস্টার নামক প্রদেশগুলোর বিদ্রোহদমনে বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে ভারত সহজে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এবং বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হবে। তাছাড়া বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্যের একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি সম্ভব হবে। বাংলাদেশ পরিবেষ্টিত উত্তর-পূর্বদিকের বর্ডার ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ভূখণ্ডে ভারতীয় প্রবেশদ্বার উন্মোক্ত হবে যা পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক মতবিরোধে অনেকটা অসম্ভব ছিল।

ভারতের সেভেনসিস্টার নামে পরিচিত ১,০১,২৫০ বর্গমাইল ব্যাপী বিস্তীর্ণ পাহাড়ী ভূখন্ড যা আসাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, এবং অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে ঘটিত যার বর্ডার চীন, তিব্বত, ভূটান, বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের ২,৮০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং জনসংখ্যা প্রায় ৩৯ কোটি। এ সমস্ত অবহেলিত পাহাড়ী প্রদেশগুলো দীর্ঘদিন যাবত স্বাধীনতা অথবা স্বায়ত্বশাসনের জন্য লড়াই করে আসছে। বিভিন্ন প্রদেশের এই সংগ্রামে ভিন্ন গোত্রের প্রায় ২৫টি জঙ্গি সংগঠন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত বাংলাদেশ সরকারের সাথে বিভিন্ন চুক্তি করে যার মধ্যে রয়েছে।

১৯৭৪ সালের ১৬ই মে ইন্দিরা-মুজিব সীমান্ত নির্ধারণ ও ছিটমহল বিনিময় চুক্তি। বাংলাদেশ এ চুক্তির ১২ এবং ১৪ সেকশন অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে রাতারাতি জাতীয় সংসদে অনুমোদন নিয়ে ভারতকে উত্তর বেরুবাড়ী ছিটমহল হস্তান্তর করে। পরিবর্তে ভারত আঙ্গরপোতাও দহগ্রাম ছিটমহল বাংলাদেশের পাটগ্রামের সাথে সংযুক্ত করার জন্য স্থায়ীভাবে তিনবিঘা করিডোর দেওয়ার কথা থাকলেও দীর্ঘদিন এর সুরাহা হয়নি। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দীর্ঘ ৪০ বছর পর ভারত এই তিনবিঘা করিডোর চুক্তি অনুযায়ী স্থায়ীভাবে হস্তান্তর না করে এর মধ্য দিয়ে ২৪ ঘন্টা বাংলাদেশী জনগণের যাতায়াতের অনুমতি দেয়। হস্তান্তর প্রক্রিয়ার শুভ সূচনা হিসেবে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ যেখানে ভারতকে চুক্তি মোতাবেক উত্তর বেরুবাড়ী হস্তান্তর করে দিল সেখানে ভারতের তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশকে স্থায়ীভাবে হস্তান্তর না করায় চুক্তি লঙ্গিত হয়েছে। ভারতের এহেন আচরণ বাংলাদেশী জনগণকে হতাশ করেছে। ভারত ও বাংলাদেশের মোট ২১৪ টি ছিটমহলের বিনিময় চুক্তির কথা থাকলেও ভারত সরকারের সদিচ্ছার অভাবে তা বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়েছে। তন্মধ্যে ১১৯ টি ভারতীয় ও বাংলাদেশের ৯৫টি ছিটমহল যার মোট জনসংখ্যা প্রায় ৫১,০০০ এবং ৭,০০০ একরবিশিষ্ট জমি জুড়ে এ ছিটমহলগুলো অবস্থিত। এক জরিপে জানা যায় উভয় দেশের মোট ৭২টি ছিটমহল বিনিময়যোগ্য। ছিটমহলের প্রকৃতসংখ্যা নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের জরিপ রিপোর্টে মতভেদ রয়েছে। ছিটমহলের সংখ্যা প্রাকৃতিক পরিবর্তনে কমে ও বাড়ে (সদ্য জেগে ওঠা দীপাঞ্চল এবং ব্যবহার অযোগ্য জমি) যা কখনও বিনিময়যোগ্য নয়।

সাম্প্রতিককালে প্রায় ৪০ বছরের অধিক অপেক্ষার পর উভয় দেশের রাজনৈতিক সদিচ্ছাতে ছিটমহল বিনিময়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশের নদী, বন্দর, উপকূল অঞ্চল এবং স্থলপথ ব্যবহার করে ভারত সেভেনসিষ্টার প্রদেশগুলোর ত্রিপূরা, আসাম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং মণিপুরে তাদের পণ্যদ্রব্য, সামরিক সাজসরঞ্জাম কিংবা প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর অবাধ চলাচলের ব্যাপারে বাংলাদেশের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে।

গঙ্গার এবং তিস্তার (অসমাপ্ত) পানি বন্টন চুক্তি : গঙ্গা চুক্তি বৈষম্যমূলকভাবে কার্যকর হলেও তিস্তা চুক্তি এখনো কার্যকর হয়নি। গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি নিয়ে ভারতের অর্জনের পাল্লা ভারি রেখে ভারত বাংলাদেশের সাথে অন্যায্য এক চুক্তি সম্পাদন করেছে বটে যদিও ন্যায্য হিস্যার ব্যাপারে ভারত সবসময়ই তার মোড়লীপনা এবং একঘোয়েমী মনোভাব পোষণ করে আসছে। সাম্প্রতিককালে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিংহের বাংলাদেশ সফরকালে তিস্তার পানিবন্টন নিয়ে একটি সমঝোতা চুক্তি সই হলেও পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সন্দেহমূলক অনুপস্থিতি ও অসহযোগিতার কারণে এ চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে ফেনী নদীর পানি নিয়ে অন্য একটি চুক্তি হয়েছে যাতে ত্রিপুরাবাসী ফেনী নদীর পানি তাদের ক্ষেতখামারে পাইপ-সংযেগের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ভারত যখন বাংলাদেশের সাথে কোন দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তখন নিজেদের স্বার্থে প্রথমে চুক্তি নিজেদের অনুকূলে আদায় করে নিতে তৎপর হয় এবং নিজদেশে এমন একটি প্রতিপক্ষ দাঁড় করায় যারা এ ধরণের চুক্তির বিরোধিতা করে, যে কারণে দ্বি-পক্ষীয় চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ভারতীয় পার্লামেন্টে অনুমোদনের দোহাই দিয়ে ঝুলে থাকে। উদাহরণসরূপ, গঙ্গা এবং তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি বাস্তবায়নে ভারতের অনীহা কিংবা বাংলাদেশের প্রয়াত শহীদ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্তর বেরুবাড়ী ভারতকে দিয়ে দিলেও বিনিময়ে বাংলাদেশকে দীর্ঘ তিনযুগ পেরিয়ে গেলেও ভারত তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশকে স্থায়ীভাবে হস্তান্তর করেনি। ঠিক তেমনি ভারত তার সেভেন সিস্টার অঙ্গরাজ্যে সহজে চলাচলের জন্য বাংলাদেশের নদীবন্দর এবং স্থলপথ ব্যবহারের অনুমতি আদায় করে নিলেও তিস্তার পানি বন্টন, টিপাইমুখ বাঁধপ্রকল্প ইত্যাদির

ব্যাপারে বাংলাদেশের সাথে সত্যিকার অর্থে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়নি। ভারতের পক্ষ হতে নানারূপ টালবাহানা বাংলাদেশের জনগণের বিশ্বাসের ভিত নড়বড়ে করে দিচ্ছে।

পলাতক আসামী বিনিময় চুক্তি : এ চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পরও বাংলাদেশের অনেক কুখ্যাত সন্ত্রাসী ভারতের পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন প্রদেশে বহাল তবিয়তে বিচরণ করছে। তাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে সোপর্দের চুক্তি থাকলেও ভারত এ ব্যাপারে দৃশ্যমান কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

বাংলাদেশে 'র' (RAW) কীভাবে এবং কোন্ ক্ষেত্রে প্রভাব[১৮] বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করার লক্ষ্যে ১৯৬২ সালে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' দিয়ে শুরু হয় ইনটেলিজেন্স ব্যুরো অব ইন্ডিয়ার প্রথম বড় ধরণের ষড়যন্ত্র। ইন্ডিয়ান ইনটেলিজেন্স ব্যুরো 'রিসার্চ এন্ড এ্যানালাইসিস উইং' বা 'র' হিসেবে বৃহত্তর কলেবরে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৮ সালে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আসে 'র'-এর মহাসাফল্য। এ কারণে 'র' প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের অনেক রাজনৈতিক নেতা, সরকারী আমলা এবং সেনাবাহিনীর উর্ধতন অফিসারদের অনেককেই দলে ভেড়াতে পেরেছিল।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পরপরই বাংলাদেশকে চাপের মুখে রাখার জন্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী জনপদের চাকমা নেতা সন্তু লারমার নের্তৃত্বে শান্তিবাহিনী গঠন, তাদেরকে ভারতের

---

১৮. Phatoms of Chittagong, The Fifth Army in Bangladesh - By: Major General Sujan Singh Uban, Allied Publishers, 1985, New Delhi), ("RAW in the Freedom Struggle of Bangladesh" by Dr Shastra Dutta Pant.), (India's unconventional war strategy by Dr Shireen Mazari), (Open Secrets: India's Intelligence Unveiled by M K Dhar. Manas Publications, New Delhi, 2005), (Inside RAW: the story of India's Secret Service, by: Asoka Raina, Vikas Publishing House of New Delhi.), (South Asia's Fractured Frontier, by Binalaksmi Nepram, Mittal Pablishers, New Delhi, 2002, pp-153), (RAW's role in Furthering India's Foreign Policy,The New Nation, Dhaka, 31 August 1994), (Indo-Bangladesh Relation, Motiur Rahman, daily Prothom Alo, 10 December 2002), ("Antaraler Sheikh Mujib", Dr Kalidas Baidya, Kolkata, 2005

ত্রিপুরা ও দেরাদোনে ট্রেনিংপ্রদান এবং অস্ত্রসজ্জিত করে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার লক্ষে সেনাবাহিনী সদস্যদের উপর আক্রমণ, চিত্তরঞ্জন সুতার এর নের্তৃত্বে বঙ্গ সেনা/স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন, ডা. কালিদাস বৈদ্যের নের্তৃত্বে পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জনপদ এবং প্রশাসনকে অস্থিতিশীল করে রাখে। গরীব যুব সম্প্রদায়কে টাকার বিনিময়ে পথভ্রষ্ট করে বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। অসংখ্য নিরীহ মানুষ হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধ হতে শুরু করে একের পর এক 'র' কিভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দৃশ্যপট পরিবর্তন করার সফলতা অর্জন করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ উপরোক্ত বইগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে, এমনকি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে ব্যবহার করে, নিষিদ্ধ জেএমবিসহ ধর্মভিত্তিক কিছু সংগঠনকে পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং রাজনৈতিক নেতাদের কিছু অংশকে ক্ষমতা এবং অর্থের লোভ দেখিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিকে অস্থির এবং অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার চেষ্টা হয়েছে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরে ভারতবিরোধী বাংলাদেশী রাজনীতিবিদদের গুম-হত্যার মাধ্যমে অপসারণ, বাঙালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতি মুসলিম সম্প্রদায়ের মননে এবং ধ্যান-ধারণায় অনুপ্রবেশ ঘটানো এবং যুব সম্প্রদায়কে মাদকাসক্ত করে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী করার লক্ষে বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর মাদক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবাধে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। ফলে এর পরিণতি ভয়াবহ রূপ নেয়। প্রতিদিন কোটিকোটি বোতল ফেনসিডিল, ইয়াবা, গাঁজা, ভাং, মদ, হিরোইন, বিড়ি ইত্যাদি বাংলাদেশে প্রবেশ করছে এবং যুবসম্প্রদায় ক্রমেই সহজলভ্য এ সমস্ত মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্যের একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি করা 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য। রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে কোনঠাসা করে রাখা যাতে বাংলাদেশ ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান রপ্তানীজাত গার্মেন্টস্ পণ্য যাতে ইউরোপ এবং আমেরিকার বাজারে ভারতকে ছাড়িয়ে যেতে না পারে সে কারণে বাংলাদেশের গার্মেন্টস্ শিল্পে শ্রমিক অসন্তুষ বাড়িয়ে তুলে অস্থিতিশীল করে রাখা।

ভারতকে পাটশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে গিয়ে এবং পাট রপ্তানীকারক দেশ হিসেবে ভারতের অবস্থান শীর্ষে উন্নীত করতে বাংলাদেশের এককালের প্রধান রফতানীজাত পণ্য পাটশিল্পকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তজুড়ে বিভিন্ন পাটকল স্থাপিত হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের পাটচাষীরা এবং চোরাচালানীরা কোন উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হয়ে এককালের সোনালী আঁশ বলে খ্যাত পাটকে অবলীলায় ভারতের হাতে তুলে দিচ্ছে। এদিকে পাট এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করে ভারত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বাংলাদেশের পাট তাই আজ মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বাজারে ভারত হয়ে রপ্তানী হচ্ছে এবং সাথে সাথে পাটজাত পণ্য প্রস্তুত করে ভারত নিজেদের আভ্যন্তরিণ চাহিদাও মেটাচ্ছে। সরকারী মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে বহির্বিশ্বে যে পরিমাণ পাট এব পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী হচ্ছে তা ভারতের তুলনায় অতি নগন্য। ব্যক্ত থাকে যে, পরিবেশবান্ধব পাট কার্পেটশিল্পের প্রধান উপকরণ। তাছাড়া যুদ্ধরত সেনাদের সাময়িক তাবু খাটাতে পাটের তৈরী চট এক বিশেষ ভূমিকা রাখে। ইরাক যুদ্ধে মরুভূমিতে সাময়িক তাবু খাটাতে পাটের চট ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলোর প্রধান রফতানীকারক দেশ হিসেবে ভারতের নাম প্রধান্য পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার পাটশিল্পকে পূর্ববস্থায় ফিরিয়ে আনতে নানারূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা প্রশংসনীয় ও অর্থবহ।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে ভারত অনেক বছর যাবত চেষ্ঠা চালিয়ে আসছে। এজন্য অন্যান্য এশিয়ান দেশসমূহ ও চীনের পাশাপাশি রাষ্ট্রসমূহ যেমন মায়ানমার, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, শ্রলঙ্কা ও মালদ্বীপের সমর্থন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'র' এসমস্ত দেশগুলোকে বিভিন্ন চাপের মুখে রেখেছে।

ভারতের সেভেন সিস্টার অঙ্গরাজ্যসমূহে বিশেষ করে অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডের বিদ্রোহীদেরকে দমন করার জন্য বাংলাদেশের নদীপথ ও স্থলপথ ব্যবহার করা এবং এ সমস্ত পাহাড়ী অঙ্গরাজ্যে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা সহজীকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য 'র' বাংলাদেশের সাথে চুক্তি করে তাদের প্রয়োজনীয় সুবিধাসমূহ আদায় করে নিয়েছে। পরিবর্তে নেপাল এবং ভূটানের সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য এবং পণ্য পরিবহন সুবিধার্থে ভারতের মাটি ব্যবহারের কথা

থাকলেও ভারতের পক্ষ হতে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদেরকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' বাংলাদেশে তাদের পছন্দনীয় রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক পার্টি এবং নির্বাচনে তাদের কাঙ্খিত দলকে নির্বাচনে জয়লাভ করানোর জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে যাতে পাকিস্তানী জঙ্গী কিংবা মায়ানমারের কমিউনিষ্ট সরকার ভারতীয় কমিউনিষ্ট সদস্যদেরকে সহায়তা করার ব্যাপারে সুযোগ নিতে না পারে কিংবা ভারতে প্রবেশ করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে সে ব্যাপারে 'র' পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে।

২০০০ সালে কুড়িগ্রামের রৌমারী এবং ২০০১ সালে সিলেটের তামাবিলস্থ পাদুয়া সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় বিএসএফ এবং বাংলাদেশী বিডিআর এর মধ্যে সীমান্ত সীমানা নিয়ে গুলি বিনিময় হয় এবং এতে বেশ কিছু হতাহত হয়। উভয় সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ সদস্যদের হতাহতের সংখ্যা বাংলাদেশের বিডিআর সদস্যদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। আধাসামরিক সীমান্তপ্রহরী বিডিআর-এর শক্তি, সাহস এবং রণকৌশল ভারতের বিএসএফ-এর কাছে এক নতুন বিস্ময়ের জন্ম দেয়। ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তাদের কেউ কেউ এর বদলা নিবেন বলে হুঙ্কারও দিয়েছিলেন। ভারতীয় রিসার্চ এন্ড এ্যনালাইসিস উয়ং (RAW) গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয় নিয়ে তখন থেকে ভাবতে শুরু করে।

২০০৯ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তথাকথিত বিডিআর বিদ্রোহে ৫৭ জন চৌকশ সেনাকর্মকর্তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। ফলশ্রুতিতে একসময়ের ফনাধর বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেলস্) তাদের নৈপূণ্যতা হারিয়ে অপেক্ষাকৃত কম মনোবলসম্পন্ন বিজিবি (বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ) হিসেবে রূপান্তরিত হয়। এ কারণে হয়তো ভারতীয় বিএসএফ প্রায়ই সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করে। বিজিবি নিরবে তা প্রত্যক্ষ করে এবং নম্র প্রতিবাদ জানায়।

রৌমারী ও পাদুয়া সীমান্তে তৎকালীন বিডিআর জওয়ানদের রণনৈপুন্নতার বিরুদ্ধে ভারত বলেছিল "এর বদলা নেওয়া হবে।" এর সূত্র ধরে মনে প্রশ্ন জাগে- "পিলখানা বিডিআর বিদ্রোহ কি সত্যিকার অর্থে বদলা নেওয়া?"

অপ্রত্যাশিত বিডিআর বিদ্রোহের পর পরই দেশী-বিদেশী বিভিন্ন গণমাধ্যম, ফাঁস হয়ে যাওয়া উইকিলিকস্ রিপোর্টে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'- এর দিকে আঙুলী নির্দেশ করে যদিও বাংলাদেশ সরকারীভাবে অদ্যবধি এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদ্রোহ পরবর্তী সেনাসদস্য ও বিডিআর-এর মধ্যে সম্ভাব্য সংঘাত অত্যন্ত সুকৌশলে এড়াতে সক্ষম হয়েছেন।

'র' বাংলাদেশের সংস্কৃতি, আদর্শ ও অস্থিত্বের উপর আঘাত হানছে

বাঙালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সমাজবিজ্ঞানীদের মন্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হল :

'অখণ্ড পাকিস্তান আমলে যা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল না তা আজ বাঙালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতি বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। উদাহরণসরূপ, মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন, মুসলিম মহিলারা কপালে টিপ পরিধান, আধুনিকতার নামে ভারতীয় আদলে সাজে গুজে মুসলিম মহিলাদের উশৃঙ্খলতা এবং শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রকাশে উৎসাহিত করা, বাংলা নববর্ষ পালনকালে চারুকলা প্রতিষ্ঠানগুলোর মুসলিম সদস্যরা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দেব-দেবীর মুখোশ নিয়ে আনন্দ মিছিল, পূজামণ্ডপে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বসহ মুসলিমদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে হিন্দু দেব-দেবীদের গুণকীর্তন করে অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রমাণের চেষ্টা, বিয়ের অনুষ্ঠানে হিন্দুধর্মের অনুরূপ প্রথা চালু করা, যেমন- মঙ্গলপ্রদীপ ও বরণ ডালা সাজিয়ে বধুবরণ, (ব্যক্ত থাকে যে, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর সামনে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনের রীতি প্রচলিত), কিছুসংখ্যক কবি, লেখক ও সুজন সদস্যদেরকে বিভিন্ন কলাকৌশলে হিন্দু সংস্কৃতি প্রবর্তনের পক্ষে উকালতি করা, ভারতীয় ছায়াছবি ও গানকে যুবসমাজে আকর্ষনীয় করে তোলা, ভারতীয় মাদকদ্রব্য অবাধে বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য সীমান্তে বিভিন্ন মাদকপ্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত লাইসেন্স দেওয়া যাতে বাংলাদেশের যুবসমাজ মাদকাসক্ত হয়ে মুসলিম ধর্মের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মেরুদন্ডহীন ও পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্মৃতিফলক হিসেবে মুর্তিস্থাপনে উৎসাহিত করা (যা মুসলিম সমাজে নিষিদ্ধ) এ ধরণের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড প্রবর্তনে

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' জড়িত বলে অনেক রাজনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হল :

"এ সমস্ত হিন্দুয়ানী প্রথা কোনোদিনও মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের সামাজিক এবং পারিবারিক প্রথার অন্তর্ভুক্ত ছিল না তবুও ১৯৯০ সালের দিকে বাংলাদেশের তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় লজ্জাজনকভাবে বাঙালী সংস্কৃতির নামে বাংলা নববর্ষে হিন্দু রীতিনীতি অনুসরণ করে বাংলা নববর্ষ পালন করে আসছে। বাঙালী সংস্কৃতির নামে এ সমস্ত বুদ্ধিজীবি এবং তাদের অনুসারীরা বাংলা নববর্ষে রাজপথে হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবী, ভূত, শিয়াল, বানর, হনুমান ও পেঁচার মুখোশ পরিধান করে রাজপথে নৃত্যোল্লাস করতে থাকে (হনুমান রামচন্দ্র দেবের সীতা উদ্ধারে লঙ্কা অভিযানের সাথী ছিল) ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এইসমস্ত পশুকৃতি মুখোশ হিন্দু অস্পৃশ্য সমাজের গজন পূজা উৎসবে ব্যবহৃত হয় (শিবা, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ, বিষ্ণু এরা প্রত্যেকেই হিন্দুদের দেবতা)। গজন উৎসবে ডোম (নীচুস্তরের হিন্দু সম্প্রদায় যারা শ্মশানে হিন্দুদের মৃতদেহ সৎকার করে), সুইপার, চণ্ডাল (অতি নিম্নস্তরের হিন্দু যারা গর্হিত অপরাধীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলায় ও মলমূত্র পরিষ্কার করে) সাধারণতঃ এ ধরণের মুখোশ পড়ে তারা গজন উৎসব পালন করে।

আমি আশা করি আমার সম্মানিত পাঠকরা উপলব্ধি করতে পারবেন কীভাবে চাতুর্য্যতার সাথে ভারতীয় 'র' বাংলা নববর্ষে এ দেশের মুসলিম সমাজে বাঙালী সংস্কৃতির নামে এ সমস্ত প্রথা চালু করেছে। এটা মনে রাখা উচিত যে, বাংলাভাষী হিন্দুরা এদেশের মুসলিম সমাজকে সভ্য বাঙালী হিসেবে মনে করে না। তারা মনে করে বাংলাভাষী মুসলিমরা অস্পৃশ্য হিন্দু চণ্ডাল, মুচি, মেথর, জেলে, খৌরকার, ধোপাদের চেয়েও নিকৃষ্টশ্রেণীর। ইতিহাসে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজে বাংলা নববর্ষ পালন করার এমন কোন নজীর নেই যখন ব্রিটিশ শাসনামলে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ এক ছিল। বলাবাহুল্য, 'র' বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে এমনই একটি ভিনদেশী সংস্কৃতি প্রবর্তন করেছে যা প্রণিধানযোগ্য সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে এদেশে চালু হয়েছে। 'র'-য়ের আসল উদ্দেশ্য বাংলাভাষী মুসলিম সমাজে এ

ধরণের সংস্কৃতি চালু করা যাতে উত্তরসূরীরা ইসলামিক মূল্যবোধ হারিয়ে তাদের বংশ পরম্পরায় বাংলা নববর্ষ পালনে এ ধরনের হিন্দুয়ানী প্রথা অব্যাহত রাখে। সম্ভবত অচিরেই একদিন আসবে যখন 'র'-য়ের কিছু সদস্য কৌতুকাভিনেতা সেজে আমাদের রাস্তায় কালী, লক্ষী, স্বরস্বতী, রাধা-কৃষ্ণ, অর্জুন অথবা শিবার পোষাকে আবির্ভূত হবে কিংবা উঁচুবর্ণের হিন্দু ব্রাহ্মণের মত ধর্মীয় পাগড়ি পড়ে, কপালে এবং নাকে চন্দনের তিলক এঁকে বিষ্ণাবাস পূজারীর মত ত্রিশূল হাতে রাস্তায় নববর্ষ পালনে বের হবে। ইতোমধ্যে কিছুসংখ্যক লোক বাঙালিত্বের নামে হিন্দুদের ধূতি পরিধান করতে শুরু করেছেন। এদেশের মানুষ ১৯৯০ সালের পূর্বে বাঙালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতির প্রবর্তন দেখেনি। বাংলাদেশের জন্মদাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে ৪টি শহিদ দিবস, ৪টি স্বাধীনতা দিবস, ৪টি নববর্ষ এবং ৩টি বিজয় দিবস বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু বাংলা সংস্কৃতির অংশ হিসেবে মঙ্গলপ্রদীপ, পূজার ঢোল, ঘন্টাধ্বনি ইত্যাদি বাজানোর রীতি প্রবর্তন করেননি। বাংলা নববর্ষ অনুষ্ঠানে রাস্তায় পূজনীয় রামের সহযোদ্ধা হনুমানের মুখোশ পরিধান করা হয়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাজারো ভাষণে বা কাজে বাঙালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতি কখনও পালিত হয়নি। কিন্তু ১৯৯০ ইং হতে ভারতীয় গোয়েন্দাসংস্থা 'র' বাংলা নববর্ষে হিন্দু সংস্কৃতি প্রবর্তনে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে। তাদের আসল উদ্দেশ্য কি? 'র' বুঝতে পেরেছে স্বার্বভৌম বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ইসলামিক ভাবধারা নির্মুল না করতে পারলে কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না। এ উদ্যেশে তারা কিছুসংখ্যক মুসলিম বিপথগামী বুদ্ধিজীবিদের মাধ্যমে বাঙালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। সাম্প্রতিককালে 'র' এদেশের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নের্তৃস্থানীয় কিছু লোক ক্রয় করতে সমর্থ হয়েছে। তারা ভারতীয় কিছুসংখ্যক মুসলিম নামধারী নেতা বাংলাদেশের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতাদের কাছে পাঠায় যাতে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী কোন সমালোচনা না হয়। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম যাতে ইসলামিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য একসময় ভুলে যায় এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে তাহলেই কেবল বাংলাদেশকে ভারতের করদরাজ্য বানানো সহজ হবে।

এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মন্তব্য নিচে উপস্থাপন করা হল :

India wants to encourage a pro-Indian culture in Bangladesh. The Indians are working very tactfully in different walks of life, including political, administrative, cultural arenas, journalists, students and the intellectuals. It should be mentioned here that an Indian daily (The Indian Express, 28 April 1992) in a report said: India's intelligence agency provided about Rs.5 crore to a Bangladeshi political party through the Calcutta office of RAW for election purposes. A former student leader who is known as a mysterious personality in the politics of Bangladesh, attended a seminar titled 'Political trend of South Asia' where he pledged to unite all the Bengali speaking people of Bangladesh, West Bengal, Assam and Tripura (Weekly Khoborer Kagoj, 23 May, 1991).

অনুবাদঃ ভারত বাংলাদেশ অভ্যন্তরে ভারতীয় সংস্কৃতি ধারণ করতে উৎসাহিত করছে। ভারতীয়রা বাংলাদেশের রাজনীতি, প্রশাসন, সাংস্কৃতিক অঙ্গন, গণমাধ্যম, ছাত্রসমাজ এবং বুদ্ধিজীবিদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্নভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবধারা অত্যন্ত চতুরতার সাথে অনুপ্রবেশ ঘটানোর কাজ করছে। এটা এখানে উল্লেখ্য যে, একটি ভারতীয় দৈনিক (দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৮ এপ্রিল ১৯৯২) এক রিপোর্টে প্রকাশ করে যে, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' তাদের কলকাতা অফিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক পার্টিকে নির্বাচন উপলক্ষে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। বাংলাদেশের একজন প্রাক্তন রহস্যময় ছাত্রনেতা যিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে তৎপর তিনি ভারতে অনুষ্ঠিত 'দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট' আলোচনা শীর্ষক একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গ এবং ত্রিপুরার বাংলাভাষীরা একত্র হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছা প্রকাশ করেন (সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ২৩ মে, ১৯৯১)

India has also been trying to confuse the political consciousness of the rising middle class. India has launched an all out media campaign and cultural aggression through her satellite channels, video and print media against Bangladesh. "A group of parasitic and invertebrate people who are totally devoid of

historical facts, kindle Mongal pradeep and blow bell-metal in the cultural functions."(The Weekly Bikram : April 19-25 : 1993).

অনুবাদঃ ভারত বাংলাদেশী মধ্যবিত্ত জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনাকে সন্দেহজনক অবস্থানে এবং বাংলাদেশীদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য টিভি চ্যানেলসমূহ, ভিডিও এবং পত্রপত্রিকায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জোর প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রেখেছে। একটি গোষ্ঠি যারা বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মুসলিম প্রেক্ষাপট অস্বীকার করে তারা মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাদ্যঘন্টা বাজাতে উৎসাহিত হচ্ছে (দ্য উইকলি বিক্রম : এপ্রিল ১৯-২৫,১৯৯৩ইং)

ভারতের সাথে বাংলাদেশের মিলে যাওয়া প্রসঙ্গ

১৯৯১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর কথিত বাংলাদেশী বিশিষ্ট নাগরিক সমন্বয়ে ঢাকায় একটি হোটেলে প্রেস কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন' যাতে এপার ও ওপার বাংলা মিলিত হওয়াসহ পাক-ভারত উপমহাদেশকে একই পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার নীতি অনুসরণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়।

পরবর্তীতে ৩১শে ডিসেম্বর পুনরায় একই উদ্দেশ্যে পুনরায় তথাকথিত কিছুসংখ্যক নাগরিক সমাজ মিলিত হন। ভারত হতে আগত কংগ্রেস পার্টির নেতা তার ভাষণে বলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয় যা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। সুতরাং আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ১৯৪৭ সালের আগস্ট পূর্বে। এ উপলক্ষে সাপ্তাহিক বিচিত্রা ম্যাগাজিনে এ বিষয় নিয়ে একটি ইশতেহার প্রকাশিত হয়। তাছাড়া এ সভায় 'অসম্প্রদায়িক উপমহাদেশের ইশতেহার' নামে সংক্ষিপ্ত পুস্তকাকার লিফলেট বিলি করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় প্রতিরক্ষা, মুদ্রা এবং দায়িত্ব সেন্ট্রালের অধীনে থাকবে। লিফলেটের প্রচ্ছদে ভারতের মানচিত্র আঁকা ছিল। পাকিস্তান বা বাংলাদেশের মানচিত্র অস্পষ্ট ছিল।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত অন্য একটি সেমিনারে (ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিল) ভারতীয় কংগ্রেস নেতা মায়ারাম সার্জিয়ন প্রস্তাব দেন ব্রিটিশ ডিজাইন পরিত্যাগ করে অখণ্ড ভারত হিসেবে আমরা কেন এক হতে পারব না?

ভারতীয় অন্য একজন নেতা শিব নারায়ণ রায়ও তার বক্তব্যে দুই বাংলা এক হয়ে যাওয়ার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন।

১৯৯১ সালের ২রা মার্চ কলকাতাভিত্তিক আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলাদেশকে ভারতের সাথে মিলে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু কীভাবে উভয়বঙ্গ একাট্টা হবে? পশিচমবঙ্গ ভারত হতে আলাদা হয়ে বাংলাদেশের সাথে মিলবে, না বাংলাদেশ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাথে মিলবে - এসমস্ত ব্যাপারে ভারতীয় কোনো নেতা বা পত্রিকা স্পষ্ট করে কিছু বলেনি।

যাইহোক, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এদেশের তথাকথিত কিছুসংখ্যক সমর্থক যোগাড় করতে সমর্থ হয়েছে এবং বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশ এবং বাংলাভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এদেশের ৩০ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে। যদি বাংলাদেশকে ভারতের সাথে মিলে যেতে হয় তাহলে মুক্তিযুদ্ধের কী দরকার ছিল? যদি মিলে যেতে হয় তাহলে ভারতের অবহেলিত প্রদেশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের বংলাভাষীরা ভারত হতে আলাদা হয়ে বাংলাদেশের সাথে মিলে যাওয়া তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, বাংলাভাষাকে সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে কারণে জাতিসংঘও ২১শে ফেব্রুয়ারীকে 'ভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতিপ্রদান করেছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রচারণা

এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, তৃণমূলবিহীন এবং শুধুমাত্র নামেমাত্র প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ' দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। এ পরিষদ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ জানিয়ে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, বারাক ওবামা, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে অসংখ্য অভিযোগ সরাসরি এবং চিঠির মাধ্যমে উত্থাপন করে। চিঠিগুলোর সারসংক্ষেপ ২০০১ সালে লিখিত পূর্ববর্তী চিঠিগুলোর ন্যায় অতিরঞ্জিত ও বানোয়াট। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান

ঐক্য পরিষদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের এক মহাপরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনাতে বাংলাদেশী হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে নানারূপ মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছে যা আদৌ সত্য নয় যেহেতু বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার একটি উদার গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত এবং বাংলাদেশের শতকরা ৯০% মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করছে।

এ প্রতিষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দেশে-বিদেশে তাদের বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে বিনষ্ট করা। এ পরিষদ কফি আনানের কাছে লিখিত বার্তায় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রেক্ষিতে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ কামনা করে। বাংলাদেশে বিশেষ করে হিন্দু সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্মন্ধে অনেক অসত্য কথা প্রায়শঃই উপস্থাপন করে এ পরিষদের নানাবিধ কর্মকাণ্ড আজ বাংলাদেশী জনগণের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ।

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে 'হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন' (HAF) এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ (BHBCUC) কিছু অপচেষ্ঠার নমুনা নিচে পাঠক সমীপে উপস্থাপন করা হল।

'হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশন' এর পক্ষ থেকে পরিচালক সমীর কালরা ও অন্যান্যদের মধ্যে রবীন্দ্র ঘোষ, বৈশাখ কৃষ্ণা, কালিয়াগ বর্শা ইত্যাদি ব্লগার তাদের লেখনীতে ২০০৮-২০১২ সালের মধ্যে এ ধরণের ১২০০ টি ঘটনার কথা উল্লেখ করে। তাছাড়া বর্তমানে আমেরিকায় বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা সীতাংশু গুহ ও তার সমমনা ভারতীয় বেশ কিছুসংখ্যক হিন্দু সদস্য প্রতিনিয়তই বাংলাদেশের সংখ্যলঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে মিথ্যে গুজব রটিয়ে আমেরিকান প্রশাসনের সিনেটরদের কাছে বাংলাদেশের বিপক্ষে ক্রমাগত নালিশ জানিয়ে আসছে যাতে আমেরিকান সরকার বাংলাদেশের পোষাক শিল্প আমদানী এবং জিএসপি সুবিধা বাতিল করে। এ সমস্ত কারণে আমেরিকা সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বাতিল করে।

এ সমস্ত অভিযোগের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বাকীগুলোর কোনোই ভিত্তি নেই। তাদের ভাষ্য- "বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চলছে। এ নির্যাতনে সরকারী আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোও তাল মিলিয়ে হিন্দুদের ধনসম্পত্তি লুট করে মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করছে, হিন্দু মহিলাদেরকে বলাৎকার, ধর্মান্তরিত করা, ঠান্ডা মাথায় খুন করা, মন্দিরে ঢুকে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙা ইত্যাদি নির্যাতনমূলক কাজের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়কে নিঃশেষ করে

দেওয়ার এক মহাপরিকল্পনা মুসলিম মৌলবাদীরা হাতে নিয়েছে" - এ দুটো প্রতিষ্ঠান দেশে এবং বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশ সম্বন্ধে এ ধরণের মিথ্যে অপপ্রচার চালিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টায় লিপ্ত আছে।

২০১৯ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার প্রয়াসে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জনৈক নেত্রী (প্রাক্তন সাংগঠনিক সম্পাদক, প্রিয়া বালা সাহা) মিথ্যে এবং বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপন করে। ইতিপূর্বে উক্ত পরিষদের সাধারণ সম্পাদকও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে অনুরূপ বক্তব্য তুলে ধরেছিলেন।

সাম্প্রতিককালে হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মন্দিরে প্রতিমা ভেঙ্গে দেওয়ার মত ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তারা দুর্বৃত্ত বলে বাংলাদেশের মানুষ জানে এবং এ ধরনের ঘটনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে বিবেচিত। কিছুসংখ্যক দুর্বৃত্তদের এরূপ হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডকে বাংলাদেশ সরকার বা আপামর মুসলিম সম্প্রদায় ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান হাজার হাজার বছর ধরে সহাবস্থান করে আসছে। তাই বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ হিসেবে বিশ্বে সর্বাধিক পরিচিত।

বাংলাদেশের মুসলিম জনগণ প্রতিবেশী হিন্দু-বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হাজার বছর ধরে অংশগ্রহণ করে আসছে। প্রতিবেশী হিন্দু বাড়িতে তাদের পূজা-পার্বণে এবং খ্রিস্টানদের বড়দিনে সাহায্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলো হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করে আসছে। অথচ প্রতিবেশী হিন্দু-খ্রিস্টান কিংবা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কি মুসলিমদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনোদিন যোগ দিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেছে? একথা অনস্বীকার্য যে, এদেশের মুসলিমরা তাদের সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের ব্যাপারে অত্যন্ত উদার।

কিছুসংখ্যক দূর্বৃত্তের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার পর বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রামের রামুতে সেনাবাহিনী ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় চোখজুড়ানো বৌদ্ধবিহার নির্মাণ এবং ক্ষতিগ্রস্থ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরকে বাংলাদেশের জনগন প্রদত্ত রাষ্ট্রকোষ হতে অসামান্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।

ঠিক তেমনি সাতক্ষীরা ও যশোরে দুর্বৃত্তদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ মুষ্টিমেয় কয়েকটি হিন্দু পরিবারকে সরকারী পৃষ্টপোষকতায় পুনর্বাসন, আর্থিক সাহায্য এবং নতুন করে ধর্মমন্দির প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

সংখ্যালঘুদের উপর বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের একাত্মতা এবং সহমর্মিতাবোধ একথাই প্রমাণ করে যে, এদেশ কতটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ, এদেশের মানুষ প্রতিবেশী দেশ ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা ও পাকিস্তান হতে অনেক সহনশীল জাতি হিসেবে নিজেদেরকে বার বার প্রমাণ করেছে।

রামুতে বৌদ্ধমন্দিরে আক্রমণের কারণ পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সাম্প্রতিককালে মায়ানমারে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাদের দেশের অসংখ্য মুসলিম জনগণের উপর সে দেশের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের ঈশারায় এবং সক্রিয় সহযোগিতায় যে অমানবিক নির্যাতন, হাজার হাজার মুসলিম পরিবারকে নির্বিচারে হত্যা এবং স্থানীয় রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠিকে দেশান্তরিত করে বাংলাদেশ অভ্যন্তরে ঠেলে দেয় তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে রামুতে বসবাসরত বৌদ্ধমন্দিরের উপর। ক্রোধে ফেটে পড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কিছুসংখ্যক শরণার্থী স্থানীয় দুর্বৃত্তদের সহায়তায় বৌদ্ধপ্রতিমা রাতের অন্ধকারে ভাংচুর করে যাতে সেখানকার বাংলাদেশী সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততা ছিল না বরং তারা স্থানীয় বৌদ্ধদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আপনজনের ভূমিকা নিয়ে যে কারণে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কারোর প্রাণহানি ঘটেনি।

জাতিসংঘের প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল কফি আনান ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে লিখিত অসংখ্য অভিযোগপত্র এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার এ অপচেষ্টা 'হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ' এবং 'হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের' দেশপ্রেম নিয়ে অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়।

তারা এও অপপ্রচার চালায় যে, বাংলাদেশের পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং সরকারী চাকুরীতে কর্মরত হিন্দু চাকুরীজীবিদের পদোন্নতি দেওয়া হচ্ছে না। অথচ একথা সত্য যে, মাত্র ৮% সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত লোকেরা বাংলাদেশে প্রাথমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৩২%, তদ্রুপ অন্যান্য সকল সরকারী প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন, বিজিবি, পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে উচ্চপদস্থ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভূক্ত চাকুরীজীবির হার সংখ্যাগুরু ৯০% মুসলিমদের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকদের আর্থিক অবস্থা মুসলিমদের তুলনায় অনেক উন্নত। সংখ্যালঘুদের মধ্যে

বেকারত্বের হার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের চেয়ে তুলনায় অতি নগণ্য। অর্থনৈতিকভাবে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরু ৯০% মুসলিমদের তুলনায় অনেক সমৃদ্ধ যে কারণে সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটি ভিখারী কিংবা বেকার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে তাদের ২০ কোটি মুসলিমদের জন্য টিভি চ্যানেলগুলোতে আলাদা করে কোনো ঈদের অনুষ্ঠান ঘটা করে প্রচারের দৃশ্য চোখে পড়ে না। যদিও কোনো টিভি চ্যানেল ঈদের জাময়াত নিয়ে খন্ডচিত্র দেখায় তার কলেবর হয় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বরং তাদের দেশের তৃতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় খ্রিস্টানদের বড়দিনের অনুষ্ঠান ঘটা করে প্রচার করে। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার এবং অস্তিত্বকে এতে অনেকটা নগণ্য বা হেয় করা হচ্ছে। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারত ধর্মনিরপেক্ষ এবং সর্বাধিক গণতন্ত্রের দেশ হিসেবে পরিচিত অথচ তাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় সর্বক্ষেত্রে নির্যাতিত, অবহেলিত ও পশ্চাদপদ। সরকারী চাকুরীক্ষেত্রে, সেনাবাহিনীতে মুসলিমদের অবস্থান সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে একেবারেই নাজুক যা স্বীকার করে পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী বিভিন্ন বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।

ভারত বিভক্ত হওয়ার পর সেদেশে ১৯৫৪-১৯৯২ সালের মধ্যে মোট তেরোহাজার পাঁচশত আটান্নবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। সাম্প্রতিককালে গুজরাট, মুম্বাইয়ের ভয়াবহ দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসলিম নিধন করা হলেও ভারত সরকার এ সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ মুসলিম নাগরিকদেরকে পুনর্বাসিত করেনি কিংবা কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করেনি বরং আজকাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ জুড়ে মুসলিম নির্যাতন বেড়েই চলেছে। এ সমস্ত অপকর্মের প্রতিবাদ করে আসছে মানবাধিকার সংগঠন কর্মী এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের অসংখ্য ব্যক্তিবর্গ।

পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংঙ্কা, মালদ্বীপ ও সিকিম-এ 'র' (RAW) এর প্রভাব[১৯]

পাকিস্তানী নাগরিক কাশ্মীরি মুজাহিদীন পার্টির সদস্য জিয়াউর রহমান ওরফে ওয়াকাস ২০১৪ সালের এপ্রিলে ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণের পর ইমিগ্রেশন কাউন্টারে ভারতীয় 'র' এজেন্টের কাছে ধরা পড়ে। বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সামনেই ছদ্মবেশী 'র' এজেন্ট (ঢাকা বিমানবন্দর 'র' কাউন্টারে কর্মরত) ওয়াকাসকে কাশ্মীরী হিজবুল মোজাহিদীন পার্টির সদস্য এবং পাকিস্তানী আইএসআই এজেন্ট সন্দেহে বন্দী করে ভারতের দিল্লীতে পাচার করে। ১৬ই এপ্রিল'১৬ এ খবর ভারতীয় টাইমস্ পত্রিকায় 'র' এজেন্টের সাফল্যজনক অপারেশন নিয়ে বিস্তারিত ছাপা হয়। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায়ও এ খবর ফলাও করে ছাপা হয়। ব্যক্ত থাকে যে, ২০০৮ সালে আহমেদাবাদে মোজাহিদীন কর্তৃক বোমা আক্রমণে ৫০ জন মৃত্যুবরণ এবং ২০০ জন আহত হয়েছিল। ২০১০ সালে কাশ্মীরী হিজবুল মোজাহিদীন পার্টিকে ভারত কালো তালিকাভূক্ত করে তাদের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করে। ওয়াকাসের সূত্র ধরে ভারতে ছদ্মবেশী মোজাহিদীনের অন্যতম নেতা ইয়াসিন বাটকালকে নেপালের পুকরা থেকে ১৩ই আগষ্ট'১৬ তে 'র' বন্দী করতে সমর্থ হয়। মোজাহিদীন সদস্য তেহসিন আক্তারকেও বন্দী করে। 'র' এজেন্ট ২০০৯ সালে চারজন উলফা নেতা তাদের প্রধান অরবিন্দসহ চট্টগ্রাম হতে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়। বন্দী বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী বালাদেশ জেলে বন্দী উলফা নেতা অনুপ চেটিয়াকেও বাংলাদেশ সরকার 'র' কাছে তুলে দেয়। বিভিন্ন রিপোর্টে জানা যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং প্রশাসনের প্রতিটি স্তরেই 'র' এর উপস্থিতি বর্তমান।

ভারতীয় 'র' শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভূটান এবং মালদ্বীপেও তৎপর।

শ্রীলঙ্কায় তামিল গেরিলাদেরকে 'র'-এর সিদ্ধান্তক্রমে ভারত সরকার প্রচুর গোলাবারুদ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে শ্রীলঙ্কা সরকারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। দীর্ঘমেয়াদী এ যুদ্ধে শ্রীলঙ্কার তামিল গেরিলা ও সরকারী বাহিনীর প্রচুর সেনাসদস্য হতাহত হয়। তামিল গেরিলা প্রধান প্রভাকরণ এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী হত্যার পর তামিলদের সাথে শ্রীলঙ্কা সরকারের

---

১৯. Bangladesh RAW tentacles spreading - The London Post, 25th April,2014 / Indian RAW operations in south Asian countries ,Aug 10,2014

শান্তি চুক্তি মোতাবেক গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। ঠিক এভাবে মালদ্বীপে ভারতীয় সৈন্যের অনুপ্রবেশে মালদ্বীপের রাজনৈতিক অঙ্গন অশান্ত হয়ে ওঠে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ১৯৭৫ সালে সিকিমে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটায় এবং সিকিমকে ভারতের করদ রাজ্যে রূপান্তরিত করে।

অপারেশন স্মাইলিং বুদ্ধ এবং অপারেশন কোহাটা

এটি ভারতীয় আণবিক প্রোগ্রামের কোড নেম। ১৯৭৪ সালের ১৮ই মে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর নামকরণ করে এবং ১৫ কিলোটন পারমাণবিক বোমা পুকরার মরুভূমিতে পরীক্ষা চালানোর মাধ্যমে ভারত আণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে নিজেদের নাম লিখায়। ১৯৭৮ সলের দিকে 'র' পাকিস্তানের গোপনীয় কোহাটা আণবিক প্রকল্প (কে. আর. এল - খান রিচার্স ল্যাবরেটরীজ) সম্মন্ধে জানতে পারে। পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ এ আণবিক প্রকল্পে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের মাধ্যমে আণবিক বোমা ও দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম এমন তথ্য ভারতকে চিন্তান্বিত করে তুলে। 'র' কোহাটার খান রিসার্চ ল্যাবরেটরী নিয়ন্ত্রণাধীন পার্শবর্তী একটি সেলুন হতে অর্থের বিনিময়ে পাকিস্তানী আণবিক বিজ্ঞানীদের কাটা চুলের নমুনা সংগ্রহ করে এবং ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয় যে, পাকিস্তান আণবিক বোমার জন্য প্রয়োজনীয় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করতে সক্ষম। ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী মোররজী দেশাইয়ের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ অনুযায়ী 'র' পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান এ প্রকল্পের অগ্রগতি রোধ করা হতে বিরত থাকে যেহেতু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে 'র' এ কাজে হাত দিয়েছিল কিন্তু মোরারজী দেশাই ভারতের নিজস্ব আণবিক প্রকল্পে প্রতিশোধমূলক পাকিস্তানী গোয়েন্দাগিরি এড়াতে এ সিদ্ধান্ত নেন।

পাকিস্তান ভূ-খণ্ডে 'র'- এর অনুপ্রবেশ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর 'র' মনযোগী হয়ে ওঠে কীভাবে পাকিস্তানকে কোনঠাসা এবং অস্থিতিশীল করা যায়। এবার পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের দিকে 'র' নজর দেয়। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া গরীব বেলুচিস্তান পাকিস্তানের একটি অবহেলিত প্রদেশ। বেলুচিস্তানকেও যদি বাংলাদেশের মতো পাকিস্তান হতে আলাদা করা যায় তাহলে পাকিস্তানকে সার্বিকভাবে দূর্বল করে দেওয়া যাবে এবং পাকিস্তানের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া সহজতর

হবে। এজন্য 'র' পাকিস্তান অভ্যন্তরে দুটো গ্রুপ পাঠায়। টিম-এক্স (সিআইটি-এক্স) এবং টিম-জে (সিআইটি-জে)। সিআইটি-এক্স এর মিশন বাস্তবায়ন করার জন্য 'র' এজেন্ট রবীন্দর সিং এবং তার সহযোগিরা পাকিস্তান অভ্যন্তরে গোলাবারুদ সরবরাহ এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করে।

আমেরিকার সিআইএ ২০০৪ সালে রবীন্দর সিং এর উপর নজরদারী করে পাকিস্তান কাউন্টার ইনটেলিজেন্সকে এ তথ্য জানায়। সিআইটি-জে ভারতের পাঞ্জাবে কালিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য শিখরা যে দাবি জানিয়ে আসছিল সে পরিকল্পনা নাকচ করে দেওয়ার জন্য কাজ করছিল। ভারতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে পাকিস্তানের আইএসআই কালিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে জোরালো করার জন্য শিখ বিদ্রোহীদেরকে মদদ জুগিয়ে আসছিল। অন্যদিকে ভারতীয় 'র', ইসরাইলি মোসাদ ও আমেরিকান সিআইএ পাকিস্তান অভ্যন্তরে শিয়া-সুন্নির মধ্যে হানাহানি এবং প্রতিহিংসা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানে সংগঠিত শিয়া-সুন্নির হিংসাত্বক কার্যকলাপ পাকিস্তানকে প্রায় অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। প্রতিদিনের খুন-খারাবির চিত্র ভয়াবহ এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যত নিয়ে শংকার সৃষ্টি হয়েছে।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ ও মুম্বাই হামলা

২০০৯ সালে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নাল এবং বিডিআইএনএন.কম ফাইলস্ এ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে, 'র' জানতে পারে, ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিবেশী দেশ নেপাল এবং বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের এজেন্টরা এবং কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বিভিন্ন প্রবেশ পথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করছে। 'র'-এর নজরদারীতে এদের অনেকেই ভারতে ধরা পড়ে এবং তাদেরকে প্রশ্ন করার জন্য 'র' তাদেরকে গুম করে গোপনীয় আস্তানায় নিয়ে যায়। এদের মধ্যে প্রায় ৪০০ জনকে 'র' গুম করে এবং বিখ্যাত কয়েকজনের নাম হিসেবে এসেছে কালিস্তান মুক্তি আন্দোলনের নেতা ভূপিন্দর সিং বোধা, কাশ্মীরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তারিক মাহমুদ, শেখ আব্দুল খাওয়াজা (মুম্বাই হোটেল আক্রমণ পরিকল্পনাকারীদের একজন) এবং আরো অনেকে। এদের অনেককেই ভারতের তিহার জেলে বন্দী করে রাখা হয় এবং কয়েকজনকে ফাঁসিকাঠে ঝুলানো হয়।

অপারেশন লিচ

মায়ানমারের কমিউনিষ্ট সরকার ভারতের জন্য উদ্বেগের বিষয় বলে ভারত মনে করে। সাম্প্রতিককালে ভারতে মাওবাদী আন্দোলন প্রকট হয়ে উঠে। মায়ানমারের কমিউনিষ্ট গেরিলারা ভারতের সেভেন সিষ্টার অঙ্গরাজ্যসমূহে ঢুকে ভারতীয় পাহাড়ী জনপদকে কমিউনিষ্ট বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করে গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে ভারতকে অস্থিতিশীল করে রাখে এবং পাকিস্তানের আইএসআই এদেরকে ইন্ধন যোগায়।

বাংলাদেশের নৌ-বন্দর ব্যবহার করে আইএসআই ভারতের সেভেন সিস্টার অঙ্গরাজ্যসমূহে বিভিন্ন সময় অস্ত্রের যোগান দেয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দশট্রাক অস্ত্রের চোরাচালান ধরা পড়ে। আসামের উলফা নেতা অনুপ চেটিয়াসহ সেভেন সিস্টার অঙ্গরাজ্যের বেশ কিছু নেতা বাংলাদেশে ধরা পড়ে এবং বাংলাদেশ-ভারত বন্দি বিনিময় চুক্তি অনুসারে 'র' এর হাতে এ সমস্ত বন্দীদেরকে তুলে দিতে ভারত চাপ দিতে থাকে। এদিকে বাংলাদেশও ভারতে পালিয়ে থাকা সিরিয়াল কিলার ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার খলনায়কদের খুঁজে বাংলাদেশে হস্তান্তরের জন্য অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশের বেশ কিছু সিরিয়াল কিলার ভারতে পালিয়ে থেকেও বাংলাদেশ অভ্যন্তরে তাদের সহযোগিদের মাধ্যমে চাঁদাবাজি করছে অথচ তাদের কাউকে বন্দি বিনিময় চুক্তি অনুসারে ভারত এ সমস্ত সন্ত্রাসীদেরকে আটক করে বাংলাদেশ সরকারের কাছে ফেরত দেয়নি।

এদিকে 'র' মায়ানমারের কমিউনিস্ট বিদ্রোহী গেরিলা সংগঠন কেআইএ (কচিন ইনডিপেন্ডডেন্ট আর্মি)-কে ভারতীয় ভূখণ্ডে ট্রেনিং এবং অর্থ সাহায্য দিয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। সাম্প্রতিককালে কেআইএ-র নেতা 'মারান ব্রাঙ্গ সেং' ভারতের 'র' প্রধানের সাথে দু'বার দেখা করেন। কেআইএ ভারতীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যখন উত্তর-পূর্ব অঙ্গরাজ্যের বিদ্রোহীদেরকে ট্রেনিং প্রদান করতে থাকে তখন 'র' প্রতিশোধ গ্রহণের অংশ হিসেবে 'অপারেশন লিচ' চালিয়ে ন্যাশনাল ইউনিটি পার্টি অব আরাকান-এর নেতা 'কায়িং রাজাসহ' ছয়জন বিদ্রোহী নেতাকে হত্যা করে এবং ৩৪ জনকে বন্দী করতে সমর্থ হয়।

অপারেশন চাণক্য

ভারতীয় 'র' আবিষ্কার করে যে, পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই কাশ্মীর অভ্যন্তরে স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন সংগঠনকে ট্রেনিং, অর্থ এবং অস্ত্রসজ্জিত করে কাশ্মীর অভ্যন্তরে প্রেরণ করছে। 'র' বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন 'হিজবুল মুজাহিদীনকে' ঠেকিয়ে রাখতে অখণ্ড ভারত সমর্থক 'ইখওয়াতুল মুসলিমুন' নামে একটি পার্টি সৃষ্টি করে পাকিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং স্বাধীন কাশ্মীরপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের বিরুদ্ধে ইখওয়াতুল মুসলিমুনকে লেলিয়ে দিয়ে কাশ্মীরে প্রশাসনিক এবং সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়।

পাকিস্তানের সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান প্রদেশে 'র' অধিক তৎপর। পাকিস্তানকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য ইরাক-ইরান-সিরিয়া-লেবাননের মত একই কায়দায় শিয়া-সুন্নির মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করা, রাজনৈতিক অঙ্গনকে অস্থিতিশীল রাখা এবং পাকিস্তানের আণবিক প্রকল্প সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার লক্ষে ভারতীয় 'র', ইসরাইলি 'মোসাদ' এবং আমেরিকার সিআইএ যুক্তভাবে কাজ করছে।

ভারত-বাংলাদেশের বিবাদমান সমস্যা

উভয় দেশজুড়ে প্রবাহিত নদীগুলোর নায্য হিস্যার ভিত্তিতে পানি বণ্টনের কথা থাকলেও গ্রীষ্ম মৌসুমে ভারত বাংলাদেশকে বঞ্চিত করে একতরফা পানি অপসারণ করে নিজেদের আভ্যন্তরীণ নদীগুলোকে নাব্য রাখছে। ফলে বাংলাদেশের উত্তরাংশের বিস্তৃত অঞ্চল আজ শুষ্ক মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতির সুরাহার জন্য বাংলাদেশ ভারতকে বহুদিন যাবত চাপ দিয়ে আসলেও ভারত এর সুরাহার ব্যাপারে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ এর গুলিতে অন্যায়ভাবে বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা। ২০০১-১৯ সাল পর্যন্ত একহাজারের উপরে বাংলাদেশী নাগরিকদেরকে ভারতীয় বিএসএফ গুলি করে হত্যা করে। ভারত সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানালেও কার্যত এর কোনো সুরাহা হয়নি। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় বিএসএফ প্রধান, প্রধানমন্ত্রী, সেনাবাহিনীপ্রধান ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে বিভিন্ন বৈঠকে এবং সংবাদ সম্মেলনে ভারত কথা দেওয়া পরও বিএসএফ কর্তৃক প্রতিনিয়ত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে।

সীমান্তে অন্য দেশের নাগরিককে গুলি করে হত্যা আন্তর্জাতিক আইন পরিপন্থী। বাংলাদেশী কৃষক সম্প্রদায় অনেক সময় সীমান্তে তাদের নিজস্ব জমিতে কৃষিকাজ করতে গিয়ে গরুপাচার কিংবা চোরাকারবারের অভিযোগে বিএসএফ-এর বেধড়ক মারপিট এবং হত্যাযজ্ঞের শিকার হতে হচ্ছে। যদি গরুপাচার কিংবা চোরাকারবারের অভিযোগ তোলা হয় তাহলে উভয় দেশের সীমান্তের লোকজন অবশ্যই এতে জড়িত। তাহলে এ পর্যন্ত ভারতীয় কোন চোরাকারবারীকে হত্যার শিকার হতে হয়নি কেন? এ ধরণের হত্যাযজ্ঞ কবে বন্ধ হবে তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছেনা। সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক হত্যা বিএসএফ-এর কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এ কারণে বাংলাদেশীদের মনে ভারতবিরোধী মনোভাব ক্রমেই প্রগাঢ় হচ্ছে। উভয় দেশের জনগন ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস অর্জনে এর সূরাহা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে ভারত ভূখণ্ডে মাদক প্রস্তুতকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এ সমস্ত মাদকসম্ভার রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশে অবাধে চালান দেওয়া হয় যা প্রতিরোধে ভারত সরকারের কোন মাথাব্যাথা নেই বা মাদক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণের তৎপরতা লক্ষ করা যায় না।

ভারত সরকারের সাথে চলমান ভারত-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক চুক্তির অধীনে বাংলাদেশে ভারতীয় ছবি এবং টিভি চ্যানেলের অবাধ বিচরণ থাকলেও বাংলাভাষী ভারতীয়রা বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলো দেখার সুযোগ পায় না। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার এবং কেবল অপারেটরদের অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত সরকার এবং ভারতীয় প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলো এ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বা কোনো আগ্রহ দেখায়নি।

ফ্রান্সের ডিজিএসই (DGSE)

Direction générale de la sécurité extérieure ev General Directorate for External Security ১৯৮২ সালের ২রা এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্যারিসে এর হেডকোয়ার্টার। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ডিরেক্টর বার্নাড বেজোলেট। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় নিয়োজিত ডিসিআরআই (DCRI)-কে আভ্যন্তরীণ ও বহিঁশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে ডিজিএসই বিশেষ ভূমিকা রাখে। বহির্বিশ্বে ডিজিএসই ফ্রান্সের স্বার্থ সংরক্ষণে সার্বক্ষণিক তৎপর। ১৯৪৭ সাল হতে ৮২ সাল পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান ভিন্ন নামে সকল কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়।

১৯৬০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইউনিট DCRI-এর সদস্য দ্বারা অপহৃত মরক্কোর স্বাধীনতাসংগ্রামী নাগরিক মেহদী বিন বারাকাকে হত্যা করা হয়। খবরটি মরক্কো এবং ফ্রান্স জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করলে এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে সরাসরি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলে যায় এবং এর নতুন নামকরণ করা হয় ডিজিএসই।

১৯৯১ এর উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকার সাথে ফ্রান্সের সরাসরি অংশগ্রহণের কারণে ডিজিএসই-র সর্বময় ক্ষমতা মিলিটারি ইনটেলিজেন্স ডাইরেক্টরেটের উপর ন্যস্ত হয়। এর পেছনে আরেকটি কারণ ছিল- ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইউনিট SDECE এর ভেতর ১৯৫০ সালের দিকে সোভিয়েত কেজিবি সদস্যের অনুপ্রবেশ ঘটে। সোভিয়েত কেজিবি-র অনুপ্রবেশের কারণে ফ্রান্সের ইনটেলিজেন্স সংস্থাগুলো বহির্বিশ্বে বিভিন্নভাবে নাজেহাল হচ্ছিল। তাছাড়া ফ্রান্সের ডান এবং বাম রাজনৈতিক পার্টিগুলোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ায় এ সংস্থা সঠিকভাবে কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারেনি।

প্রেসিডেন্ট চিরাক এবং ২০০২ সালের বামপন্থী প্রেসিডেন্ট পদপ্রাথী লায়নেল জসপিন-এর মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা থাকায় ইনটেলিজেন্স সংস্থা ডিজিএসই সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণে বার বার হোঁচট খাচ্ছিল। এ সংস্থার এ্যাকশন ডিভিশন ফ্রান্সের পারমাণবিক সেক্টরগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বহিশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা নিয়ন্ত্রন করে।

১৯৯৯ সালে ডিজিএসই ফ্রান্সের নাগরিকদের মধ্য হতে ২,৭০০ জন কর্মচারী এবং ১,৩০০ নন-কমিশন কর্মকর্তা নিয়োগ করে। ২০১৯ সালে এ

সংখ্যা ৬১০২ জনে উন্নীত হয়। বহির্বিশ্বে অবস্থানরত ফ্রান্সের নাগরিকদের মধ্য হতে এর অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী স্পাই রয়েছে যারা "honorable correspondant" হিসেবে খ্যাত।

২০২০ সালে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয় ৭৩১.৮ মিলিয়ন ইউরো। মোট অর্থ বরাদ্দের ২৫% মিলিটারি ইনটেলিজেন্স, ২৫% ইকোনমিক ইনটেলিজেন্স এবং ৫০% ডিপ্লোমেটিক ইনটেলিজেন্স তাদের বিভিন্ন মিশনে খরচ করে থাকে।

ডিজিএসই-র বিভিন্ন কর্মকাণ্ড[২০]

আফগানিস্তান হতে সোভিয়েত সৈন্য সরে যাওয়ার পর শান্তিরক্ষা মিশনে ফ্রান্স আমেরিকার সিআইএ-র সাথে মতৈক্যের ভিত্তিতে ডিজিএসই সদস্যদেরকে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অগ্রবর্তী দল হিসেবে আফগানিস্তানে প্রেরণ করে।

১৯৭৯ সালে ডিজিএসই সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক-এ 'অপারেশন বারাকোদা' নামক রাজনৈতিক প্রচারণা চালিয়ে আফ্রিকান রিপাবলিক সম্রাট 'জিন বেদেল বোকাসাকে' ক্ষমতাচ্যুত করে এবং পরিবর্তে ফ্রান্সের পছন্দনীয় সরকারকে স্থলাভিষিক্ত করে।

১৯৭০-৮০ সালের মধ্যে ডিজিএসই আমেরিকার বৃহৎ কোম্পানিগুলো যাদের নেটওয়ার্ক সমগ্র বিশ্বজুড়ে যেমন আইবিএম, কর্নিং ইত্যাদি কোম্পানিতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে প্রচুর শেয়ার কিনে নেয়।

১৯৮০ সালের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকায় অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ডিজিএসই কম্পিউটার প্রযুক্তির বিভিন্ন স্থাপনার গোপনীয় তথ্য অত্যন্ত সফলভাবে সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। ডিজিএসই-এর কিছু সদস্য গোপনে এ সমস্ত তথ্য রাশিয়ার কাছে বিক্রি করে ফলে ইউরোপ এবং আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়ন সম্মন্ধে রাশিয়ার কেজিবি জেনে যায়। ডিজিএসই-এর কিছুসংখ্যক সদস্যদের উপর কড়া নজরদারী রাখার ফলে এ

---

২০. Inside France's Dgse: the Rosen Publishing Group, French Senate report, The Growth of Economic Espionage by dgse, by: Schweizer, Peter, The Rwanda crisis: history of a genocide: Columbia University Press and many more int'l spy journals, periodicals & news letters

তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। ফ্রান্স সরকার রাশিয়ার কাছে এ সমস্ত তথ্য সরবরাহকারীদের উপর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করে।

ডিজিএসই সফলতার সাথে ফ্রেন্স ডিফেন্স কোম্পানি কর্তক প্রস্তুতকৃত ২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ৪৩টি মিরেজ-২০০০ যুদ্ধ বিমান ভারতের কাছে বিক্রি করতে সমর্থ হয়। উক্ত সময় ভারত কর্তৃক আমদানীকৃত রাশিয়ান টি-৭২ অত্যাধুনিক ট্যাংকের প্রযুক্তিগত তথ্য আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়।

ফ্রান্সের পারমাণবিক পরীক্ষার প্রতিবন্ধকতাকারী 'গ্রিনপিস সদস্যদের' বিরুদ্ধাচরণের কারণে বিগত প্রেসিডেন্ট মিটারেন্ড-এর নির্দেশে নিউজিল্যান্ডের সমুদ্র সীমানায় নেদারল্যান্ডের আমষ্টারডাম সমুদ্রবন্দর হতে ছেড়ে আসা ডাচ রণতরী 'রেইনবো ওয়ারিয়র' ১৯৮৫ সালের ১০ই জুলাই ফ্রান্স ইনটেলিজেন্স অকল্যান্ড সাগরে ডুবিয়ে দেয়। নিউজিল্যান্ড পুলিশ আবিষ্কার করে যে, উক্ত জাহাজে দুজন ডিজিএসই এজেন্ট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জাহাজটি ডুবিয়ে দেয়। নিউজিল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ড সরকার এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং এ দুদেশের সাথে ফ্রান্সের রাজনৈতিক স্থবিরতা সৃষ্টি হয়।

১৯৯০ সালে আফ্রিকার রুয়ান্ডার গৃহযুদ্ধে ডিজিএসই ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন ভুল তথ্য সরবরাহ করে যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়। ফ্রান্স যাতে রুয়ান্ডাতে বিদ্রোহীদের উপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারে এবং গৃহযুদ্ধ শেষে ফ্রান্সের স্বার্থ আদায়ের পথ সুগম হয়।

১৯৯০ সালে আল কায়েদা অভ্যন্তরে ডিজিএসই গোয়েন্দা ওমর নাসিরি ছদ্মনামে অনুপ্রবেশ করে এবং এর আভ্যন্তরিণ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্মন্ধে অবহিত হয় যা 'মাই লাইফ উইথ আল কায়েদা' শিরোনামে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়। ফাঁস হয়ে যাওয়া ডিজিএসই রিপোর্টের এক তথ্যে জানা যায় আমেরিকার সিআইএ এবং ব্রিটেনের এমআইসিক্স গোয়েন্দা সংস্থা আফগানিস্তানের আল-কায়েদার এক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনিং ক্যাম্প ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের দুবছর পর ওসামা বিন লাদেনের কাছে হস্তান্তর করে।

২০০৪ সালে ডিজিএসই ইরাকে বন্দী ফ্রেন্স জার্নালিষ্ট জর্জেস মালব্রনট এবং খ্রিষ্টিয়ান চেস্নটকে ১২৪ দিনের মাথায় উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। তাছাড়া ২০০৫ সালের ১২ই জুন ফ্লোরেন্স আবিনাস নামক অন্য একজন অপহৃত সাংবাদিককে ৫ মাস পর উদ্ধার করে।

২০০৬ সালের জানুয়ারীতে ডিজিএসই মৌরিতানিয়াতে নিহত ৪জন ফ্রেন্স ট্যুরিষ্টদের ২জন ঘাতককে চিহ্নিত ও বন্দি করতে সক্ষম হয়।

২০০৯ সালে ডিজিএসই আবিষ্কার করে যে, ব্রাজিলের সন্নিকটে এয়ার ফ্রান্সের বিমান দুর্ঘটনায় ২২৮ জন যাত্রী প্রাণ হারায়। এরমধ্যে ২জন সন্ত্রাসী ছিল বলে ডিজিএসই চিহ্নিত করে।

২০১০ সালে ডিজিএসই বাহরাইন জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর দাঙ্গা ইউনিটের ট্রেনিংয়ের কাজ পায়। বাহরাইন জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী এ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে এক শক্তিশালী দাঙ্গা প্রতিরোধ ইউনিট গঠনের মাধ্যমে উপকৃত হয়।

২০১১ সালের মার্চে লিবিয়ার গাদ্দাফি সরকারের বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে ডিজিএসই গোপনে কিছু সদস্য পাঠায় যারা বিদ্রোহীদেরকে প্রভাবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চীনের মিনিস্ট্রি অব স্টেট সিকিউরিটি (MSS)

Ministry of public security of the people's republic of China

চীনের বেইজিং-এ প্রতিষ্ঠিত এমএসএস-এর গোয়েন্দা সদর দপ্তর চীনের অভ্যন্তর ও বহির্বিশ্বের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এর কর্মকাণ্ড বিস্তৃত। ১৯৩৭-৪৫ সাল পর্যন্ত সিনো-জাপানিজ যুদ্ধে এ প্রতিষ্ঠানের গোয়েন্দারা বিশেষ ভূমিকা রাখে। ১৯৪৬-৪৯ সালের কমিউনিষ্ট বিপ্লবের গৃহযুদ্ধে এ সংস্থা সরকারী বাহিনীকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করে। এ প্রতিষ্ঠানের কিছুসংখ্যক উচ্চপদস্থ মিলিটারি অফিসারকে সরকারী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করে ১৯৮৩ সালে সরকারীভাবে 'মিনিস্ট্রি অব স্টেট সিকিউরিটি' গঠন করা হয়।

চীনের বিস্তৃত ভূ-খণ্ড জুড়ে কমিউনিষ্ট সরকারের আধিপত্য ধরে রাখার কাজে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। একাধারে বহির্বিশ্বের প্রভাবকে প্রতিহত করার লক্ষ্য নিয়ে সমগ্র বিশ্বে এ সংস্থা কাজ করছে যার ফলে ১৯১৪ সালের জরিপে প্রথম দশটি প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে এমএসএস নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে।

আমেরিকার সিআইএ, রাশিয়ার কেজিবি/এফএসডি, ব্রিটেনের এমআইসিক্স/সিস, ইসরাইলের মোসাদ, ফ্রান্সের ডিজিএসই, জার্মানির বিএনডি, ভারতের 'র' এবং জাপান ও তাইওয়ানের গোয়েন্দা সংস্থার অভ্যন্তরে চীনের গোয়েন্দাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চীন পরমাণু অস্ত্র এবং অসংখ্য মিলিটারি তথ্য আয়ত্ত্বে আনতে সক্ষম হয়। মিলিটারি কৌশল, তথ্য ইত্যাদির সমন্বয়ে নিজেদেরকে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র প্রস্তুতকারী এবং পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে চীন এক পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

একই ধরনের মিলিটারি যুদ্ধাস্ত্র সস্তায় পাওয়া যায় বলে আজ বিশ্ব চীনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া কিংবা জার্মানি সহজলভ্য, সস্তা এবং উন্নত প্রযুক্তিসমৃদ্ধ চীনের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে পেরে উঠছেনা। উচ্চপর্যায়ের চীনা গোয়েন্দাদের একটি বাহিনী ছাত্র, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার, সাংবাদিক, ইত্যাদি ছদ্মাবরণে আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, জাপান ও তাইওয়ান অভ্যন্তরে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে নিয়েজিত আছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

এমএসএস চীনের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে প্রথমে তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। দেশকে এগিয়ে নিতে সফল অর্থনীতির বিকল্প নেই। এ

উদ্দেশ্যক সামনে রেখে চীনের কমিউনিষ্ট সরকার দেশের আনাচে-কানাচে শিল্প উদ্যোক্তা গড়ে তুলে। শিল্পসংস্থাসমূহকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে হলে প্রযুক্তিগত উন্নয়নসাধন জরুরি।

চীন এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের গোয়েন্দা সংস্থা এমএসএসকে বিশ্বে আবিষ্কৃত নতুন নতুন প্রযুক্তির তথ্য আহরণে ব্যস্ত রাখে। শিল্পবিপ্লবে বৈদেশিক প্রযুক্তি এবং দেশীয় প্রযুক্তির সমন্বয় মিলে চীন সহজ ও সস্তা পণ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে বিশ্বের কাছে তুলে দিচ্ছে। সস্তার কারণে বিশ্বজুড়ে ব্যবসায়ীমহল চীনে প্রস্তুত পণ্যসামগ্রী লুফে নিচ্ছে। এ কারণে চীনের অর্থনীতি অল্প সময়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান আজ বিশ্বের এক নম্বরে অবস্থান করছে। আমেরিকা সাম্প্রতিককালে স্বীকার করেছে যে, আমেরিকার বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের তুলনায় চীনের রিজার্ভ ২৫% বেশি।

চীনের এমএসএস পৃথিবীজুড়ে তিব্বত ইনডিপেনডেন্ট মুভমেন্ট (Tibetan independence movement) সদস্যদের উপর কড়া নজর রাখে। বৌদ্ধ ধর্মানুযায়ী তিব্বতভিত্তিক ফালুন গং (গভীর ধ্যান) বিশ্বাসীরা বুদ্ধাসনের অনুরূপ বসে ধ্যান করে আধ্যাত্মিকতার শীর্ষে পৌছার একমাত্র উপায় মনে করে। সমগ্র তিব্বত এবং উত্তর-পূর্ব চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এ ধরণের বিশ্বাসীদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। এমএসএস মনে করে উপরোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা যখন সংখ্যাধিক্য হবে তখন চীন সরকার কর্তৃক শাসিত তিব্বত হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। যেহেতু ফালুন গং (Falun Gong) এর সংখ্যা তিব্বতে বেশি।

নেপাল-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় চীন নেপালের অংশে কিছুসংখ্যক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' মনে করে এ সমস্ত লাইব্রেরীর নেপথ্যে চীনা গোয়েন্দারা ভারতের উপর নজরদারী করে। ২০১১ সালের আগস্ট মাসে চীনের এক গবেষণা টিম মাছ ধরার ট্রলারে করে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি অবস্থান নেয়। ভারত মনে করে এ অভিযানের নেপথ্যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে চাইনিজ ট্রলার এ দ্বীপে প্রবেশ করে। ভারত সীমান্ত লংঘনের জন্য চীন সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানায়।

ভারত আবিষ্কার করে যে চীনের সিচুয়ান প্রদেশের 'লাকীক্যাট' সাইবার গোয়েন্দা সদস্য মাইক্রসফট্ ওয়ার্ডে প্রতিস্থাপিত 'ট্রজান হর্স

সফট্ওয়্যার' ব্যবহার করে ভারতের ব্যালাস্টিক মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গোপন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে।

চীন এবং ভারতের হিমালয়ান উত্তর-পূর্ব সীমান্ত আকসাই চীন-এর (Aksai Chin) লাদাক সীমান্ত সীমানা নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে চীন এবং ভারতের মধ্যে ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর হতে ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত এক ভয়বহ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এ যুদ্ধে চীন জয়ী হয় এবং ভারতের দখলে থাকা লাদাখের এক বিরাট অংশ চীনের দখলে যায়।

এ যুদ্ধে ভারতের প্রায় ১২,০০০ সৈন্য এবং চীনের প্রায় ৮০,০০০ সৈন্য অংশ নেয়। ভারতের ১,৩৮৩ জন সৈন্য নিহত, ১,০৪৭ জন আহত এবং ১,৬৯৬ জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং অবশিষ্ট ৩,৯৬৮ জন বন্দি হয়। অপরদিকে চীনের ৭২২ জন নিহত এবং ১,৬৯৭ জন আহত হয়।

এ যুদ্ধের পর হতেই চীন-ভারত সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং উভয় দেশ সামরিক শক্তি অর্জনে তৎপর হয়। চীনের এমএসএস ভারতে অত্যন্ত সক্রিয় অন্যদিকে ভারতের 'র' চীন অভ্যন্তরে সক্রিয় রয়েছে। চীনের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক চমৎকার এজন্য ভারত পাকিস্তান এবং চীনকে তাদের প্রধান দুই শত্রু বলে মনে করে।

২০১১ সালে সুনামি কবলিত জাপানের ফুকুসিমা আণবিক চুল্লীতে বিপর্যয় ঘটার পর চীনের 'লাকীক্যাট' সাইবার গোয়েন্দারা কম্পিউটারের 'ট্রজান হর্স স্পাই সফটওয়্যার' ব্যবহার করে জাপানের ফুকুসিমা আণবিক চুল্লীর বিভিন্ন ফাইলে ঢুকে রেডিয়েশনের মাত্রা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে। আমেরিকান সাইবার গোয়েন্দারা সন্দেহ করে যে, চীনের সিচুয়ান ভার্সিটি হতে কম্পিউটারে মাস্টারস্ নেওয়া মি. গু কাইওয়ান নামক এক ব্যক্তি চীন সরকারের নির্দেশে এ কাজটি করে।

যুদ্ধবিধ্বস্থ শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরে বিভিন্ন চাইনিজ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান কাজ পায় এবং কাজ উপলক্ষে চাইনিজ শ্রমিকদের সাথে এমএসএস-এর কিছু সদস্য নিকটস্থ ভারতের তামিলনাড়ুর উপর নজরদারী রাখছে বলে তামিলনাড়ুর পার্লামেন্টারিয়ান জয়ললিতা জয়ারামের কাছে খবর আছে বলে তিনি জানান।

চীন এবং তাইওয়ান স্পাই অনুপ্রবেশ নিয়ে একে অপরকে সবসময় সন্দেহ করে। তাইওয়ান গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা ওয়াঙ্গ জেন-পিং ২০০৯ সালে গোপনীয় দলিল চীনের কাছে হস্তান্তরের সময় ধরা পড়লে তদন্তে বেরিয়ে আসে পিং (ডাবল এজেন্ট) ২০০৭ সাল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত

প্রায় ১০০টি অতি গোপনীয় দলিল চীনের কাছে পাচার করে। তাইওয়ান মিলিটারি ইনটেলিজেন্স অফিসার 'ল চি-চেঙ্গ' এবং মেজর জেনারেল 'ল হিসেন-চি' (উভয়েই ডাবল এজেন্ট) ২০০৪ সাল হতে ২০০৭ সাল পর্যন্ত মিলিটারি সিক্রেট চীনের এমএসএস-এর কাছে বিক্রি করে আসছেন বলে তাইওয়ান গোয়েন্দা সংস্থা জানতে পারে।

২০০৭ সালে তাইওয়ানের মিনিস্ট্রি অব ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো আবিষ্কার করে যে, থাইল্যান্ডে তাইওয়ান মিলিটারি সিকিউরিটির জন্য প্রস্তুতকৃত ৩২০০ কম্পিউটার হার্ড ড্রাইভস্ এবং নেদারল্যান্ড এবং তাইওয়ানের জন্য প্রস্তুতকৃত ১৮০০ ড্রাইভস্-এ চীনের এমএসএস সাইবার গোয়েন্দারা সুকৌশলে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয় যা ছিল মারাত্মক। ব্যক্ত থাকে যে, চীন সবসময় দাবি করে আসছে তাইওয়ান চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমেরিকা এবং ন্যাটো দেশগুলো তাইওয়ানকে অস্ত্রে সজ্জিত করে চীনের প্রতিপক্ষ দাঁড় করায়।

বেলজিয়াম পররাষ্ট্রমন্ত্রী Karel De Gucht চীনকে এই বলে অভিযুক্ত করেন যে, চীনের গোয়েন্দা সংস্থা বেলজিয়াম ফেডারেল পার্লামেন্ট, ন্যাটো ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের তথ্যপ্রবাহে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দলিল সংগ্রহের প্রমাণ তারা পেয়েছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে, বেলজিয়ামের Katholieke ভার্সিটি, নেদারল্যান্ড এবং ব্রিটেনের বিভিন্ন ভার্সিটিতে অধ্যয়নরত চীনের ছাত্রছাত্রীরা এমএসএস-এর সাথে যুক্ত থাকার সম্ভাবনা তারা উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

ফ্রান্স সরকার প্যারিসে চীনের গোয়েন্দা সদস্যের সন্ধান পেয়েছে। ফ্রান্সের একজন কূটনীতিবিদের সাথে এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে Shi Pei Pu নামে এক অপেরা সিঙ্গার স্বীকার করে যে, সে একজন নারী এবং চীনের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার নিমিত্তে সে প্যারিসে এসেছে।

চীন হতে শিক্ষানবিশ হিসেবে আগত লি লি হোয়াং নামে অন্য এক নারী ফ্রান্সের নামকরা ভেলিও (Valeo) কার পার্টস্ কোম্পানীতে যোগদান করে পার্টস্ প্রস্তুতের গোপন তথ্য চীনে পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে। সে তার ভুল স্বীকার করলে ফ্রান্সের আদালত তাকে দুমাসের কারাদণ্ড দেয় এবং কারাভোগের পর তার ডক্টরেট ডিগ্রি শেষ না করা পর্যন্ত ফ্রান্সে থাকার অনুমতি পায়।

জার্মান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা স্বীকার করেন যে, জার্মানির বিভিন্ন বড় ও মধ্যমাকৃতি শিল্পসংস্থার ফোন সিস্টেমে আড়ি

পেতে এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে অনুপ্রবেশ করে চীনের ছাত্রছাত্রীরা গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করে চীনে পাঠায়। জার্মান টেকনোলজির সাহায্য নিয়ে চীন জার্মানীর অনুরূপ পণ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে সস্তায় বিভিন্ন দেশে বিক্রি করে। এতে জার্মানির বার্ষিক ২০-৫০ বিলিয়ন ইউরো ক্ষতি হয়।

২০০৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ট্রজান হর্স স্পাই সফটওয়্যারের মাধ্যমে জার্মান চ্যান্সেলরী, মিনিষ্ট্রি অব ইকোনমিক্স এন্ড টেকনোলজি, মিনিষ্ট্রি অব এডুকেশনের তথ্যপ্রবাহে অনুপ্রবেশ করে ১৬০ গিগাবাইটসমৃদ্ধ মূল্যবান ডাটা দক্ষিণ কোরিয়া হয়ে চীনে পাচার হয়। একই সালে রাশিয়ার মিলিটারি অস্ত্র প্রস্তুতকারী একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও অন্য তিনজন গবেষক চীনের কাছে গোপনীয় তথ্য পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হন।

২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে রাশিয়ান ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস বাল্টিক স্টেট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির দুইজন বিজ্ঞানীদেরকে সেন্ট পিটারস্বার্গ-এ আটক করে যাদের বিরুদ্ধে চীনে মূল্যবান তথ্য পাচারের অভিযোগ ছিল। সন্দেহ করা হয় চীনের মহাশূন্য রকেট প্রোগ্রামের জন্য এ সমস্ত তথ্য পাচার করা হয়েছিল।

ব্রিটেনের এম আই ফাইভ গোয়েন্দা এজেন্সি ভয় করছে এজন্য যে, চীন ক্ষমতা রাখে ব্রিটেনের কম্পিউটার ও টেলিকমিউনিকেশনের সকল যন্ত্রপাতিতে মারাত্মক ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়ে বিকল করে দিতে।

২০১২ সালে কানাডার অটোয়া কনভেনশন সেন্টারে সিক্সথ ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্টারিয়ান কনভেনশনে 'তিব্বত' সমস্যা নিয়ে অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে Mark Bourrie নামক এক ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্টকে কানাডায় বসবাসরত 'তিব্বিয়ান ইনডিপেনডেন্ট মুভমেন্ট' সমর্থনকারীদের তৎপরতার ব্যাপারে মার্ক বরীর বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশের জন্য চীন গোয়েন্দা সংস্থার এমএসএস সদস্য Chen Yonglin এবং চীনের Xinhua News Agency অনুরোধ জানায়। কানাডার নিউজ এজেন্সির এক রিপোর্টে জানা যায় কমপক্ষে একহাজার 'এমএসএস' সদস্য কানাডাতে অবস্থান করছে যারা কানাডার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত।

চীনের এমএসএস আমেরিকাতে অত্যন্ত তৎপর। আমেরিকার শিল্পকারখানায় চাকুরীরত আমেরিকান নাগরিক (চীনা বংশদ্ভূত), বিভিন্ন ভার্সিটিতে অধ্যয়নরত চায়নিজ উচ্চশিক্ষার্থী, কূটনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে চীনের গোয়েন্দা সংস্থা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। আমেরিকান সিটিজেনদের অনেকেই চরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত হন।

বোয়িং বিমান সংস্থায় কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার Dongfan Chung এফবিআই-য়ের কাছে প্রথমে ধরা পড়ে এই অভিযোগে যে, বোয়িং প্রস্তুতকৃত বি-৫২, এফ-১৫, ডেল্টা-৪ যুদ্ধবিমান এবং হেলিকপ্টার সমূহের মধ্যে সিএইচ-৪৬, সিএইচ-৪৭-এর অত্যন্ত গোপনীয় প্রযুক্তিগত তথ্য তিনি চীন গোয়েন্দা সংস্থা এমএসএস-এর কাছে সরবরাহ করেন।

একথা সত্য যে, চীন প্রযুক্তিগত উন্নয়নে আজ বিশ্বের ত্রাস সৃষ্টিকারী একটি দেশ। অনেক জ্ঞানীগুণীরা মনে করেন আগামীতে চীনই পৃথিবী শাসন করবে। তাদের রয়েছে মানবসম্পদ, বিস্তৃত ভূ-খণ্ড এবং কর্মদক্ষতা। চীনের ব্যবসায়ীদের কাছে আজ পৃথিবী অনেকটা নির্ভরশীল।

আমেরিকা চীনের সাইবার আক্রমণের ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ। এ ধরনের আক্রমণ হলে চীন-আমেরিকা সম্পর্কের অবনতি হবে বলে আমেরিকা চীনকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। চীন প্রত্যুত্তরে জানায় আমেরিকা সবসময় চীনকে ফাটা চশমার মাধ্যমে সন্দেহের চোখে দেখে যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অস্ট্রেলিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকাজুড়ে রয়েছে চীনের এমএসএস-এর বিস্তৃত নেটওয়ার্ক। উন্নত বিশ্বের টেকনোলজি রপ্ত করে নিজস্ব টেকনোলজির উন্নত সংস্করণের মাধ্যমে চীনের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর মানুষকে চমকে দিচ্ছে।

এমএসএস এর লক্ষ্য

- যেকোনো মূল্যে চীনে কমিউনিষ্ট শাসন কায়েম রাখা।
- চীনের বিরাট জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা।
- বহিশত্রুর আক্রমণ হতে চীনকে রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া।
- চীনের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এমনভাবে মজবুত করা যাতে চীন কখনো পরনির্ভরশীল না হয়।
- বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীনকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া।
- কোনোরূপ উস্কানী ব্যতিরেকে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়া।
- চীনের বিশাল জনগোষ্ঠির জন্য খাদ্যনিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।
- সমগ্র পৃথিবী জুড়ে চীনের ব্যবসাবাণিজ্য ছড়িয়ে দিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখা।

আমেরিকা, ব্রিটেন, তাইওয়ান ও ভারতকে চীন কেন শত্রু ভাবে[২১]?

প্রায় ৩৫০০ বছর তিব্বত ও চীন হ্যান, টাং, মিং এবং কিং গোত্রীয় সম্রাটের দ্বারা শাসিত হয়। তিব্বতিয়ানরা তিব্বতে চীন সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনার কর্তৃক যুগের পর যুগ শাসিত হয়। কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী তিব্বিয়ানরা যখন চীন হতে তিব্বতকে বিচ্ছিন্ন করার অভিপ্রায়ে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনারকে হত্যা এবং তিব্বত ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা শাসিত হওয়ার জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন সম্রাট ১৭১০ সালে চীনের এক মুসলিম মিলিটারি জেনারেল মা বাফাং-এর নের্তৃত্বে তিব্বতে বিদ্রোহীদেরকে দমনার্থে পাঠান। যুদ্ধের মাধ্যমে চীনের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

চীন সম্রাটের অধীনে ফালুন গং বিশ্বাসী দালাইলামা এবং পঞ্চেনলামা গোত্রিয় ধর্মীয় কমিশনারদের মাধ্যমে তিব্বতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিব্বতের সাথে সিকিমের ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত মিলের কারণে সিকিম সবসময়ই তিব্বতের সাথে একাত্ম ছিল যদিও সিকিম চৌগিয়াল রাজাদের দ্বারা শাসিত হত। অন্যদিকে সিকিমের প্রতিবেশী হিন্দু রাষ্ট্র নেপালের সাথে সিকিমের ধর্মীয় মিল ছিল না বলে নেপালের গুর্খা সেনারা প্রায়ই সিকিম সীমান্তে অনধিকার প্রবেশ করত। এমনকি নেপালের গুর্খা সৈন্যরা ১৭০০ সালে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে সিকিমের কলিমপঙ্গে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

সিকিমের ষষ্ঠ চৌগাল রাজার শাসনামলে নেপাল সিকিমের এক বৃহৎ অংশ নিজেদের অধিকারে নেয়। সিকিমের অধিকাংশ জনগণ ভীত হয়ে তিব্বতে আশ্রয় নেয়। তিব্বতের ৫ম দালাইলামার মধ্যস্থতায় নেপাল

---

২১. 1. Kenneth Conboy and James Morrison reveal how America's Central Intelligence Agency encouraged Tibet's revolt against China. "The Nation; Finding Spies Is the Easy Part".(The New York Times.) 2. "Chinese Spy 'Slept' In U.S. for 2 Decades".(The Washington Post.) 3. "Defectors say China running 1,000 spies in Canada". (CBC News. 15 June 2005). 4. "Canberra wakes up to China 'spies'".(Asia Times.) 5. "FBI Officials Are Faulted In Chinese Spying Case". (The Washington Post).. 6. "China's computer hacking worries Pentagon". (Los Angeles Times). 7. "Major cyber spy network uncovered".(BBC News. 29 March 2009). 8. "Report: China spies threaten U.S. technology". (CNN. 15 November 2007,. 20 January 2008). 9. "US man jailed in China 'spy' case". (Al Jazeera. 24 March 2008). 10. "Chinese ship caught spying on India".(Zee News. 31 August 2011). 11."Luckycat Redux: Inside an APT Campaign with Multiple Targets in India and Japan".(MalwareLab.p. 6.)12. "Security firm links cyber spy campaign to Chinese hacker". (Google. Agence France-Presse. 30 March 20") 13. Chinese students running 'spy network' in EU". (China Post. Agence France-Presse. 12 May 2005).

সিকিমের অধিকৃত জায়গা ফিরিয়ে দেয় কিন্তু কলিমপঙ্গ অঞ্চল তাদের অধিকারে রাখে।

নেপালের সিকিম দখল ঠেকাতে এবং সিকিমকে ভারতের করদরাজ্যে রূপান্তরিত করার অভিপ্রায়ে ১৮১৬ সালে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার বিশাল সেনাবাহিনী সিকিমে নেপালী সেনাদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে নেপালের দখলকৃত কলিমপঙ্গ অংশ পুনরুদ্ধার করে।

১৮১৭ সালে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার সাথে সিকিমের এক সামরিক চুক্তি হয়। প্রকারান্তরে সিকিম ব্রিটিশ শাসনের আওতায় আসে। সিকিমের রাজা ভারতকে দার্জিলিং উপহার দেন।

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর হতে শুরু করে ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনী তিব্বতে আক্রমণ চালায় এবং তিব্বত অধিকারে নেয়। ব্রিটেন এক চুক্তির মাধ্যমে তিব্বতের ধর্মীয় নেতাদের সাথে ৭৫ বছরে পরিশোধযোগ্য কর নির্ধারণ করে। বিনিময়ে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান সেনাসদস্য তিব্বত ছাড়ে তবে যতদিন না কর পরিশোধিত হয় এবং সিকিমের সীমানা নির্ধারণ না হয় ততদিন পর্যন্ত তিব্বতের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ব্রিটিশ অধিকারে থাকার শর্তে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ার সেনাদেরকে অবশিষ্ট অঞ্চল হতে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

১৯৭৫ সালে সিকিম ভারতের করদরাজ্যে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে নামেমাত্র চৌগাল রাজা শাসন করছেন।

১৯১২ সালে অষ্টম দালাইলামা Thubten Gyatso (ধর্মীয় গুরুকে দালাইলামা বলে আখ্যায়িত করা হয়) তিব্বতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং চীনের পতাকা নামিয়ে তিব্বতের পতাকা উড়ান। তিব্বত হতে তিনি সকল চীনাদেরকে উৎখাত করেন। তিব্বত সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং তিব্বত গঠনে কৃষকদের উপর করারোপ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি মারা যান। ৯ম দালাইলামা Lungtok Gyatso তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯৫০ সালে চীনের সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে তিব্বত পুনরুদ্ধার করে। ১৯৫১ সালে তিব্বিয়ানদের সাথে চীন সরকারের ১৭টি পয়েন্টের উপর একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং পুনরায় চীনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আমেরিকার সিআইএ ও ভারত সমর্থনপুষ্ট বর্তমান ১৪তম দালাইলামা Tenzin Gyatso (ধর্মীয় গুরু) ১৯৫৯ সালে দলবলসহ পালিয়ে ভারতের অরুণাচল প্রদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন এবং প্রবাসে তিব্বত সরকার

গঠন করেন। আমেরিকার সিআইএ প্রতিবছর ১.৭ মিলিয়ন ডলার বর্তমান দালাইলামাকে সরকার পরিচালনার জন্য বার্ষিক সাহায্য দিয়ে থাকে।

১৯৮০ সালে বর্তমান দালাইলামা পূর্বঘোষিত তিব্বতের পূর্ণ স্বাধীনতার বদলে বৃহদাকারে স্বায়ত্বশাসন দাবি করেন। চীন এ প্রস্তাবে রাজী হয়নি। সিআইএ পুষ্ট দালাইলামার নির্বাসিত সরকারকে যেমন চীন স্বীকার করেনা তেমনি আমেরিকার সিআইএ এবং ভারত এর ইন্ধনদাতা হওয়ায় এ দু-দেশকে শত্রু হিসেবে ভাবে।

এদিকে 'তিব্বত ইনডিপেনডেন্ট মুভমেন্ট' নামে অন্য একটি প্রবাসী তিব্বিয়ান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্বাধীন তিব্বত প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রবাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে যার ইন্ধনদাতা আমেরিকান সিআইএ, ব্রিটেনের এমআইসিক্স ও ভারতের 'র' গোয়েন্দা সংস্থা। ভারতে বসবাসরত প্রবাসী তিব্বীয়ানদেরকে 'র' সামরিক ট্রেনিং এবং সিআইএ সিকিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রবাসী তিব্বিয়ানদের সামরিক ট্রেনিং প্রদান করছে।

ফেডারেল ইনটেলিজেন্স সার্ভিস (BND)

ইংলিশে বিএনডি (BND) জার্মানে Bundesnachrichtendienst

জার্মানির এ স্পাই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল। ২০১৯ সালের এক জরিপে জানা যায় এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে কর্মরত জনবল ৬,৫০০ জন। ২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বাজেট ৯৬৬.৫ মিলিয়ন ইউরো। দেশের অভ্যন্তরে এবং পৃথিবীর প্রায় ৩০০ টি স্থানে এর কর্মকাণ্ড বিস্তৃত। সেনাবাহিনী হতে ১০% এবং জাতীয় অন্যান্য নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান হতে ৯০% জনবল নিয়ে এর ভিত্তি। বিএনডি-এর বেশিরভাগ কর্মকাণ্ড প্রযুক্তিনির্ভর। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গোপনে আড়ি পেতে তথ্য সংগ্রহের জন্য রয়েছে এর অত্যাধুনিক কলাকৌশল এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সমাহার। জার্মানির একমাত্র স্পাই প্রতিষ্ঠান বিএনডি দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের বাইরে যুগপৎভাবে জার্মানির স্বার্থে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। জার্মানি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদিআরবের সাথে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় চুক্তিতে আবদ্ধ।

২য় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ও পরবর্তী পর্যায়ে বিএনডি জার্মানির স্বার্থরক্ষায় অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্ব জার্মানিতে আমেরিকার সিআইএ এবং রাশিয়ান স্পাই এজেন্সি কেজিবি জার্মান নাগরিকদের মধ্য হতে অনেক লোককে তাদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করার নিমিত্তে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯৬০ সালের দিকে অনেক নিচুস্তরের বিএনডি এজেন্ট টাকার বিনিময়ে সিআইএ ও কেজিবির রিক্রুটিং এজেন্ট হিসেবে ও কাজ করে। বিএনডি এদের অনেককেই সনাক্ত করতে সমর্থ হয় ফলশ্রুতিতে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে জার্মানি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

১৯৬১ সালে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানিকে ভাগ করতে বার্লিন ওয়াল নির্মিত হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের ৯ই নভেম্বর আকস্মিকভাবে জনরোষে বার্লিন ওয়াল ভেঙে দেওয়া হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিম অংশ পুনরায় একত্রিত হয়। জার্মানিকে শক্তিশালী করার লক্ষ নিয়ে এবং আমেরিকা ও রাশিয়ার ইচ্ছাকে পরাজিত করে এ কাজ মূলতঃ বিএনডি এ কাজটি সম্পন্ন করে।

মধ্যপ্রাচ্য এবং ল্যাটিন আমেরিকাতে বিএনডির কর্মকাণ্ড অত্যন্ত ফলপ্রসূ হিসেবে বিবেচিত হয়। আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধ

চলাকালীন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত পূর্ব ইউরোপও ন্যাটোর শক্তি বৃদ্ধিতে বিএনডি ইলেকট্রনিক ও যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। সোভিয়েত রাশিয়া কিউবাতে ১৯৬২ সালে গোপনে মিসাইল সিষ্টেম প্রতিস্থাপন করে যা শুধুমাত্র বিএনডি সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। বিএনডি আমেরিকার সিআইএকে এ তথ্য অবহিত করলে সিআইএ এর প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়।

১৯৬৭ সালের ৫ই জুন মধ্যপ্রাচ্যের ইসরাইল-আরব ছয়দিনের যুদ্ধের প্রাক্কালে বিএনডি জানতে সক্ষম হয় যে, ইসরাইল কয়েকঘন্টার মধ্যে যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছে। আমেরিকা এ খবরে প্রথমে সন্দেহ পোষণ করলেও যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে বিএনডির তথ্য সরবরাহ সঠিক ছিল বলে প্রমাণিত হয়।

১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার নিকটবর্তী এলাকায় সোভিয়েত সামরিক মহড়া বিএনডির রাডার অপারেটরের যন্ত্রতে ধরা পড়ে। বিএনডি আমেরিকাকে জানায় রাশিয়া চেক রিপাবলিক দখল করতে যাচ্ছে। সিআইএ প্রথমে এ তথ্য বিশ্বাস করেনি কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বিএনডি-র এ তথ্য সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় ওয়ারসো প্যাক্ট ফোর্সের সদস্যভূক্ত দেশগুলো এ আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়।

২০১৪ সালে বিএনডি-তে কর্মরত একজন গোয়েন্দা সদস্য কিছু গোপনীয় দলিলপত্র সিআইএ-র কাছে তুলে দেয় যা যুক্তরাষ্ট্রের নাসা গবেষণা কেন্দ্রের কাছে অতীব প্রয়োজনীয় দলিল হিসেবে বিবেচিত। সিআইএ-র এহেন গুপ্তচরবৃত্তির প্রতিবাদে জার্মানির বার্লিনে অবস্থানরত সিআইএ প্রধানকে জার্মানি বহিষ্কার করে। এতে দুদেশের সম্পর্কে কিছুটা অবিশ্বাসের জন্ম দেয়।

কানাডিয়ান সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস

কানাডিয়ান সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স সার্ভিস (CSIS) ১৯৮৪ সালের ১৬ই জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতোপূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র সংস্কৃতি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের পরিবেশ বিষয়ক কর্মকান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু বর্তমানে এর কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধানে অধিক ব্যবহৃত।

১৯৯৩-২০০৩ সালের মধ্যে কানাডার ভেনুকুবের শহরে রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বরিশ ইয়ালটসিনের জীবননাশের উপর এক আক্রমণ কানাডিয়ান সিকিউরিটি সার্ভিস প্রতিহত করে। কানাডার মাটিতে লুকিয়ে থাকা মধ্যপ্রাচ্যের এক জঙ্গি সংগঠন এ আক্রমনের নীল নকশা প্রস্তুত করেছিল বলে জানা যায়। এ আক্রমণের পেছনে কানাডায় কর্মরত রাশিয়ার কেজিবির কিছু সদস্যদের সমর্থন ছিল যারা বরিশ ইয়ালটসিনকে পছন্দ করত না।

২০০৪-১৪ সালের মধ্যে কানাডার জাতীয় সিকিউরিটি জোরদার করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ক্রমেই বিস্তার লাভ করে। ১৯১৪ সালের এক রিপোর্টে বিশ্বের গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে কানাডিয়ান সিকিউরিটি ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে প্রথম দশটি গুপ্তচর সংস্থার মধ্যে স্থান দেওয়া হয়।

ISI - ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স

পাকিস্তান ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসলামাবাদে এর সদর দফতর এবং পাকিস্তানের অন্যান্য বড় বড় শহরে এর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন কাজ করছে। তিন বাহিনীর চৌকশ আফিসারদের সমন্বয়ে গঠিত এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এর 'সেফ হাউস' রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে এর সাফল্য একে একটি প্রথম সারির গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে বিশ্বে খ্যাতি এনে দিয়েছে।

ভারত, ইরান, লিবিয়া, সিরিয়া, জর্ডান, ইসরাইল, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, রাশিয়া, বসনিয়া, আফগানিস্তান, মায়ানমার এবং বাংলাদেশে আইএসআই বেশ সক্রিয়। ভারতের কাশ্মীরে, আফগানিস্তানে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলোতে এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনকে মদদ জুগিয়ে আসছে আইএসআই। বাংলাদেশ সংলগ্ন ভারতের আসামের উলফা সংগঠনকে অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে ভারতের সেভেন সিষ্টার প্রদেশগুলোর বিদ্রোহী গেরিলাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভারতের এ অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করার জন্য আইএসআই-কে দায়ি করা হয়।

মুম্বাইয়ের হোটেল তাজ আক্রমণ, লশ্‌কর-ই-তৈয়বার কিছুসংখ্যক নেতাদের মুক্তির দাবি নিয়ে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান অপহরণ করে আফগানিস্তানে অবতরণ, দিল্লির পার্লামেন্ট ভবনে মিটিং চলাকালে গুলি বিনিময়, আফগানিস্তানে ভারতীয় দূতাবাস আক্রমণ ইত্যাদির পেছনে আইএসআই-এর হাত রয়েছে বলে ভারতীয় 'র' বিশ্বাস করে। শিখ অধ্যুষিত পাঞ্জাবের কালিস্তান আন্দোলন, শিখ দেহরক্ষী কর্তৃক ইন্দিরা গান্ধী হত্যা, কাশ্মীরে বিদ্রোহ, ভারতের সেভেন সিষ্টার প্রদেশসমূহে ক্রমাগত অশান্তি সৃষ্টি, আফগানিস্তানে মুজাহিদদের সহায়তা করে রাশিয়ান সেনাবাহিনীকে আফগানিস্তান ছেড়ে যেতে বাধ্য করা, বাংলাদেশে নিষিদ্ধঘোষিত রাজনৈতিক পার্টি হুজি এবং জেএমবি-কে মদদ দেওয়া, বাংলাদেশ অভ্যন্তরে ভারতের একচেটিয়া আধিপত্য রোধ করা ইত্যাদি ব্যাপারে আইএসআই-য়ের অসাধারণ সাফল্য প্রত্যক্ষ করার মতো।

১৯৯৮ সালের ১১ এবং ১৩ই মে ভারতের পাঁচটি পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরপরই পাকিস্তান একই মাসের ২৮ ও ৩০ তারিখ মোট ছয়টি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। পাকিস্তানের কুসাব প্লোটোনিয়াম প্রকল্পে বাৎসরিক ৬৪ কেজি প্লোটোনিয়াম এবং প্রায় ২১টির মত

পারমাণবিক ওয়ারহেড উৎপাদন করার সক্ষমতা রয়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ ২০০২ সালে এক ভাষণে বলেছেন, "আমাদের পারমাণবিক প্রকল্প কেবলমাত্র ভারতের বিরুদ্ধে এবং পরমাণবিক অস্ত্র পাকিস্তান তখনই ব্যবহার করবে যখন ভারত কর্তৃক পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।"

পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তি অর্জনের পরপরই মধ্যপ্রাচ্যের ধনী মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে পাকিস্তানের আণবিক প্রকল্পে অর্থ সাহায্য বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে লিবিয়া এবং সৌদিআরব পাকিস্তানের আণবিক প্রকল্প নিয়ে অধিক উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং ইসরাইল ও ইরানের হুমকিকে প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তানের কাছ থেকে আণবিক শক্তিসম্পন্ন মিসাইল সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে উঠে। পাকিস্তানের কাছ হতে আণবিক ক্ষেপনাস্ত্র ক্রয়ের জন্য সৌদিআরব প্রচুর অর্থ অগ্রিম প্রদান করার কথা জানা যায় এবং সৌদিআরব যদি ইসরাইল কিংবা ইরান কর্তৃক আক্রান্ত হয় তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে যাতে পারমাণবিক সরঞ্জাম সৌদিআরব পৌঁছে সে ধরণের একটি চুক্তির কথাও শোনা যায়।

এদিকে ইরান দক্ষিণ আমেরিকায় তাদের নিকটতম বন্ধু কিউবা এবং ফ্রান্সের সাহায্য নিয়ে আণবিক প্রকল্পে বেশ এগিয়ে যায়। দূরপাল্লার আন্তমহাদেশীয় ব্যালাস্টিক মিসাইল থেকে শুরু করে অন্যান্য শক্তিশালী মিসাইল প্রস্তুত করে ইরানের মিলিটারি শক্তিকে ক্রমেই যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযুক্ত করে গড়ে তুলে। এদিকে ইসরাইল আমেরিকার সহায়তায় মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিশালী মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ইরাক ও লিবিয়ার সামরিক শক্তিকে পর্যুদস্থ করে সাম্প্রতিককালে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া এবং মিসরের সামরিক শক্তিকে পরাভূত করার জন্য সেখানে গৃহযুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে দিয়েছে।

আমেরিকার সিআইএ, ইসরাইলি মোসাদ এবং ভারতীয় 'র' যুগপৎভাবে মুসলিম দেশসমূহ ও পাকিস্তান অভ্যন্তরে শিয়া-সুন্নির মধ্যে হিংসার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে মুসলিম দেশসমূহকে দূর্বল করার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। শিয়া-সুন্নি মাজহাবপন্থী মুসলিমদের অভ্যন্তরে প্রকৃতপক্ষে মোসাদ-সিআইএ এবং 'র' এজেন্টদের অনুপ্রবেশ সাম্প্রতিককালে মুসলিম দেশসমূহের অভ্যন্তরে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। প্রতিদিনের মৃত্যুর মিছিলে যোগ হচ্ছে এক নতুন মাত্রা। ধর্মগ্রন্থের উপর আক্রমণ, মুসলিম সভা-সমাবেশে এমনকি

মসজিদে নামাজরত মুসল্লিদের উপর আক্রমণের পেছনে কারা জড়িত থাকতে পারে বা তাদের উদ্দেশ্য কি হতে পারে এ নিয়ে ভাবার মত প্রকৃত চিন্তাবিদ মুসলিম সমাজে থাকলেও প্রতিরোধের সঠিক কর্মপন্থা তাদের জানা নেই।

২০১২ সালের ৫ই নভেম্বর 'ডেকান ক্রোনিকলে' প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যায়- ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ভারত সরকারকে এ মর্মে অবহিত করে যে, পাকিস্তানী আইএসআই ভারতের প্রত্যেক নিকটতম প্রতিবেশী দেশগুলোকে ব্যবহার করে ভারতকে প্রতিটি দিক হতে ঘেরাও করে রাখার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং ভারত ভূ-খণ্ডে অরাজকতা সৃষ্টি করতে এক নূতন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে নেপাল, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং মায়ানমার-এর মধ্য দিয়ে 'আইএসআই" রিক্রোটেড এজেন্ট ভারত ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করবে এবং এই সমস্ত দেশগুলোতে অবস্থিত পাকিস্তানী দূতাবাসের মাধ্যমে আইএসআই-য়ের সিনিয়র গোয়েন্দারা প্রবেশ করবে এবং নির্ধারিত এজেন্টদেরকে দিক নির্দেশনা দেবে।

ভারতের স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরপরই প্রতিবেশী দেশসমূহের সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারত সরকার সামরিক নজরদারী বাড়িয়ে দেয়। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে গুলি করার নির্দেশও রয়েছে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফ-এর হত্যাযজ্ঞ যেভাবে পরিলক্ষিত হয় পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিবেশী দেশ যেমন মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভূটান কিংবা চীন সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফ-এর এ ধরণের নির্মম তৎপরতা লক্ষ করা যায়না। তাহলে এটাই কি ধরে নিতে হবে যে, ক) বাংলাদেশের দূর্বল পররাষ্ট্র নীতি এজন্য অনেকাংশে দায়ী? খ) বাংলাদেশ বন্ধুপ্রতীম প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারত এখনো মেনে নিতে পারছেনা? গ) বাংলাদেশ এককালে প্রাক্তন পাকিস্তানের অংশ ছিল এবং এখানে পাকিস্তানী মতাদর্শে এখনও অনেকেই বিশ্বাসী? ঘ) মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের কাছে তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়?

সে যাই হোক, বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান, নারী স্বাধীনতা, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষার হার এবং উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে চীনের পরেই বাংলাদেশের স্থান। ষোল কোটি

মানুষের দেশ বাংলাদেশ এবং এ দেশের সাথে ভারতের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। যে কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত জরুরী। তাই বাংলাদেশ অভ্যন্তরে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর ভূমিকা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া যাতে সৃষ্টি না করে সেদিকে ভারতকে খেয়াল রাখতে হবে।

পাকিস্তানের আইএসআই বাংলাদেশকে ভারতের বিরুদ্ধে একটি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ অভ্যন্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্মম পরাজয়ের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের পূর্বাংশ আলাদা হয়ে যাওয়া পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি সহজে মেনে নিতে পারেনি। বাংলাদেশ অভ্যন্তরে পাকিস্তানী আইএসআই ইসলামপন্থী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সরাসরি অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব জাগিয়ে তুলতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। সাম্প্রতিককালে রাজনীতির নামে অরাজকতা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভূত ক্ষতি বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে যথেষ্ট পিছিয়ে দিয়েছে। ভারত এবং পাকিস্তানের যুগপৎ ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলাদেশ প্রচুর সম্ভাবনার দেশ হওয়া সত্ত্বেও কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে বার বার হোঁচট খাচ্ছে।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও বিভিন্ন স্পাই পত্রিকা :

1. By way of deception, The other side of deception, (Written by Victor Ostrovasky, Ex.Case Officer, Mossad) 2. BBC news 3. CNN news 4. Al-Jazera News, 5. On line Radio Islam, sweeden 6. Janes information Group, 7. Wikipedia, 8. Encyclopedia Britanica, 9. The Guardian, 10. Global Politicians & Blogers view, 11. Media Monitor Newyork (MMN), 12. Forbes news, 13. Jews Chronicle, 14. henrymakow report, 15. The New York Times, 16. Times of Assam, 17. Jewish Journal, 18. The Jeruzalem Post, 19. The Fortune Magagine, 20. The Milli Gazette, 21. The Nuclear Nightmare, 22. World affairs Journal, 23. Spiegel online, 24. The Washington Post, 25. Jew Watch, 26. Sabbah report, 27. The Times of Israel, 28. Torah.org, 29. Real Jew news, 30. The daily Telegraph, 31. The daily Arab News, 32. Wikileaks report & many more periodicals, 33. spy journals, 34. News letters published arround the world including Indian The daily Anandabazar patrika & The daily prothom Alo, The daily Observer of Bangladesh etc.

প্রজন্ম পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত বই

বিশ্ব রাজনীতি

১. **কয়েদী ৩৪৫: গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর**
লেখক: সামি আলহায, *সাংবাদিক*

২. **আফিয়া সিদ্দিকী: গ্রে লেডি অব বাগরাম**
সংকলন: টিম প্রজন্ম

৩. **দ্য কিলিং অব ওসামা**
লেখক: সিমর হার্শ, *সাংবাদিক*

৪. **আয়না: কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি**
লেখক: আফজাল গুরু

৫. **গুজরাট ফাইলস: এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের ময়নাতদন্ত**
লেখক: রানা আইয়ুব, *সাংবাদিক*

৬. **উইঘুরের কান্না**
লেখক: মুহসিন আব্দুল্লাহ, *সাংবাদিক*

৭. **জাতীয়তাবাদ**
লেখক: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮. **KASHMIR the case for freedom : আজাদির লড়াই**
লেখক: অরুন্ধতি রায়, তারিক আলী ও অন্যান্য

৯. **মোসাদ এক্সোডাস**
লেখক: গ্যাড সিমরন, *মোসাদ এজেন্ট*

১০. **এনিমি কমব্যাট্যান্ট**
লেখক: মোয়াজ্জেম বেগ

১১. **পুঁজিবাদ**
লেখক: অরুন্ধতি রায়

১২. **পার্মানেন্ট রেকর্ড**
লেখক: এডওয়ার্ড স্নোডেন

১৩. **এম্বাসেডর**
লেখক: শেখ আব্দুস সালাম জাইফ

আত্ন-উন্নয়ন

১. না বলতে শিখুন
লেখক: ওয়াহিদ তুষার

২. এক্সাক্টলি হোয়াট টু সে
লেখক: ফিল এম জোন্স

৩. সফল উদ্যোক্তা
লেখক: সুব্রত বাগচী

থ্রিলার

১. ব্লন্ড হেয়ার ব্লু আইজ
লেখক: ক্যারিন স্লাথার

২. মার্ডার ইন এ মিনিট
লেখক: সৌভিক ভট্টাচার্য

৩. গুজবাম্পস
লেখক: আর. এল. স্টাইন

৪. ইন এনিমি হ্যান্ডস
লেখক: মৈনাক ধর

নাজমুল চৌধুরী

১৯৪৯ সালের নভেম্বরে বৃহত্তর সিলেটের হবিগঞ্জে জন্ম। হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন।
চাকুরীজীবন : বাংলাদেশে সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা (১৯৭২-১৯৮০), ১৯৮০ সালে সৌদিআরবের জেদ্দায় একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান (১৯৮০-২০০২)

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

দুঃস্বপ্নের পদচিহ্ন (ছোটগল্প সংকলন)
ইউরোপে সতেরো দিন (ভ্রমন কাহিনী)
মুখোশের অন্তরালে (২০১৪ সালের জরিপে শ্রেষ্ঠ ১০টি গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের মুখোশ উন্মোচন)

প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

সিআইএ - মোসাদ : একই বৃন্তে দুটো ফুল
লোহিতের তীরে (ভ্রমণ কাহিনী)
স্বর্গ-সহেলী (কাব্যগ্রন্থ)

সম্পাদনা

সৌদিআরবের জেদ্দা হতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক "সম্প্রীতি" সাহিত্য সাময়িকী (১৯৯০-২০০২)

মানবসভ্যতা বিকাশে মানবতার জয়জয়কার পৃথিবীর সর্বত্র। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে মানবতাকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছে অধিকাংশ মানুষ। রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। তাই তো গড়ে উঠেছে সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক রীতিনীতি। ছোট্ট এ পৃথিবীতে মৃত্যু পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার নিয়ে জন্মেছে মানুষ। এ স্বাভাবিক অধিকারে যারা বাঁধা সৃষ্টি করে তারা দেশ, মানবতা এবং সমাজের শত্রু। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? এই রক্ত-মাংসের মানুষ নিজেদের ভাগাভাগি করে নিয়েছে বিভিন্ন জাতিসত্তায়। জাতিতে জাতিতে কলহ, দেশে দেশে বিবাদ এবং ধর্মে ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করে পৃথিবীর মানচিত্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ নিজেদের অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে এ পৃথিবীতে একের পর এক দেশের উত্থান ঘটেছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায়, ক্ষমতার শীর্ষে থাকার মানসিকতা এবং অতিরিক্ত ভোগের আশায় মানুষ একে অপরের উপর চড়াও হয়েছে। শত্রুতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা এবং বহিষ্কারের মাধ্যমে কেড়ে নিচ্ছে অন্য সমাজের ভোগের অধিকার। লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে মানুষ অন্যকে পরাস্ত করার বিভিন্ন কলাকৌশল করায়ত্ত করেছে। গুপ্তচরবৃত্তি এ অপকৌশলগুলোর প্রধান উৎস। ত্য সংগ্রহের মাধ্যমে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ অপরিহার্য মনে করে পৃথিবীর সকল দেশ নিজেদের গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেছে। গুপ্তচরদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড কীভাবে দেশে দেশে, কালে কালে যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি এবং হত্যা সংগঠিত করেছে তারই অন্ধকার দিকগুলোর কিয়দংশ এ বইতে প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন গুপ্তচর সংস্থা কীভাবে প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে পাল্টে দিচ্ছে তারই একটি ভয়াবহ চিত্র “মুখোশের অন্তরালে” বইটিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

BDT ৳ 300
USD $18

www.projonmo.pub

NON FICTION
ISBN: 978-984-94636-2-7